Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/104	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1311b.s. (1904)
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Upendranath Mukhopadhyay: 115/2 Grey Street: Printed by Basumati Electro Press by Purnachandra Mukhopadhyay.
Author/ Editor:	Bhuabanchandra Mukhopadhyay	Size:	13x21cms.
		Condition:	Brittle
Title:	Bangarahasya (Nutan naksha)	Remarks:	Discussion of the present state of the state of Bengal

বঙ্গরহস্য।

[নূতন নক্সা]

বঙ্গসমাজের বর্ত্তমান প্রকৃতির আলোচনা।

সমালোচক

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রকাশক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

১১৫।২ গ্রে ষ্ট্রীট, বসুমতী ইলেক্ট্রো মেসিন প্রেসে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১১

Mirzapur Phœnix Union
Library.
CALCUTTA.

বঙ্গরহস্য।

একাদশ তরঙ্গ।

সমাজ-সংস্কার এবং ভারত-উদ্ধার।

ভবানন্দপুরের ভবরত্ন চৌধুরী একজন ভাগ্যবান্ পুরুষ। শিশুকালে তাঁহার যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, সেই অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থা মিলাইলে ভবরত্নের ভাগ্যফলাফল অতি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যাইবে। ভবরত্নের যখন দুই বৎসর বয়স, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। সহোদর-সহোদরা তাঁহার কেহই ছিল না, জননী ছিলেন, ঐ শিশুপুত্রটী লইয়া কিছু দিন তাঁহার পিত্রালয়ে গিয়া বাস করেন। ভবরত্নের মাতামহ তাদৃশ সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন না, পিত্রালয়ে ভবরত্নের জননীকে অনেক প্রকার বাধ্য কার্য্য করিতে হইত। তিনি সতী-সাধ্বী রমণী ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল যোগমায়া দেবী। তাঁহার পতি নীলরতন চৌধুরী ইংরাজ-সরকারে নিমক-মহালে কর্ম্ম করিয়া অনেক টাকার সম্পত্তি করিয়াছিলেন, দুই তিনখানি জমীদারীও হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর সেই সকল বিষয় কি প্রকারে হস্তান্তর হইয়া গিয়াছিল, যোগমায়া দেবী তাহার কিছুই জানিতেন না; সংসারে অত্যন্ত কষ্ট হওয়াতে অগত্যা

তিনি দরিদ্র পিতার ভবনে আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিপদ্ যখন উপস্থিত হয়, কুগ্রহ যখন প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করিতে থাকে, তখন পদে পদেই অমঙ্গল ঘটে। হঠাৎ একদিন গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া যোগমায়া দেবী অদৃশ্য হন, তাঁহার পিতা এবং প্রতিবাসী লোকেরা বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কোথাও তাঁহাকে প্রাপ্ত হন নাই। সকলেরই অনুমান হইয়াছিল, তিনি জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কেবল অনুমান মাত্র নহে, গ্রামের অনেক লোকের উহাতেই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। নদীতে জলমগ্ন হইয়া মৃত্যু হইলে কোথাও না কোথাও মৃতদেহ ভাসিয়া উঠে; যোগমায়ার মৃতদেহ কোথাও ভাসিয়া উঠিয়াছিল, এমন কথা কিন্তু কেহই শ্রবণ করেন নাই, জনরবের মুখেও কিছু প্রকাশ পায় নাই।

ঐ ঘটনা যখন হয়, তখন ভবরত্নের বয়স পাঁচ বৎসর। জননী ভিন্ন ভবরত্ন ইহসংসারে আপনার বলিয়া আর কাহাকেও চিনিত না, জননী-বিয়োগে তাঁহার শোকের সীমা-পরিসীমা ছিল না। তাহার বৃদ্ধ মাতামহ আদর করিয়া নিকটে বসাইয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেন, মিষ্টকথায় অনেক বুঝাইতেন, বালক কিছুতেই প্রবোধ মানিত না, কিছুতেই জননীকে ভুলিতে পারিত না, সাত আট দিন কেহ তাহাকে অন্ন আহার করাইতে পারে নাই। গঙ্গাজলে জননী ডুবিয়া মরিয়াছেন, লোকের মুখে অজ্ঞান বালক সেই কথা শুনিয়াছিল, সে যেন মনে করিত, গঙ্গাতীরে গেলেই জননীকে দেখিতে পাইবে, জননী জল হইতে উঠিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে করিয়া লইবেন; এইরূপ ভাবিয়া বালক নিত্য নিত্য প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাকী গঙ্গাতীরে চলিয়া যাইত, গঙ্গায় তরঙ্গ হইতেছে, নৌকা ভাসিতেছে, মনুষ্য খেলা করিতেছে, এই সকল চাহিয়া চাহিয়া দেখিত, তীরে দাঁড়াইয়া তরঙ্গের মধ্যে, নৌকার মধ্যে, মানুষের মধ্যে জননীকে খুঁজিত, দেখিতে পাইত না, মা মা বলিয়া ডাকিয়া অশ্রুধারে ভাসিয়া গঙ্গার চড়ার উপর বসিয়া পড়িত। জানা-শুনা লোকেরা তাহাকে বাড়ীতে আনিবার জন্য বারম্বার ডাকিত, বালক তাহা শুনিত না, বলপূর্ব্বক হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসিতে হইত। পথে আসিতে আসিতে মাতৃহারা বালক ক্রমাগত চীৎকার করিয়া কাঁদিত।

প্রায় এক বৎসর এই প্রকার। কেহই ভবরত্নকে শান্ত করিতে পারে না। ভবরত্নের মুখে হাসি নাই, মা মা রব ভিন্ন অন্য কোনও কথা নাই, সমবয়স্ক

বালকগণের সহিত খেলা নাই, আমোদ-কৌতুক কিছুই নাই। ক্ষুধা হইলে ভবরত্ন কাহারও নিকটে খাদ্য চাহিয়া লয় না, পিপাসা হইলে কাহারও নিকট জল চাহে না, নিদ্রা আসিলে ধূলাতেই শয়ন করিয়া পড়ে; সেইটুকু ছেলে সংসারের সকল বিষয়েই যেন উদাসীন।

যোগমায়াদেবীর নিরুদ্দেশের পর তাঁহার পিতাঠাকুর মহাশয়ের একটা শক্ত পীড়া জন্মিয়াছিল, প্রায় দুই বৎসর সেই ব্যাধি যন্ত্রণা-ভোগ করিয়া তিনি লোকান্তরে গমন করেন। ভবরত্ন তাঁহাকেও কতক কতক চিনিয়াছিল, তিনিও চলিয়া গেলেন, ভবরত্নের চক্ষে সমস্তই অন্ধকার। মাতামহী ছিলেন না, দুটী মাতুল ছিল, তাহারা বিদেশে চাকরী উপলক্ষে পরিবার লইয়া বাস করিত, সংসারে কিছুমাত্র সাহায্য করিত না; অধিক কথা কি, বৃদ্ধ পিতার সংবাদমাত্র লইত না। তাহাদের ভরসা মিথ্যা! তাহার যে ভগিনীপুত্রকে বাটীতে রাখিয়া প্রতিপালন করিবে, সে আশা ছিল না। যোগমায়ার একটী মাসী ছিলেন, তিনিই তখন সেই সংসারের একমাত্র অভিভাবিকা। ভবরত্ন তাঁহাকে মানিত না, তাঁহার কথা শুনিত না, তিনি ডাকিলে নিকটে যাইত না, হাত ধরিয়া আদর করিতে আসিলে বালক অধীর হইয়া কাঁদিয়া ভাসাইত।

অতি নিকট-প্রতিবাসীর মধ্যে একজন ভট্টাচার্য্য ছিলেন, তাঁহার নাম রঘুনাথ তর্কবাগীশ। সম্পর্কে তিনি যোগমায়ার মাতুল হইতেন, যোগমায়ার মাসী তাঁহাকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন। মাসীর নাম সর্ব্বমঙ্গলা। ভবরত্নের অবাধ্যতা শ্রবণ করিয়া তর্কবাগীশ মহাশয় একদিন সর্ব্বমঙ্গলাকে বলিলেন, "দেখ মঙ্গলা! ছেলেটীকে পাঠশালে দাও; সাত বৎসর বয়স হইয়াছে, আর কি! মা বাপ নাই বলিয়া ছেলেকে মূর্খ করিয়া রাখা ভাল কথা নয়। আরও কি জানো, পাঠশালে না দিলে ঐ রকমে বেদাব হইয়া যেখানে সেখানে বেড়াইবে, কোন্ দিকে ছুটিয়া পলাইবে, কোথায় কবে কি রকমে হয় তো বিথোরে মারা যাইবে, সেটাও তো ভাবিতে হয়। পাঠশালে দাও। সকাল বিকাল দুই বেলা সেখানে আটক থাকিবে, বেশী দৌরাত্ম্য করিতে পারিবে না, অবশ্য অল্প হইলেই ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া আসিবে।"

সপ্তমবর্ষীয় বালক ভবরত্ন পাঠশালে প্রেরিত হইল। সেই পাঠশালে যিনি শিক্ষা দিতেন, তিনি ভবরত্নের পিতৃকুলের পরিচয় জানিতেন। ভবরত্ন তাঁহার

নিকটে বর্ণপরিচয় শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু শিক্ষার দিকে মন থাকিল না। গুরুমহাশয় তাহাকে কিছু কিছু শিখাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন, আগ্রহ বিফল হয়। সর্ব্বমঙ্গলাদেবী ভবরত্নকে বেশ আদর-যত্ন করেন, সন্ধ্যার পর কাছে বসাইয়া নানাপ্রকার রাজারাণীর গল্প বলেন, লেখাপড়া শিখিলে তুমিও রাজা হইতে পারিবে, এই কথা বলিয়া শিশুকে লেখা-পড়ায় মনোযোগী করিবার চেষ্টা পান। গুরুমহাশয়ের চেষ্টা বিফল হইতেছিল, সর্ব্বমঙ্গলার চেষ্টা বিফল হইল না, ছয়মাস ঐরূপ গল্প শুনিতে শুনিতে, ঐরূপ উপদেশ পাইতে পাইতে বালকের মন অন্যদিকে ফিরিল; লেখাপড়ায় মনোযোগ হইল।

স্বভাবতঃ ভবরত্ন বেশ বুদ্ধিমান্; শৈশবাবধি প্রতিভার বিকাশ হয়, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। গুরুমহাশয় বুঝিলেন, ভবরত্ন একটী প্রতিভা, ইহার প্রতিভা-শক্তি এক সময়ে দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত হইবে! ইহা স্থির করিয়া তিনি যত্ন পূর্ব্বক ঐ বালককে পাঠশিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। অন্য বালক এক বৎসরে যাহা শিক্ষা করে, ভবরত্ন তিনমাসে তাহা আয়ত্ত করিয়া লয়। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সে সময়ে এখনকার ন্যায় শিক্ষাপ্রণালী ছিল না। কতক কতক নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইতেছিল, কিন্তু গ্রাম্য পাঠশালায় পূর্ব্বপ্রণালী সম্পূর্ণ-রূপে সংশোধিত হয় নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের দশবৎসর পূর্ব্বের কথা। তিন বৎসর পাঠশালায় লেখা-পড়া শিখিয়া ভবরত্ন পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করিল। যতদূর শিখিল, তাহার অধিক সে পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়া হইত না, সীমার বাহির হইলে গুরুমহাশয়কেও হাত গুটাইতে হইত। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল; গুরুমহাশয় হাত গুটাইলেন, ভবরত্নের গ্রাম্যবিদ্যা সমাপ্ত।

ভবরত্নকে লইয়াই আমাদের কথা। অপরাপর ছাত্রের কি হইল, তাহা আমাদের জানিবার প্রয়োজন নাই। ভবরত্নের পাঠ সাঙ্গ হইল, ভবরত্ন আর পাঠশালায় আসিবে না, সর্ব্বমঙ্গলার নিকটেই থাকিবে, আমাদের পাঠক-মহাশয়েরা হয় তো ইহাই মনে করিয়া লইতেছেন; কিন্তু বাস্তবিক সেরূপ ঘটনা হইল না। পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত হইল বটে, কিন্তু অন্য পাঠের জন্য ভবরত্নকে প্রস্তুত হইতে হইল। সে পাঠ গুরুমহাশয়ও জানিতেন না, ভবরত্নের জানিবারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। সংসারে প্রবেশ করিবার অগ্রে সংসারের এক ভয়ঙ্কর পাঠের অভিনয়ে ঐ দশমবর্ষীয় বালককে মহলা দিতে হইল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ঐ পাঠশালার গুরুমহাশয়টী ভবরত্নের পিতৃকুলের পরিচয় জানিতেন। ইতিমধ্যে একদিন ডাকযোগে তিনি একখানি পত্র পান; পত্র-খানি দীর্ঘ, পত্রে অনেক কথা লেখা ছিল; গুরুমহাশয় সেই দীর্ঘ পত্র পাঠ করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ ভবরত্নের দিকে কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন, এক এক সময় তাঁহার চক্ষে জল আসিয়াছিল। কারণ কি, তাহা কেহ জানিতে পারেন নাই, গুরুমহাশয়ও কাহাকে কিছু বলেন নাই। সর্ব্বমঙ্গলা যে দিন ভবরত্নের গৃহে যাইবার বিলম্ব দেখিয়া অন্বেষণের নিমিত্ত পাঠশালায় উপস্থিত হন, গুরু-মহাশয় সেই দিন তাঁহাকে বলেন, "ভবরত্ন আর তোমার কাছে যাইবে না, উচ্চ-শিক্ষার জন্য ভবরত্নকে একটী উত্তম স্থানে পাঠাইতে হইবে; ভবরত্নের অতি নিকট-আত্মীয় একটী ভদ্রলোক সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবেন, এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন। যত দিন সেখানে প্রেরণ করিবার সুবন্দোবস্ত না হয়, তত দিন ভবরত্ন আমার কাছে থাকিবে। তুমি গৃহে গমন কর, ভবরত্নের জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই; ভবরত্ন সেখানে সর্ব্বপ্রকার সুখে বাস করিবে। উদ্বেগ ত্যাগ করিয়া তুমি গৃহে চলিয়া যাও।"

ভবরত্ন সেইখানেই উপস্থিত ছিল, তাহার দিকে চাহিতে চাহিতে নেত্রজল মার্জ্জন করিতে করিতে সর্ব্বমঙ্গলাদেবী অগত্যা তথা হইতে একাকিনী ফিরিয়া আসিলেন, গুরুমহাশয়ের আশ্রমে ভবরত্ন রহিল।

নদীয়া জেলার গঙ্গাতীরে ভবানন্দপুর। শান্তিপুরের দক্ষিণাংশে ঐ নামে একখানি গ্রাম ছিল, সে নাম এক্ষণে বদল হইয়া গিয়াছে. বিশেষতঃ কয়েক বর্ষ-ব্যাপী মারীভয়ে তথাকার ভদ্র ভদ্র অধিবাসী লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উঠিয়া গিয়াছেন, গ্রামের অধিকাংশ স্থান এক্ষণে নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ভবরত্নের পিত্রালয় ছিল সেই ভবানন্দপুরে, সেই ভবানন্দপুরেই ভবরত্নের জন্ম, এই কারণেই ভবানন্দপুরের ভবরত্ন চৌধুরী পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ভবরত্নের মাতামহাশ্রম হুগলী জেলার গঙ্গাতীরে।

ভবরত্ন এখন কোথায়? সর্ব্বমঙ্গলাদেবী গুরুমহাশয়ের পাঠশালা হইতে গৃহে চলিয়া গেলেন, গুরুর আশ্রমে ভবরত্ন রহিল, এই পর্য্যন্তই বলা হইয়াছে, তাহার পর দশ বৎসর কাল ভবরত্ন কোথায় ছিলেন, সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

সিপাহীবিদ্রোহের দশ বৎসর পূর্ব্বে ভবরত্নের বয়স ছিল দশ বৎসর; ভবরত্ন এখন নিকটে থাকিলে বলা যাইতে পারিত, ভবরত্নের বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষ। ভবরত্ন বাঁচিয়া আছে কি না, এই দশবৎসর কাল কেহ সে কথা জিজ্ঞাসা করে নাই। কেই বা জিজ্ঞাসা করিবে? সংসারে যাহার মাতাপিতা নাই, স্নেহাস্পদ সহোদর নাই, শিশুকালে যাহাকে দেশত্যাগী করা হয়, তাহার তত্ত্ব লইবে কে? কেবল এইটুকু মাত্র জানা হইয়াছিল যে, সর্ব্বমঙ্গলার বিদায়ের অষ্টাহ পরে সেই পাঠশালার গুরুমহাশয় ভবরত্নকে স্থানান্তরিত করিয়া দিয়াছেন। কোথায় পাঠাইয়াছেন, কেহই তাহা জানিত না। পাঠশালার গুরুমহাশয় একটী মাতৃপিতৃহীন বালককে কি কারণে বিদেশে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কি স্বার্থ ছিল, তিনিই তাহা জানেন। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই বালককে স্থানান্তরিত করিয়াছেন কিম্বা অন্য কাহারও উপদেশ ছিল, তাহাও প্রকাশ নাই।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসের প্রথম দিবসে ভারতরাজ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তচ্যুত হইয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার খাস হয়; তদুপলক্ষে কলিকাতা রাজধানীতে মহারাণীর নূতন ঘোষণাপত্র পঠিত হইয়াছিল; সেই দিনটী মহোৎসবের দিন বলিয়া সমস্ত লোকে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কলিকাতা নগরে ঘরে ঘরে নিশাকালে সমুজ্জ্বল দীপমালা শোভিত হইয়াছিল; বিশেষতঃ গড়ের মাঠে সমারোহের সীমা ছিল না; আলোকমালা এবং আতসবাজী প্রকৃতি দর্শনার্থ নানাস্থানের বহুলোক গড়ের মাঠে জমা হইয়াছিল। সে সময় কলিকাতা সহরে গ্যাস-লাইটের নূতন প্রবর্ত্তন; ইংরাজটোলার দুটী পাঁচটী বড় বড় রাস্তায় এবং দুটী পাঁচটী প্রসিদ্ধ অট্টালিকায় গ্যাসের আলো জ্বলিয়াছিল; ময়দানের সমুচ্চ মনুমেণ্ট-স্তম্ভ আগা-গোড়া আলোকমণ্ডিত করিবার জন্য তৈলপূর্ণ শিশি ঝুলাইয়া দিয়া সন্ধ্যাকালে জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছিল, দর্শক লোকেরা সেই রজনীতে ঐ স্তম্ভটীকে রত্নমণ্ডিত বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন। বাস্তবিক সেই রজনীতে অন্ধকারলোনী মনুমেণ্টটী সত্যই যেন মণিহার অঙ্গে পরিয়াছিল।

বহুলোকের সমাগম। কোন্ দেশ হইতে কত লোক আসিয়াছিল, তামাসা দর্শন করিয়া তাহাদের মধ্যে কে কোথায় গেল, কে কোথায় রহিল, সে কথা কে বলিবে? একটী লোক শূন্য-হস্তে সমস্ত রাত্রি নগরের পথে পথে ভ্রমণ করিয়া শেষরাত্রে গঙ্গাতীরের একটী বাঁধাঘাটের চাঁদনীতে শয়ন করিয়াছিল। দুইজন পাহারাওয়ালা তাহাকে তুলিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, বিদেশী নিরাশ্রয় বলিয়া লোকটী পরিচয় দেয়; রাত্রিকালে ভিন্ন ভিন্ন রাস্তাতেও এক এক জন পুলিস-প্রহরী তাহার পরিচয় চাহিয়াছিল, তাহাদের নিকটেও ঐরূপ পরিচয়। সঙ্গে কোন জিনিসপত্র ছিল না; সেই জন্য আটক করিয়া রাখে নাই; কিন্তু শেষরাত্রে গঙ্গার ঘাটে যাহারা ধরিল, তাহারা তাহাকে থানায় লইয়া যাইতে চাহিল। বিনা অপরাধে পুলিসের থানায় কেন যাইবে, এই ভাবনা করিয়া লোকটী কিছু ম্রিয়মাণ হইল।

লোকটীর চেহারা অতি সুন্দর। দিব্য গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকার, সুলাঙ্গ, দীর্ঘ নাসা, দীর্ঘ নেত্র, প্রশস্ত ললাট, দীর্ঘ কেশ, কর্ণমূল হইতে উভয় গণ্ডের উভয় পার্শ্বে মসৃণ চামর সদৃশ সুন্দর গালপাট্টা, দিব্য চোমরা গোঁফ, পরিধান হিন্দুস্থানী ধরণের সবুজবর্ণ চুড়িদার পায়জামা, তাহার উপর দীর্ঘ আলখাল্লার ন্যায় বুকবন্ধ চাপ্‌কান, মস্তকে রক্তবর্ণ পাগড়ী। বয়স অনুমান একুশ কি বাইশ বৎসর।

পুলিসের লোকের সঙ্গে ঐ লোকটীর যখন বচসা হয়, রাত্রি তখন অধিক ছিল না; লোকটী বলিতেছিল, "থানায় আমি যাইব না, যাহারা অপরাধ করে, তাহারাই থানায় যায়, আমি কোন অপরাধ করি নাই, আমাকে তোমরা কেন ধর?" পুলিস বলিতেছে, "আল্‌বোৎ যানে হোগা।" উভয় পক্ষই অতঃপর হিন্দি কথা আরম্ভ করিল। পাহারাওয়ালাদের কথা অপেক্ষা সেই অপরিচিত লোকটীর হিন্দী বিশুদ্ধ। লোকটী যেন দস্তুরমত হিন্দি ভাষা শিক্ষা করিয়াছে কিম্বা হিন্দুস্থানে তাহার জন্ম, ভদ্রসমাজের রীতি-নীতিতে সুশিক্ষিত, কথাবার্ত্তা শুনিলে তাহাই প্রতীত হয়।

কথায় কথায় রাত্রি শেষ হইয়া আসিল, উষাকাল উপস্থিত। কার্ত্তিকমাস। এই মাসে নগরের অনেক নরনারী গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করেন। যে ঘাটে ঐরূপ বচসা হইতেছিল, একটী ভদ্রলোক উষাকালে সেই ঘাটে স্নান করিয়া চাঁদনীতে দাঁড়াইয়া বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে একজন চাকর ছিল, চাকরের হস্তে একগাছি লাঠী আর বাবুটীর তর্পণের কোশাকুশি সঙ্গে গাড়ী ছিল না, বাবু পদব্রজে আসিয়াছেন, পদব্রজেই গৃহে যাইবেন, এইরূপ ব্যবস্থা

ছিল। পুলিসের সঙ্গে একটী বিদেশী লোকের জোর জোর তর্ক-বিতর্ক হইতেছে শুনিয়া সেই বাবুটী তাহাদের নিকটে অগ্রসর হইলেন, কি কারণে বিবাদ, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। পুলিস বলিল পুলিসের কথা, লোকটী বলিল তাহার নিজের কথা। অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া প্রহরীদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক মধ্যবর্ত্তী বাবুটী কহিলেন, "কেন তোমরা এই লোকটীকে আটক করিতে চাহিতেছ? চেহারা দেখিয়া বোধ হইতেছে, ভদ্রলোকের সন্তান; সঙ্গে এমন কোনও জিনিষ পত্র নাই, যাহা দেখিলে কোনও প্রকার সন্দেহ জন্মিতে পারে। বিদেশী লোক, কলিকাতায় উৎসব দেখিতে আসিয়াছে, তাহাকে ধরিয়া পুলিসে লইয়া যাইবার কোনও আইন নাই। তোমরা অবশ্য ঘাঁটীর প্রহরী, কর্ত্তব্যকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভদ্রলোকের স্নানের ঘাটে এতক্ষণ বৃথা সময় নষ্ট করিয়া, রিপোর্ট করিলে তোমাদের পক্ষে মঙ্গল হইবে না; তবে অনেকক্ষণ পরিশ্রম করিয়াছ, কিছু জলপানি লইয়া চলিয়া যাও, নির্দ্দোষ লোকটীকে আমার জিম্মায় ছাড়িয়া দাও।" বাবুর ইঙ্গিতে বাবুর চাকর ঐ দুইজন পাহারাওয়ালাকে দুটী সিকি দিল, তাহারা বক্সিস পাইয়া সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। বলা উচিত প্রহরীরা ঐ বাবুকে চিনিত।

প্রহরীরা বিদায় হইলে বাবু সেই লোকটীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকটী বলিল, "আমি তীর্থপর্য্যটক, নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া কাশীধামে গিয়াছিলাম, ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নের অভিলাষে তিন বৎসর কাশীতে ছিলাম, সাহেবের সিপাহীরা ক্ষেপিয়া উঠিয়া সাহেবলোকের উপর দৌরাত্ম্য করিতেছে, লোকমুখে সেই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলাম, সম্প্রতি শুনিলাম, বিদ্রোহের শান্তি হইয়াছে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত-শাসনভার সহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, এই উপলক্ষে ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানের প্রধান প্রধান নগরে মহোৎসব হইবে; অন্যান্য স্থানাপেক্ষা রাজধানীর মহোৎসবে সমধিক সমারোহ হওয়াই সম্ভব, ইহা ভাবিয়া আজ তিনদিন হইল আমি কলিকাতায় আসিয়াছি। বাগবাজারের মদনমোহনজীর বাড়ীতে অতিথি হইয়া দুই রাত্রি বাস করিয়াছি। গতরাত্রে নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে এইঘাটে শয়ন করিয়াছিলাম।"

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি? নিবাস কোথায়?" লোকটী উত্তর করিল, "কাশীর অধ্যাপকেরা আমার নাম দিয়াছেন শিবপ্রসাদ পণ্ডিত। পর্য্যটকের নিবাস বলিবার প্রয়োজন নাই, যেখানে যখন উপস্থিত হইয়াছি,

সেই স্থানেই তখন নিবাস হইয়াছে, সুতরাং নিশ্চয় করিয়া নিবাস বলিতে পারিব না।"

পণ্ডিত শিবপ্রসাদ এইরূপ পরিচয় দিলেন, কোথায় জন্মস্থান, প্রকৃত কি নাম, তাহা কিছু প্রকাশ করিলেন না; জাতির পরিচয়ে কেবল এইটুকু প্রকাশ পাইল যে, তিনি ব্রাহ্মণ।

পরিচয়ের প্রশ্ন আর কিছু না বাড়াইয়া বাবু শেষকালে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কি তোমার পর্য্যটনে যাইবার ইচ্ছা আছে?" শিবপ্রসাদ উত্তর করিলেন, "আপাততঃ এই রাজধানীতে কিছুদিন অবস্থান করিবার ইচ্ছা করি; তাহার পর ভগবান্ যেখানে লইয়া যাইবেন, সেইখানেই যাইতে হইবে। কলিকাতায় থাকিব, এইরূপ অভিলাষ, কিন্তু আমার আশ্রয় নাই।"

একটু চিন্তা করিয়া বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, আমি তোমাকে আশ্রয় দিব; তুমি আমার সঙ্গে চল। ধর্ম্মশাস্ত্রে তোমার জ্ঞান জন্মিয়াছে, ইহা শুনিয়া আমি তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। কলিকাতায় থাকিয়া তুমি যাহা করিতে ইচ্ছা কর, তদ্বিষয়ে আমি তোমার সাহায্য করিব, আমার সঙ্গে তুমি আমার বাড়ীতেই চল।"

এই সময় গঙ্গাস্নানের অনেক যাত্রীতে ঘাট পরিপূর্ণ হইয়াছিল। বাবু তাঁহার চাকরকে একখানা ঠিকাগাড়ী ডাকিতে বলিলেন, তাঁহার সঙ্গে আসিতে শিবপ্রসাদ সম্মত হইলেন, গাড়ী আসিল, শিবপ্রসাদকে লইয়া বাবু আপন বাড়ীতে পৌঁছিলেন।

সিমুলিয়া পল্লীতে সেই বাবুর বাড়ী। বাগীখানি দিব্য বড়মানুষী কেতা নির্ম্মিত, বাহিরে ঘোড়া ঘোড়া গোল থামে সবুজবর্ণ ঝিলিমিলি দেওয়া টানা বারান্দা, সেই বারান্দার নীচে বড় বড় ঘরে দপ্তরখানা। ভিতরদিকে একখানি তিন-ফুকুরে দালান, তিনদিকে চক, মধ্যস্থলে প্রাঙ্গণ। অন্দরমহল কিরূপ, শিবপ্রসাদ তাহা দেখিলেন না। বাবু তাঁহাকে উপরের বৈঠকখানায় লইয়া বসাইলেন।

বাগীর জাঁকজমক যে প্রকার, দপ্তরখানার আড়ম্বর সে প্রকার, তদুপযুক্ত লোকজন দৃষ্ট হইল না। দপ্তরখানায় কেবল তিনটীমাত্র আমলা, তাহাদের মধ্যে দুইজন মুহুরী আর একজন প্রাচীন নায়েব অথবা সদর কর্ম্মচারী; দেউড়ীতে

কেবল একজনমাত্র দরোয়ান। যে চাকরটী গঙ্গাস্নানের সময় বাবুর সঙ্গে গিয়াছিল, সকল কার্য্যে শিবপ্রসাদ কেবল তাহাকেই তৎপর দেখিলেন, অন্য কোন চাকরকে দেখিতে পাইলেন না। ভাবগতিক দেখিয়া তিনি অনুমান করিলেন, বাবু হয় ত কিছু কৃপণ-স্বভাব।

বাবুর নাম ব্রজরত্ন চৌধুরী। তিনি একজন জমীদার, জমীদারী ছাড়া কলিকাতামধ্যে বাহাদুরী কাষ্ঠের কারবার আছে। পাঁচ সাত দিন থাকিতে থাকিতে শিবপ্রসাদ জানিতে পারিলেন, বাবুর বার্ষিক আয় প্রায় এক লক্ষ টাকা, খরচপত্র অতি সামান্য। তাঁহার পুত্র-কন্যা কেহই ছিল না, নিজেও তিনি সবল; তাঁহার একটী পত্নী আছেন, তাঁহার হাত কিছু দরাজ, সেই কারণে মধ্যে মধ্যে স্ত্রী-পুরুষে কলহ হয়। বাবু ব্রজরত্ন ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়াছেন, বক্তৃতা করিবার শক্তিও জন্মিয়াছে; ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগের সহিত হিন্দুধর্ম্মের বিচার করা তাঁহার একটী আমোদের কার্য্য। তিনি গঙ্গাস্নান করেন, গঙ্গায় তর্পণ করেন, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস অতি কম। তিনি স্পষ্টই বলেন, "পুরাণাদি শাস্ত্রে পরস্পর মিলন নাই, শাস্ত্রের অনেক কথাই মিথ্যা।" আজকাল যেরূপ দিন পড়িয়াছে, পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এমন উৎকট দিন ছিল না, তথাপি এক একটী ধূমকেতু দেখা দিতেন, তাঁহাদের সঙ্গে অনেকগুলি ছোট ছোট নক্ষত্র উদ্ভাসিত হইত; সেই সংযোগে জাতীয় ধর্ম্ম-বিপ্লব অল্পে অল্পে সংঘটিত হইয়া পড়িত। ব্রজরত্ন বাবু সেই দরের একটী ধূমকেতু। বয়স কিছু ভারী, কিন্তু আধুনিক নববঙ্গ-যুবকগণের মধ্যে যাঁহারা সহজ-জ্ঞানের মর্য্যাদা রাখিয়া চলেন, নূতন দন্ত উদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা দেশের সমস্ত আচার-ব্যবহারকে উপহাসে উড়াইয়া কথায় কথায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, ব্রজরত্নবাবু সেই দলের সমান মতাবলম্বী ছিলেন, ইহাই বুঝিয়া লইতে হয়।

পণ্ডিত শিবপ্রসাদ বারাণসীধামে ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন, সেই সুপারিসে তুষ্ট হইয়া বাবু ব্রজরত্ন চৌধুরী তাঁহাকে স্বগৃহে আনয়ন করিয়াছেন। কাশীর চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ কাব্য, দর্শন এবং পুরাণশাস্ত্রাদি শিক্ষার অতিরিক্ত বেদ বেদান্তের আলোচনা হইয়া থাকে। ব্রজরত্নবাবু বেদান্তের বিচার করিতেও ভয় করেন না; ন্যায়শাস্ত্রের ফাঁক ধরিয়া ভট্টাচার্য্য-মহাশয়েরা পরস্পর যেরূপ আমোদ-কৌতুক করিতে ভালবাসেন, বেদান্তের নিগূঢ় সারমর্ম্মের দিকে না

গিয়া তিনি কেবল ভাসা ভাসা কথায় সেইরূপে পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনের চেষ্টা পান। পণ্ডিত শিবপ্রসাদের সহিত সেই বিষয়ের বিচার হইবে, শিবপ্রসাদকে গৃহে রাখিলে অনেক দিন ধরিয়া বিচারের নাগাড় চলিবে, অপরাপর পণ্ডিত আসিলে শিবপ্রসাদকে সম্মুখে হাজির করিবেন, এই মৎলবেই আদর করিয়া অপরিচিত শিবপ্রসাদকে আনয়ন করা হইয়াছে।

বাবু ব্রজরত্ন কোন সুনিপুণ অধ্যাপকের নিকটে সংস্কৃত সাহিত্য শিক্ষা করেন নাই, সামান্য সামান্য ব্যাকরণ-শাস্ত্রজ্ঞ দুই একজন ভট্টাচার্য্যের মুখে গোটাকতক শ্লোক শ্রবণ করিয়া একখানি খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছেন, দুই একটী শ্লোক মুখস্থ করিয়াছেন, শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, প্রকৃত কি অপ্রকৃত, তাহা তাঁহার বুঝিবার ক্ষমতা অল্প; শ্লোকের উচ্চারণে কোথায় কিরূপ যতি-বিরামাদি রাখিতে হয়, তাহাও তাঁহার জানা ছিল না, তথাপি শিবপ্রসাদের সহিত বেদান্তের বিচারে তাঁহার সাহস হইয়াছিল। শিবপ্রসাদ সর্ব্বশাস্ত্রাপেক্ষা বেদান্তশাস্ত্রের প্রতি অধিক অনুরাগী, বেদান্ত-শিক্ষায় তিনি অধিক যত্ন করিয়াছেন, পল্লবগ্রাহী পণ্ডিত ব্রজরত্নবাবু একদিনের বিচারেই পরাস্ত হইয়াছিলেন, তথাপি পরাভবকে পরাভব বলিয়া স্বীকার না করিয়া পুনঃ পুনঃ গর্ব্বভরে অভিমানভরে নূতন নূতন বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন; মনে মনে হাস্য করিয়া পণ্ডিত শিবপ্রসাদ আপনার নূতন আশ্রয়দাতার মৌখিক অনুরোধ রক্ষা করিতেন; বিচার তাঁহার পক্ষে একটা কৌতুকের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল। বাবু শ্লোক পাঠ করিতেন, শিবপ্রসাদ তাহা শুদ্ধ করিয়া দিবার প্রয়াস পাইতেন, বাবু মনে মনে চটিতেন, মুখে কিছু প্রকাশ করিতেন না। তিনি ইচ্ছা করিলে শিবপ্রসাদের নিকট অনেকটা শিক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে অপমান হইবে, এইটী স্থির ভাবিয়া অহঙ্কারবশে সে চেষ্টা করিতেন না; নিজের জিদ্ বজায় করিবার জন্য তিনি কেবল গলাবাজী করিয়া জয়লাভের চেষ্টা করিতেন।

জিদ্ বজায় কদিন চলে? ক্রমাগত দুইমাসকাল শিবপ্রসাদের সহিত কুতর্ক-বিচারে পরাভূত হইয়া তিনি তখন অন্যদিকে মন ফিরাইলেন। একদিন সন্ধ্যার পর, কেহ যখন নিকটে ছিল না, সেই সময় শিবপ্রসাদকে ডাকিয়া, সুমিষ্ট সম্ভাষণে তিনি কহিলেন, "দেখ শিব! তুমি বালক, শাস্ত্রে তোমার অধিকার জন্মে নাই, ধর্ম্মের বিচার বড় শক্ত কথা, সে বিচারে তুমি এখন আর কাহারও সহিত তর্ক

করিও না। তুমি বুদ্ধিমান্, অনেক পরিচয়ে তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তোমাকে আমি রাখিব। প্রথমেই তুমি আমাকে বলিয়াছ, তোমার আশ্রয় নাই, দেখ শিব, সে জন্য তুমি ভাবিও না; আমি তোমাকে পুত্রতুল্য স্নেহ-যত্ন করিব। এখন আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, শাস্ত্রাভ্যাস ভিন্ন তুমি আমাদের দেশের ব্যাবহার্য্য আর কি কি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ?"

অনেকক্ষণ বাবুর মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া শিবপ্রসাদ উত্তর করিলেন, "কি কি বিদ্যা আমি অভ্যাস করিয়াছি তাহার উত্তর আমি দিতে পারিব না। কেন না, বিদ্যার শেষ নাই, সংখ্যা নাই, শিক্ষার সীমাও নাই। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, যখন আমি বাঙ্গালাদেশে ছিলাম, তখন চলনসই বাঙ্গালা ভাষা এবং গণিতশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি; তাহার পর, একটী আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া অল্প অল্প ইংরাজীও অধ্যয়ন করিয়াছি; হিন্দুস্থানে পর্য্যটন করিবার সময় কিছু কিছু হিন্দীভাষা শিক্ষা হইয়াছে; হিন্দুস্থানী লোকের হিন্দীকথা বুঝিতে পারি, হিন্দুস্থানীকে বুঝাইবার মত হিন্দীকথাও বলিতে পারি। সর্ব্বশেষে কাশীধামে সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাহিত্য এবং ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা করা হইয়াছে।"

একটু চিন্তা করিয়া বাবু কহিলেন, "অত কথা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি না, তুমি কেবল বৃথা পর্য্যটন কর নাই, তাহা আমি বুঝিয়াছি। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, জমীদারী বিষয়কার্য্য তোমার জানা আছে কি না?"

শিবপ্রসাদ বলিলেন, "পুস্তকপাঠে যতদূর জানা যায়, তাহা আমি আয়ত্ত করিয়াছি, কিন্তু হাতেকলমে কোথাও কোন জমীদারীকার্য্য আমি করি নাই।"

বাবু ব্রজরত্নের লম্বা লম্বা দাড়ী ছিল, অর্দ্ধেক চুল পাকা, অর্দ্ধেকগুলি কাঁচা; অযত্নে বামহস্ত দ্বারা সেই দাড়ীতে ঢেউ খেলাইতে খেলাইতে গম্ভীরবদনে তিনি বলিলেন, "বেশ বেশ, প্রণালী-শিক্ষা করা থাকিলেই দেখিতে দেখিতে কার্য্য-পটুতা জন্মিয়া থাকে। আমার সেরেস্তায় পাকা পাকা মুহুরী আছে, তাহারা তোমাকে সকল কার্য্য শিখাইয়া দিবে; দুই একমাস দেখিলেই অতি সহজে তুমি সমস্ত কার্য্য শিখিয়া লইতে পারিবে। সেই কথাই ভাল। তুমি আমার সেরেস্তাতেই কাজ-কর্ম্ম শিক্ষা কর, পরিপক্কতা জন্মিলে আমি তোমার উপযুক্ত বেতন ধার্য্য করিয়া দিব। তোমার যেরূপ বুদ্ধি-চাতুর্য্য দেখিতেছি, তাহাতে আমার প্রত্যয় জন্মিতেছে, অল্পদিনের মধ্যেই তুমি আমার সেরেস্তার প্রধান

কর্ম্মচারীর পদ অধিকার করিতে পারিবে। কল্য অবধি সেরেস্তার কার্য্যেই তুমি নিযুক্ত থাকিও।"

শিবপ্রসাদ সম্মত হইলেন। অন্তরে তখন তাঁহার দুটী ভাব। একভাবে বিষয়কার্য্যের উল্লাস, দ্বিতীয়ভাবে অন্তরে অন্তরে বিস্ময়ের উদয়। শেষের ভাবটী কি কারণে, সেটী তাঁহার মনেই রহিল; সময়ে হয় তো প্রকাশ পাইবে।

কার্য্যক্ষেত্রে সেই দুটী ভাব গোপন রাখিয়া, বিনীতভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া শিবপ্রসাদ কহিলেন, "মহাশয়! আপনি আমার আশ্রয়দাতা, আশ্রয়দাতা পিতৃ-তুল্য, আপনার চরণে আমি প্রণিপাত করি। আমার মাত-পিতা ছিলেন, তাঁহা-দিগকে আমার মনে পড়ে না; আর কেহ আমার আপনার লোক আছেন কি না, তাহাও আমি জানি না; সংসার-সাগরে আমি ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছিলাম; সন্ন্যাসী নহি, তথাপি সর্ব্বদা মনে হইত, আমি যেন উদাসীন। অকূল সাগরে এখন আমি কূল প্রাপ্ত হইলাম। আপনি আমার প্রতি সদয় হইয়াছেন, আপনি আমাকে পুত্রতুল্য স্নেহ করিতেছেন, ইহাতে আমি জীবন সার্থক জ্ঞান করিতেছি।"

বাবু সেই সকল কথা ভাল করিয়া কাণ দিয়া শুনিলেন কি না, তাহা বুঝা গেল না, একটু যেন অন্যমনস্ক হইয়া কহিলেন, "আর দেখ, আমি তোমাকে বিশ্বাসী পাত্র বলিয়া জানিয়াছি, হিসাবপত্র রাখিবার সময় খুব সাবধান থাকিও, জমাখরচে নিত্য নিত্য কৈফিয়ৎ কাটা হয়, যত টাকা তহবিলে মজুত থাকে, তাহার একটা হিসাব তুমি তোমার নিজের কাছে রাখিও, প্রতিদিন রাত্রিকালে সেই হিসাবের একটা নকল আমাকে দিও।"

শিবপ্রসাদ নমস্কার করিলেন। কথা-প্রসঙ্গে বাবু তাঁহাকে আরও অনেক প্রকার উপদেশ দিলেন. সে সকল উপদেশের সহিত বিষয়-কর্ম্মের সম্বন্ধ অল্প, অতএব সেগুলি এখানে উল্লেখ করা অনাবশ্যক বোধ হইল।

জমাদারী সেরেস্তায় শিবপ্রসাদ মুহুরী হইলেন। সেরেস্তার মুহুরীরা তাঁহাকে কাজ-কর্ম্ম শিখাইয়া দেয়, বৃদ্ধ নায়েব তাঁহার কাজকর্ম্ম দেখেন, শিবপ্রসাদ দিন দিন সমস্ত কার্য্য মন দিয়া শিখিতে লাগিলেন। দুই বৎসর গত হইল। সেরে-স্তার যে সকল কার্য্য অতিশয় কঠিন, শিবপ্রসাদ ক্রমে ক্রমে সে সকল কার্য্যের অন্ধি-সন্ধি বুঝিয়া লইলেন। তাঁহার স্মরণশক্তি বিলক্ষণ প্রখর ছিল, যেগুলি স্মরণ রাখিতে হয়, বিদ্যালয়ের পাঠের ন্যায় তাহা তিনি মুখস্থ করিয়া রাখেন।

বাবু মধ্যে মধ্যে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করেন, খাতাপত্র না দেখিয়া শিবপ্রসাদ মুখে মুখে ঠিক ঠিক তাহার উত্তর দেন। বাবু বড়ই সন্তুষ্ট হন।

আরও এক বৎসর অতিক্রান্ত। বৃদ্ধ নায়েবের মৃত্যু হইল, শিবপ্রসাদ নায়েব হইলেন।

নায়েবী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শিবপ্রসাদ পণ্ডিত ছয়মাসকাল যেরূপ সুনিয়মে কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন, তাহা দর্শন করিয়া বাবুর প্রত্যয় জন্মিল, তিনি স্বয়ং এখন অধি বিষয়-কার্য্য না দেখিলেও কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিবে না; ইহা স্থির জানিয়া বিষয়-কার্য্য হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করিলেন।

অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি করিলেন কি? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাঁহার বক্তৃতা-শক্তি উত্তম; সমাজ-সংস্কারে তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ। অবকাশপ্রাপ্ত হইয়া সেই শক্তির চালনায় তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। যে সময়ের কথা, সে সময় কলিকাতায় বক্তার সংখ্যা অধিক ছিল না; এখন যেমন বিদ্যালয় হইতে বাহির হইলেই শিক্ষিত ছাত্রেরা দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করেন, যে বিষয়ে যাঁহার অধিকার নাই, সেই বিষয়ের চর্চ্চা করেন, তখনকার দিনে এমন ছিল না। একজন সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ছিলেন, তিনি মাননীয় রামগোপাল ঘোষ। তিনিও সমাজ-সংস্কারের দিকে ঢলিয়া পড়েন নাই: রাজনীতির আন্দোলনে, জমীদারীর বন্দোবস্তে এবং আইন-আদালতের তর্কে তাঁহার অধিক সময় ব্যয় হইত; সমাজের সম্বন্ধে যাহা যখন তিনি বলিতেন, তাহা প্রাচীন রীতি-নীতির রক্ষণ-বিষয়ে অনুকূল হইত। রাজপুরুষেরা যদি এ দেশের ধর্ম্মানুগত সমাজ-প্রচলিত কোন বিষয়ে পরিবর্ত্তন-চেষ্টা পাইতেন, যাহাতে হিন্দু-হৃদয়ে কোন প্রকার ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত লাগে, এমন কোন প্রস্তাব যদি উত্থিত হইত, বাবু রামগোপাল ঘোষ ন্যায়ানুগত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া সেই সকল প্রস্তাবের সুদৃঢ় প্রতিবাদ করিতেন; তাহাতে আশামত সুফলও ফলিত। এখনকার মত সমাজ-সংস্কারের তুফানও তখন ছিল না।

বাবু ব্রজরত্ন চৌধুরী সমাজ-সংস্কারের বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। কি করিলে হিন্দু-সমাজের মঙ্গল হয়, তাহাই চিন্তা করিয়া তিনি মনঃকল্পিত পরিবর্ত্তনের অনুরোধ করিতেন, এই এই প্রথা মন্দ, এই এই প্রথার পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তীব্রতর হেতুবাদ দেখাইয়া তাহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইতেন। তখন

হিন্দুসন্তানের বিলাত-যাত্রার ধুমধাম ছিল না, কালাপানি পার হইলে হিন্দু-সন্তানের জাতি যায়, ইহাই সকলের ধারণা ছিল। রাজা রামমোহন রায় বিলাতে গিয়াছিলেন, তিনি আর দেশে ফিরিয়া আইসেন নাই; বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া তিনিও হিন্দু সমাজের সংস্কার-বদলের চেষ্টা পান নাই; সে খাটা এক প্রকার চাপা পড়িয়াই গিয়া ছিল। ব্রজরত্ন বাবু হিন্দুর বিলাত-যাত্রার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই; তাঁহার বক্তৃতার সার মর্ম্ম ছিল, জাতিভেদ উঠাইয়া দেওয়া আর প্রতিমাপূজা রহিত করা। তাঁহার নিজের আহার-ব্যবহার কি প্রকার ছিল, সকলে তাহা জানিতেন না। তবে, কেবল এটুকু মাত্র প্রকাশ ছিল যে, জাতিভেদ মানিতেন না; সুবিধা ঘটিলে সাহেবের সঙ্গে খানা খাইতেও তিনি আমোদ অনুভব করিতেন। খানা খাইবার সময় সাহেবের সঙ্গে কথা কহিতে হয়, বাবু ব্রজরত্নের ভালরূপ ইংরাজী জানা ছিল না, সেই কারণে বড় একটা তিনি খানার মজলীসে যোগ দিতে যাইতেন না। বক্তৃতা করিবার সময় কিন্তু আহার-বিহারে কোন দোষ নাই বলিয়া সকলকে শিক্ষা দিতেন। কেবল শিক্ষা দিয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন না, প্রত্যেক বক্তৃতার বৈঠকে তিনি স্পষ্ট স্পষ্ট বলিতেন, জাতিভেদ উঠাইয়া না দিলে কস্মিন্‌কালেও ভারতবর্ষের উন্নতি হইবে না। আজকাল যাঁহারা সমাজ-সংস্কারের বক্তৃতা করেন, তাঁহারা ঐ কথাটার উপরেই বেশী জোর রাখেন; নবীন নবীন বক্তারা উহার উপর আরও দুই তিন মাত্রা চড়াইয়া দেন। তাঁহারা বলেন, সর্ব্বজাতির সহিত আহার-ব্যবহার যেমন প্রয়োজন, সর্ব্বজাতির পুত্র-কন্যার পরস্পর আদান-প্রদানও তদ্রূপ প্রয়োজনীয়। বাঙ্গালার হিন্দুরা ক্রমশ দুর্ব্বল হইতেছে, কোন বলবান্ জাতির সহিত তাহাদের কন্যার বিবাহ চলিলে বলবান্ সন্তান জন্মিবে, ক্রমশ আবার এই হীনবীর্য্য বাঙ্গালীজাতি বীরজাতি হইয়া উঠিবে। একবার একজন ধুরন্ধর বক্তা প্রস্তাব করিয়াছিলেন, বিলাতের গোরার সহিত বাঙ্গালী-কন্যার বিবাহ হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে সেই সকল কন্যার গর্ভে বীরপুত্র জন্মিবে, সাহেবেরা আদর করিয়া সেই সকল পুত্রকে ইংরাজ-সেনাদলে গ্রহণ করিবেন, বাঙ্গালীর দুর্ব্বল অপবাদ দূর হইয়া যাইবে, পরস্পর সহানুভূতি বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। বাবু ব্রজরত্ন চৌধুরীর মস্তকে ততদূর উচ্চভাবের উদয় হয় নাই; তিনি কেবল প্রতিমার উপর আর হিন্দুজাতির উপর দেশের অবনতির

প্রধান হেতু নির্ভর করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার আর একটী গুণ ছিল. সকল স্থলেই তিনি বলিতেন, হিন্দুরা ধর্ম্মবিশ্বাসে কপটাচারী; প্রতিমা-পূজা, হরিনাম জপ, হরিমূত্তিকার ফোঁটা, হরিনামাবলী ইত্যাদি ধর্ম্মভাণে চরিত্র ঢাকিবার ছলে হিন্দুরা অনেক অসৎকার্য্য করিয়া থাকে, সদাচার তাহাদের কাছে লজ্জায় ম্রিয়মাণ। এই ভাণ পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু যদি সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, অপ্রবঞ্চক, সরল এবং পরোপকারী হয়, তাহা হইলে সভ্যতম ইংরাজজাতি এই হিন্দুকে যথেষ্ট সমাদর করিতে পারেন। বাঙ্গালী-হিন্দুর ঐ সকল গুণ নাই বলিয়া ইংরাজেরা তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। জাতি-পরিচয়ে ইংরাজী ভূগোলে বর্ণিত আছে, "বাঙ্গালী বুদ্ধিমান্ বটে, কিন্তু ভীরু, ধূর্ত্ত এবং অসাধু।" লর্ড মেকলে বাঙ্গালী-চরিত্রে লিখিয়া গিয়াছেন, "ব্যাঘ্রের যেমন নখর, মহিষের যেমন বিষাণ, ভীমরুলের যেমন সুতীক্ষ্ণ হুল, বাঙ্গালীর প্রবঞ্চনাও তদ্রূপ।" বড় বড় ইংরাজেরা বাঙ্গালীর প্রতারণা-বুদ্ধিকে অধিক তেজস্বিনী বলিয়া নিন্দা করেন। সেই নিন্দার হেতু যাহাতে দূর হয়, সাধ্যানুসারে সেই চেষ্টা করা বাঙ্গালীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই প্রকার নানা প্রসঙ্গ লইয়া, নানা প্রকারে হিন্দুর নিন্দা করিয়া, কল্পিত অপবাদে হিন্দুধর্ম্মকে অসত্য বলিয়া ব্রজরত্নের বক্তৃতার উপসংহার হইত। বাঙ্গালী-চরিত্রে নানা দোষ, বক্তামহাশয়ের মৌখিক ব্যাখ্যা ঐরূপ। তিনিও অবশ্য বাঙ্গালী ছিলেন, বক্তৃতা করিবার সময় হয় তো সেটা তাঁহার মনে থাকিত না কিম্বা হয় তো তিনি আপনাকে সর্ব্বাংশে নিষ্কলঙ্ক মনে করিতেন। কেবল মনে করিয়াই মনের কথা লুকাইয়া রাখিতেন, এমনও নহে, লোকে তাঁহাকে নিষ্কলঙ্ক ভাবুক, এই প্রত্যাশায় মুখের কথায় সেইরূপ ভাব প্রকাশ করিতেও তিনি ত্রুটি করিতেন না; লোক ভুলাইবার মৎলবে বাহিরের এক একটা কার্য্যে তিনি বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব জানাইবার চেষ্টা পাইতেন। ধর্ম্মসম্বন্ধে তিনি কেবল প্রতিমা-পূজা উঠাইয়া দিবার উপদেশ দিতেন, ব্রহ্ম-মন্দির স্থাপন করিয়া ব্রাহ্ম-নাম ধারণ করিবার উপদেশ তাঁহার মুখে একদিনও কেহ শ্রবণ করে নাই।

বাঙ্গালী-মণ্ডলী-সম্মুখে ব্রজবাবু অম্লান-বদনে বাঙ্গালীর ধর্ম্মনিন্দা করিতেন, ব্যবহারনিন্দা করিতেন, দেবনিন্দা করিতেন, বাঙ্গালী শ্রোতারা আহ্লাদে করতালি দিয়া তাঁহার প্রশংসা করিত। করতালির দ্বারা বাহবা দেওয়া হয়, সেটা কি ভাব, এ দেশের সকলে তাহা বুঝেন না; নিজ নিজ বুদ্ধির সুতীক্ষ্ণতায় যাঁহারা

তাহা বুঝেন, তাঁহারা ব্যাখ্যা করিয়া অপরকে বুঝাইয়া বলেন, "সম্মুখে করতালি দেওয়া প্রশংসা, পশ্চাতে করতালি দেওয়া উপহাস।" এই ব্যাখ্যা ইংরাজীমতে সুসঙ্গত, আমাদের মতে সুসঙ্গত কি না, সেটী বুঝিতে কিছু কষ্ট হয়।

ধর্ম্মভাণের আবরণে বাঙ্গালী অনেক অসৎ কার্য্য করে, এইটী ছিল ব্রজরত্ন-বাবুর প্রত্যেক বাক্যের ধুয়া; কিন্তু তিনি স্বয়ং বিনা আবরণে কোন অসৎ-কার্য্য করিতেন কি না, অপরকে তাহা জানিতে দিতেন না; না দিলেও অনেক লোকে তাহা জানিতে পারিত। বক্তৃতা শুনিবার সময় করতালি দিয়া যাহারা আনন্দ প্রকাশ করিত, তাহারা গুহ্যকথা জানিত না, ইহাই সম্ভব, কিন্তু যাহারা জানিত, তাহারা তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে যাইত না। এখনকার দিনে কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির নিদর্শন প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত মানুষেরা মানুষের গাড়ী টানে; অজ্ঞান অশ্বের পরিবর্ত্তে ভক্ত মনুষ্যেরা সজ্ঞান অশ্বের কার্য্য করে, ইহা নূতন প্রথা। বাবু ব্রজরত্নের ভাগ্যে সে সৌভাগ্য ঘটে নাই।

নিজের চরিত্র গোপন করিয়া অপরকে চরিত্রশোধনের উপদেশ দেওয়া হাস্যকর হয়, যত্ন বিফল হইয়া যায়। নিজের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অপরকে উপদেশ দিলেই গৌরবরক্ষা হইয়া থাকে। বাবু ব্রজরত্নের চরিত্র কেমন ছিল, তাহা যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা সকলেই মুখ বাঁকাইয়া হাস্য করিতেন।

বাবু ব্রজরত্ন চৌধুরী একজন জমীদার; আয়বৃদ্ধির প্রতি তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। উপায়গুলি সৎ কি অসৎ, তাহা তিনি ভাবিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ তিনি অতিশয় ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন। সৎকার্য্যে এক পয়সা ব্যয় করিতে তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইত, কিন্তু মামলা-মকদ্দমায় রাশি রাশি অর্থ অপব্যয় করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। এখনকার মামলা-মকদ্দমায় সত্যের আদর কতদূর, যাঁহারা সর্ব্বদা মামলা-মকদ্দমা করেন অথবা আইন-আদালতের খবর রাখেন, তাঁহারাই তাহা জানেন। টাকার জোরে সত্য অসত্য হয়, অসত্য সত্য হয়, প্রচণ্ড সূর্য্যকরণে প্রতিবাসীর পুকুর চুরি হয়, জবরদস্ত ধনবন্ লোকের জিদ বজায় হয়, ইহা প্রায় অনেক লোকেই অবগত আছেন, বাবু ব্রজরত্ন চৌধুরী সেইরূপ কার্য্য বিস্তর করিয়া থাকেন। কাজে আদায়ের জন্য প্রজাপীড়ন করা, প্রজাকে গুম্ করা, কোন প্রজাকে আপন ইষ্টসিদ্ধির বিঘ্নকর জানিয়া মিথ্যা মকদ্দমার দায়ে তাহাকে উদ্‌বাস্ত করা তাঁহার অনভ্যাস ছিল, এমন কথা বেহই

বলেন না। পর্ব্বতের আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া আপন অধিকারমধ্যে দাঙ্গা বাধাইয়া দেওয়া, নিরীহ লোকের ঘর জ্বালাইয়া দেওয়া, জাল দলীল প্রস্তুত করাইয়া প্রকৃত অধিকারীকে বঞ্চনা করা তাঁহার নিতান্ত অনভ্যস্ত ছিল না।

এমন যে ব্রজরত্ন চৌধুরী, তিনিই ছিলেন বাঙ্গালী হিন্দুজাতির সমাজ-সংস্কারক। সময়ের অনুগত হইয়া চলা অনেক লোকের অভ্যাস। এ দেশে সাহেব আসাতে সাহেবী চাল-চলন দেখিয়া কতকগুলি বাঙ্গালীর মন টলিয়া গিয়াছে। সাহেবেরা যে ভাবে চলে, যে সব কথা বলে, যে প্রকার কাজ করে, যে প্রকারে বিবাহ করে, যে প্রকার ভোজন করে, সেই প্রকারের অনুকরণ করিতে অনেকেই সাধ। দেশের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি সেই সকল লোকের মনের মত কথা বলেন, তাঁহার প্রতিই আন্তরিক ভক্তির উদয় হয়; ব্রজরত্নবাবু সেই শ্রেণীর লোকের সেই প্রকার ভক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

চিরদিন সমভাবে চলে না। এক সময়ে উত্থান, এক সময়ে পতন, জগতের নিয়মই এই। সূর্য্যদেব সমস্ত দিন পৃথিবী দগ্ধ করিয়া সন্ধ্যাকালে অস্তযান, কমলিনী দিবাভাগে প্রস্ফুটিত হইয়া সন্ধ্যাকালে মুদিতা হয়, ঋতুবিশেষে দিবা-যামিনীও হ্রস্ব-দীর্ঘ হইয়া থাকে। প্রকৃতির ক্রোড়গত সমস্ত পদার্থেরই এইরূপ ভাব। মানবজাতি এ নিয়মের বহির্ভূত হইতে পারে না; মহাপ্রতাপশালী মহাবীর্য্যবান্ পুরুষেরাও যথাসময়ে হীনপ্রতাপ, হীনবীর্য্য হইয়া পড়েন। এমন কি, ইন্দ্রাদি দেবতারাও এক এক সময়ে অবসন্ন ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। চিরদিন কখনই সমান যায় না; সংসারের কেহই প্রকৃতি-দেবীর এই অলঙ্ঘ্য নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারে না। বাবু ব্রজরত্নের পতনকাল উপস্থিত।

ইংরাজ-অধিকারে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক পাদরী মহাশয়েরা এবং তাঁহাদিগের অধীনস্থ অনুচরেরা এ দেশের নানা স্থানে, হাটে, মাঠে, বাজারে, মেলাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রভু যীশুখৃষ্টের মহিমা-কীর্ত্তন করেন; কীর্ত্তনের সুর তুলিয়া এতদ্দেশীয় মানবগণের আরাধ্য দেব-দেবীর অযথা নিন্দা আরম্ভ করিয়া দেন। ক্রমাগত হিন্দু-সমাজ-সংস্কারের বক্তৃতা করিয়া ব্রজরত্নবাবুর সাহস বৃদ্ধি হইল; কেহই বাধা দিল না, কেহই প্রতিবাদ করিল না, কেহই তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তর্ক করিল না। তিনি মনে করিলেন, সর্ব্বত্রই তাঁহার জয়লাভ হইল, তাঁহার যুক্তির নিকটে পরাভূত হইয়া সকলেই সুপথে আসিল, অচিরাৎ বঙ্গদেশের

প্রতিমাপূজা উঠিয়া গিয়া হিন্দু-সমাজ নির্ম্মল হইবে। মদগর্ব্বভরে এই ধারণাকে হৃদয়ে স্থান দান করিয়া পরিশেষে তিনি উল্লিখিত প্রচারকগণের ন্যায় তীক্ষ্ণ অস্ত্র ধারণ করিলেন; তাঁহার রসনায় দেবনিন্দা ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল।

একদিন বৈকালে তিনি শ্যামবাজারের খালধারে একটা প্রশস্ত ক্ষেত্রে বক্তৃতা করিতেছিলেন। সে দিনের শ্রোতা সহস্রাধিক। বক্তামহাশয় অভ্যাসানুসারে প্রথমেই আরম্ভ করিলেন জাতিভেদ; তাহার পর ধরিলেন দেবনিন্দা। শ্রোতারা সকলে তাঁহাকে চিনিত না। কলিকাতায় তাঁহার জন্ম নহে, মফস্বল হইতে উঠিয়া আসিয়া কলিকাতায় বাস করিয়াছেন, কলিকাতায় কারবার করিতেছেন, অনেকগুলি টাকা করিয়াছেন, ক্রিয়াকর্ম্ম কিছুই নাই, সুতরাং নামও চার নাই, অনেকেই চিনিত না। তিনি একজন জমীদার; কেমন জমীদার—তাঁহার অপেক্ষা বহুগুণে বড় বড় জমীদার কলিকাতায় অনেক; সাধারণ লোকে কয়জনের খবর রাখে? অনেকের নিকট তিনি অপরিচিত। বক্তৃতার ভাবভক্তি শ্রবণ করিয়া অনেকেই মনে করিল, তিনি একজন খৃষ্টান; অনেকেই অন্তরে অন্তরে তাঁহার উপর চটিল। বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে দলের মধ্য হইতে একজন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া অগ্রে সবিনয়ে কহিলেন, "মহাশয়! আপনাদের দলের অনেকের মুখেই ঐরূপ বক্তৃতা আমরা শ্রবণ করি, তাহাতে আমাদের কি উপকার হয়, তাহা ত বুঝিতে পারি না। লাভের মধ্যে এই হয় যে, অজ্ঞান লোকের, বিশেষতঃ বালকবৃন্দের মন টলিয়া যায়। আপনি বলিলেন, সকল জাতির সহিত একত্রে ভোজন না করিলে, ব্রাহ্মণে চণ্ডালে বিবাহ না চলিলে হিন্দু-সমাজের মঙ্গল হইবে না। এ সকল কথার অর্থ কি, আমরা তাহা বুঝি না। আপনার কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে হিন্দু-সমাজ রাখিয়া কাজ কি? হিন্দু-ধর্ম্মের নামটা বজায় রাখিয়াই বা ফল কি? মনে করুন, ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত সর্ব্বজাতির বিবাহপ্রথা চলিলে দেশময় বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইবে, কোন্ বংশে কাহার জন্ম, তাহার নির্ণয় থাকিবে না, আচার-ব্যবহারের বিচার থাকিবে না, স্বেচ্ছাচার প্রবল হইয়া উঠিবে, সমস্তই একাকার হইয়া যাইবে। একাকার হওয়াই যদি সমাজের মঙ্গলের নিদর্শন হয়, তাহা হইলে যাহাদের মধ্যে একাকার আছে তাহারা তবে সকলের মস্তকের উপর নৃত্য করিতে পারে না কেন?"

বক্তামহাশয় ঐ সকল কথার উত্তরে আরও কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছিলেন, বাধা দিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "আপনি এখন চুপ করুন ; আমার আরও কিছু বলিবার আছে, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করুন। আপনি বলিলেন, শিবের পরিধানবস্ত্র নাই, মাখিবার তৈল নাই, উদরে অন্ন নাই, ভিক্ষা তাঁহার জীবিকা, গাঁজা-সিদ্ধি শিবের মৌতাত, বস্ত্রের পরিবর্ত্তে পশুচর্ম্ম পরিধান করেন, তৈলের অভাবে ভস্ম মাখেন, হাড়ের মালা গলায় দেন, মাথায় সাপ রাখেন ; অথচ শিবকে সন্ন্যাসী বলা যায় না, শিব যেন সংসারীর ন্যায় পার্ব্বতীকে বিবাহ করিয়াছেন ; পার্ব্বতী অন্নদান করিলে শিবের উদর পূর্ণ হয়, নতুবা নিত্য উপবাস সার হইয়া থাকে ; এমন যে শিব, সে শিব কি কখন জীবের মোক্ষ দান করিতে পারেন ? শিবনিন্দার আড়ম্বর করিয়া আপনি এই সকল কথা বলিলেন। সমস্তই পুরাতন কথা। এ সকল উপকরণ আপনি কোথায় পাইলেন ? পুরাণাদি হিন্দুশাস্ত্রেই ঐরূপ বর্ণনা আছে। যাঁহারা পুরাণ-শাস্ত্রের প্রণয়নকর্ত্তা, তাঁহারাই শিবের উপাসক ছিলেন, উপাসক ভক্তেরা নিন্দা করিবার জন্য ঐরূপ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ইহাই কি আপনি বিশ্বাস করেন ? দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞস্থলে যেরূপে শিবনিন্দা করিয়াছিলেন, সে ভাব কি আপনি কল্পনা করিয়া আনিতে পারেন ? কখনই পারেন না। আচ্ছা, নিন্দার কথা নিন্দাতেই থাকুক, আপনাকে আমার গুটীকতক জিজ্ঞাস্য আছে ; সদাশিবকে আপনি কি দর্শন করিয়াছেন ?—শিব ভিক্ষাজীবী, শিব কি কোন দিন আপনার দ্বারে অন্ন ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন ? শিবের বস্ত্র নাই, শিব কি কখনও আপনার নিকটে বস্ত্র চাহিয়াছিলেন ? শিব গাঁজা খান, আপনি কি কোন দিন শিবের সঙ্গে একাসনে বসিয়া গঞ্জিকা-ধূম পান করিয়াছিলেন ? অনেক কথা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, কিন্তু মরুভূমে শস্যবীজ নিক্ষেপ করিলে কোন ফল হইবে না, এই কারণে নিরস্ত রহিলাম। সবিনয়ে আপনাকে নিবারণ করি, হিন্দুমণ্ডলীর সম্মুখে আপনি আর ঐ প্রকার প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিবেন না।"

বক্তা-মহাশয় মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, উগ্রস্বরে অধিকতর তেজস্বিতার সহিত দেব-দেবীর নিন্দা আরম্ভ করিলেন। যাহারা শ্রবণ করিতেছিল, ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ের কথা শুনিয়া তাহাদের অনেকেই বক্তা-মহাশয়ের প্রতি মর্ম্মান্তিক

রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর বক্তার মুখে আবার অধিকতর ধর্ম্মনিন্দা শুনিয়া তাহারা যেন ক্ষিপ্তপ্রায় হইল ; এককালে বহুলোকে সমস্বরে চীৎকার করিয়া মহা গণ্ডগোল বাধাইল, বক্তাকে সেই স্থলে প্রহার করিবে, এই প্রকার উপক্রম।

বাবু ব্রজরত্ন চৌধুরী অচতুর লোক ছিলেন না, লক্ষণ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি বুঝিলেন বেগতিক। বিপক্ষ বহুতর, তিনি একাকী। তাঁহার মতাবলম্বী অথচ প্রশংসাকারী যে কয়েকটী লোক সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প, গণ্ডগোলকারীদের ভাবগতিক দেখিয়া তাহাদেরও শঙ্কা হইয়াছিল, তাহাদের মুখ দেখিয়া ব্রজবাবু সেই ভীতিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। উপায় কি ? এরূপ ক্ষেত্রে বলপ্রকাশ করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করা নিষ্ফল ; তাহাতে বরং বিপরীত ফল ফলিবার সম্ভাবনা। বহুজনতাস্থলে একটু তফাতে তফাতে দুই চারিজন পুলিস-প্রহরী বেড়ায় ; সহস্রাধিক লোকের উগ্রমূর্ত্তির সম্মুখে তাহারাই বা কি করিতে পারিবে ? এই সকল চিন্তা করিয়া ব্রজরত্নবাবু স্থির করিলেন পলায়ন।

কলিকাতার প্রান্তভাগে ঐরূপ সঙ্ঘটন ; কলিকাতার দিকেই অধিক লোক ; অতএব দক্ষিণদিকে না আসিয়া নিরাপদের আশায় তিনি তখন উত্তরদিকে ধাবিত হইলেন। তাঁহার অনুগত লোকেরা গণনায় অল্প ছিল, তাঁহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন প্রাণ লইয়া যে যে দিকে পাইল, ছত্রভঙ্গ হইয়া সে সেই দিকেই ছুটিয়া পলাইল। মোরিয়া লোকেরা তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন না করিয়া, মার্ মার্ শব্দে হো হো করিয়া কর্ত্তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল। কর্ত্তা তখন কি করেন, প্রাণপণে ছুটিয়া টালার সেতু পার হইলেন ; সঙ্গে সঙ্গে হাজার লোক।

কর্ত্তা ছুটিতেছেন,—প্রাণভয়ে ছুটিতেছেন,—টালা পার হইয়া বীরপাড়া ও পাইকপাড়ার সোজা রাস্তা ধরিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছেন ; পশ্চাদ্গামী লোকেরা কিঞ্চিৎ পশ্চাতে পড়িয়াছে, এমন সময় এক অভাবনীয় মহাবিপদ।

পৌষমাসের শেষ, বাবুর গায়ে একযোড়া রক্তবর্ণ শাল ছিল, দ্রুতবেগে ধাবিত হইবার সময় সেই শাল-যোড়াটা আলুথালু হইয়া বাবুর বুকের দিকে, পশ্চাদ্দিকে শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, দুই দিকের শেষভাগ ভূতলে লুটাইতেছিল, দূর হইতে দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর ; বোধ হইতেছিল যেন, কি একটা বৃহৎ

বক্তামহাশয় ঐ সকল কথার উত্তরে আরও কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছিলেন, বাধা দিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "আপনি এখন চুপ করুন; আমার আরও কিছু বলিবার আছে, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করুন। আপনি বলিলেন, শিবের পরিধানবস্ত্র নাই, মাখিবার তৈল নাই, উদরে অন্ন নাই, ভিক্ষা তাঁহার জীবিকা, গাঁজা-সিদ্ধি শিবের মৌতাত, বস্ত্রের পরিবর্ত্তে পশুচর্ম্ম পরিধান করেন, তৈলের অভাবে ভস্ম মাখেন, হাড়ের মালা গলায় দেন, মাথায় সাপ রাখেন; অথচ শিবকে সন্ন্যাসী বলা যায় না, শিব যেন সংসারীর ন্যায় পার্ব্বতীকে বিবাহ করিয়াছেন; পার্ব্বতী অন্নদান করিলে শিবের উদর পূর্ণ হয়, নতুবা নিত্য উপবাস সার হইয়া থাকে; এমন যে শিব, সে শিব কি কখন জীবের মোক্ষ দান করিতে পারেন? শিবনিন্দার আড়ম্বর করিয়া আপনি এই সকল কথা বলিলেন। সমস্তই পুরাতন কথা। এ সকল উপকরণ আপনি কোথায় পাইলেন? পুরাণাদি হিন্দুশাস্ত্রেই ঐরূপ বর্ণনা আছে। যাঁহারা পুরাণ-শাস্ত্রের প্রণয়নকর্ত্তা, তাঁহারাই শিবের উপাসক ছিলেন, উপাসক ভক্তেরা নিন্দা করিবার জন্য ঐরূপ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ইহাই কি আপনি বিশ্বাস করেন? দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞস্থলে যেরূপে শিবনিন্দা করিয়াছিলেন, সে ভাব কি আপনি কল্পনা করিয়া আনিতে পারেন? কখনই পারেন না। আচ্ছা, নিন্দার কথা নিন্দাতেই থাকুক, আপনাকে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসা আছে; মহাশিবকে আপনি কি দর্শন করিয়াছেন [illegible] ভিক্ষাজীবী, [illegible] কোন দিন আপনার দ্বারে অন্ন ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন? শিবের বস্ত্র নাই, শিব কি কখন আপনার নিকটে বস্ত্র চাহিয়াছিলেন? শিব গাঁজা খান, আপনি কি কোন দিন শিবের সঙ্গে একাসনে বসিয়া গাঁজা-সিদ্ধি পান করিয়াছিলেন? অনেক কথা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, কিন্তু মস্তকে শাস্ত্রীয় নিক্ষেপ করিলে কোন ফল হইবে না, এই কারণ [illegible]। [illegible] আপনাকে নিবারণ করি, হিন্দুজাতীর সমক্ষে আপনি [illegible] প্রাণান্তেও উচ্চারণ করিবেন না।"

বক্তা-মহাশয় মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, উত্তরের অপেক্ষায় [illegible] পুরুষ-দেবীর নিন্দা আরম্ভ করিলেন। [illegible] [illegible] [illegible]

রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর বক্তার মুখে আবার অধিকতর ধর্ম্মনিন্দা শুনিয়া তাহারা যেন ক্ষিপ্তপ্রায় হইল; এককালে বহুলোকে সমস্বরে চীৎকার করিয়া মহা গণ্ডগোল বাধাইল, বক্তাকে সেই স্থলে প্রহার করিবে, এই প্রকার উপক্রম।

বাবু ব্রজরত্ন চৌধুরী অচতুর লোক ছিলেন না, লক্ষণ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি বুঝিলেন বেগতিক। বিপক্ষ বহুতর, তিনি একাকী। তাঁহার মতাবলম্বী [illegible] যে কয়েকটী লোক সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প, [illegible] অবগতিক দেখিয়া তাহাদেরও শঙ্কা হইয়াছিল, [illegible] দেখিয়া ব্রজবাবু সেই ভীতিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। উপায় কি? [illegible] ক্ষেত্রে বলপ্রকাশ করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করা নিষ্ফল; তাহাতে বরং বিপরীত ফল ফলিবার [illegible]। বহুজনতাস্থলে একটু তফাতে তফাতে দুই চারিজন পুলিস-প্রহরী বেড়ায়; সহস্রাধিক লোকের উগ্রমূর্ত্তির সম্মুখে তাহারাই বা কি করিতে পারিবে? এই সকল চিন্তা করিয়া ব্রজরত্নবাবু স্থির করিলেন পলায়ন।

কলিকাতার [illegible] ঐরূপ সঙ্ঘটন; কলিকাতার দিকেই অধিক লোক; অতএব দক্ষিণদিকে না আসিয়া নিরাপদের আশায় তিনি তখন উত্তরদিকে [illegible] ছুটিলেন। তাঁহার অনুগত লোকেরা গণনায় অল্প ছিল, তাঁহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন [illegible] হইয়া যে যে দিকে পাইল, [illegible] সে সেই দিকেই ছুটিয়া পলাইল। মারিয়া লোকেরা তাহাদিগের [illegible] না করিয়া, মার্ মার্ শব্দে হো হো করিয়া কর্ত্তার পশ্চাৎ [illegible] দৌড়িল। কর্ত্তা তখন কি করেন, প্রাণপণে ছুটিয়া [illegible] সেতু পার হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে হাজার লোক।

কর্ত্তা ছুটিতেছেন,—প্রাণভয়ে ছুটিতেছেন,—টালা পার হইয়া বীরপাড়া ও পাইকপাড়ার সোজা রাস্তা ধরিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছেন; পশ্চাদ্‌গামী লোকেরা [illegible] পড়িল যে, এমন সময় এক অভাবনীয় মহাবিপদ।

পৌষমাসের শেষ, বাবুর গায়ে একযোড়া রক্তবর্ণ শাল ছিল, দ্রুতবেগে ধাবিত হইবার সময় সেই শাল যোড়াটা আলুথালু হইয়া বাবুর বুকের দিকে, পশ্চাদিকে [illegible] পড়িয়াছিল, দুই দিকের শেষভাগ ভূতলে লুটাইতেছিল [illegible] ভয়ঙ্কর; বোধ হইতেছিল যেন, কি একটা বৃহৎ

রক্তবর্ণ পদার্থ সরসর শব্দ দিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। ঠিক সেই সময় উত্তরদিক্ হইতে এক পাল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহিষ মন্থরগতিতে দক্ষিণদিকে আসিতেছিল, একজন বালক সেই সকল মহিষের রাখাল; সেই বালকও তখন মহিষগালের অনেক পশ্চাতে। মহিষেরা লাল রং দেখিলে ক্ষেপিয়া উঠে, ইহা সকলেই জানেন, রক্তবস্ত্রাবৃত বাবুকে দেখিয়া ভয় পাইয়াই হউক অথবা রাগভরেই হউক, সেই সকল মহিষ ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে শৃঙ্গ বক্র করিয়া, গ্রীবাভঙ্গী করিয়া, বাবুর দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল। বাবু তখন প্রাণভয়ে ব্যাকুল, তিনি তখন সে দিকে লক্ষ্য রাখেন নাই, আশে পাশে, একটু দূরে দূরে যে দুই পাঁচ জন লোক ছিল, রাস্তার ধারে দোকানে দোকানে যে সকল দোকানী ছিল, "শাল ফেলে দাও, শাল ফেলে দাও" বলিয়া তাহারা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। বাবু তখন সম্মুখদিকে চাহিয়া দেখিলেন; তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি শাল-যোড়াটা রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া বক্রপথে তিন একখানা দোকানের দিকে ছুটিলেন। শাল গায়ে দিয়া আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অঙ্গে জামা-জোড়া ছিল না; ধার্ম্মিক সাজিয়া বক্তৃতা করিতে আসিয়াছিলেন, পায়ে একজোড়া চটিজুতা ছিল; যে দোকানের দিকে তাঁহার লক্ষ্য, সেখানা একজন মুচির দোকান; দোকানের সম্মুখে বড় একটা নর্দ্দমা, সে নর্দ্দমায় তখন অল্প অল্প জল ছিল, এক হাঁটু কাদা; সেই নর্দ্দমা পার হইবার সময় পায়ের চটিজুতা কোথায় উড়িয়া গেল, হুঁস ছিল না। বেলাও তখন শেষ হইয়া আসিয়াছিল, সূর্য্যদেব অস্ত গিয়াছিলেন, পৌষমাসের শেষ, বিলক্ষণ শীত, গা আড়ষ্ট, অনেক দূর দৌড়িয়া আসিয়াছেন, ভয়ে হৃৎকম্প, তাহার উপর শীতে কম্প, নর্দ্দমা পার হইবার সময় বাবু কাঁপিতে কাঁপিতে চিৎপাৎ হইয়া সেই কাদার উপর পড়িয়া গেলেন; প্রায় উলঙ্গ। মুচির ছেলেরা খেলা করিবার ছলে সেই নর্দ্দমার জলে বড় বড় খেজুর-বেগুলো ফেলিয়া রাখিয়াছিল, বড় বড় কাঁটা; সচরাচর খেজুরকাঁটাকে শালকাঁটা বলে, অনাবৃত অঙ্গে ব্রজবাবু সেই কর্দ্দমপূর্ণ জলে সেই সকল শালকাঁটার উপর পড়িলেন; পদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গে সেই সুতীক্ষ্ণ শালকাঁটা বিদ্ধ হইল, কর্দ্দমে সর্ব্বশরীর ডুবিয়া গেল।

"হাঁ হাঁ" করিতে করিতে জনকতক লোক সেই স্থলে উপস্থিত হইল। মহিষগুলা তখনও সেই নর্দ্দমার ধারে দাঁড়াইয়া গর্জ্জন করিতেছিল, রাখাল আসিয়া

তাহাদিগকে ছড়ি মারিয়া ফিরাইয়া লইল। লোকেরা অতি সাবধানে নর্দ্দমায় নামিয়া, ধরাধরি করিয়া বাবুকে ডাঙ্গায় তুলিল। বাবু অচেতন। দুঃখের কথা না হইলে বলা যাইতে পারিত, যেন শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেব!

সেই শীতে বাবুর সর্ব্বাঙ্গে জল ঢালিয়া উদ্ধারকর্ত্তা লোকেরা তাঁহার অঙ্গের সমস্ত কর্দ্দম ধৌত করিয়া দিল। সর্ব্বাঙ্গে শালকাঁটা, অঙ্গের অনেকদূর পর্য্যন্ত বসিয়া গিয়াছিল, টানিয়া বাহির করিবার উপায় ছিল না। দুই একজন লোক দুই একটা কাঁটা ধরিয়া টান দিয়াছিল, অজ্ঞান থাকিলেও বাবু সেই যাতনায় অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন। শ্যামবাজারের যে সকল লোক তাঁহাকে তাড়া করিয়াছিল, তাহারা পাইকপাড়া পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে যায় নাই, এখন যেখানে চিৎপুর রেলওয়ের উচ্চসেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, টালার ব্রাহ্মণপাড়ার মোড়ে সেই স্থান পর্য্যন্ত গিয়াই তাহারা ফিরিয়াছিল। তাহাদিগকে আর বৈরনির্য্যাতন করিতে হইল না, বৈর হইতেই প্রতিফল ফলিল।

শ্যামবাজারে বাবুর গাড়ী ছিল, বাবু যখন পলাইলেন, তখন সে গাড়ী সঙ্গে আইসে নাই, জনতার লোকেরা সেখানা রাখিয়াছিল কি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, তখন তাহা জানা গেল না। চিৎপুরের থানায় খবর হইল, থানার লোকেরা আসিয়া, খাটিয়ায় তুলিয়া, ব্রজবাবুর অচেতন দেহ থানায় লইয়া গেল। ডাক্তার আসিয়া গায়ের কাঁটা বাহির করিবার চেষ্টা পাইলেন, কতক উঠিল, কতক উঠিল না। অঙ্গে প্রবেশ করিয়া যে সকল কাঁটার মুখ আধা-আধি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহা বাহির করা দুঃসাধ্য হইল। অনেক সেবা-শুশ্রূষার পর বাবুর অল্প অল্প জ্ঞান হইল, নিদারুণ বেদনায় তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শাল-যোড়াটা ধূলায় ধূসর হইয়া রাস্তায় পড়িয়া ছিল, পুলিসের জিম্মায় তাহা রহিল, পরিহিত বস্ত্রখানি নর্দ্দমার কাদায় সমাধিপ্রাপ্ত হইল। পুলিস একখানি নূতন বস্ত্র দিয়া বাবুর সেই ক্ষতবিক্ষত দেহ ঢাকিয়া রাখিল। ডাক্তারের পরামর্শে সেই রাত্রেই বাবুকে কলিকাতার হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়; সেখানে যথা-সম্ভব চিকিৎসা হইলে বাবু চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া হাসপাতালে থাকিতে নারাজ হইলেন, নিজ বাটীর ঠিকানা বলিয়া দিলেন, বাড়ীতেই চিকিৎসা হইবে। হাস-পাতালের ডাক্তারেরা তাহাতেই সম্মত হইলেন, বাবুকে বাড়ীতে প্রেরণ করা হইল; ভাল ভাল ডাক্তারেরা চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বশরীরে শেল বিদ্ধ হইলে যেরূপ নিদারুণ যন্ত্রণা হয়, কল্পনা করিয়া তাহা বলা যাইতে পারে না। বাবু ব্রজরত্ন ক্রমাগত তিন দিন তিন রাত্রি সেই যন্ত্রণা-ভোগ করিতেছেন, সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া উঠিয়াছে। জ্ঞানোদয় হইয়াছে বটে, কিন্তু কাঁটা বাহির করিবার সময় ডাক্তারেরা সে জ্ঞানটুকু থাকিতে দেন না, তীব্র ঔষধ-প্রয়োগে খানিকক্ষণ অজ্ঞান করিয়া রাখেন। পাঁচদিন চিকিৎসা হইল, অনেক কাঁটা বাহির হইল, কিন্তু যে সকল কাঁটা বদ্ধমূল হইয়া বাহিরে অদৃশ্য হইয়াছিল, অস্ত্র না করিলে তাহা বাহির হইবে না, সুতরাং অস্ত্রচিকিৎসকের উপযুক্ত সময় প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় শীতল জল দিয়া দেহ ধৌত করা হয়, সিক্ত বস্ত্র অঙ্গে ঢাকা দিয়া রাখা হয়, যে সময়ের যেমন অবস্থা, তাহা বুঝিয়া উপযুক্ত ঔষধ সেবন করান হয়। জ্বর আইসে নাই। জ্বর আসিলে জীবন সঙ্কটাপন্ন হইবে, ডাক্তারেরা এই কথা বলিলেন, যাহাতে জ্বর না আইসে, তাহার উপায় করিতে লাগিলেন।

দুই দিন পূর্ব্ব মুখ-চোক এত ফুলিয়াছিল যে, কথা কহিবার শক্তি ছিল না, কোন বস্তু ভক্ষণ করিবার সামর্থ্য ছিল না, নলের দ্বারা অল্প অল্প দুগ্ধপান করাইয়া জীবনরক্ষা করা হইতেছিল; সে ভাবটা কিছু কমিয়া আসিল, মুখের স্ফীত অংশ কিছু কমিল, দুগ্ধ এবং মাংসের ঝুরুয়া পান করাইবার ব্যবস্থা হইল, অল্প অল্প কথা ফুটিল। সপ্তাহ পরে একজন ডাক্তারের সাক্ষাতে মৃদুস্বরে ব্রজরত্ন বলিলেন, "আমি বুঝিতেছি, আমি বাঁচিব না; আমার একজন মুহুরীকে আমার কাছে রাখিয়া আপনারা ক্ষণকালের জন্য অন্য গৃহে গিয়া বিশ্রাম করুন, আমার কতক-গুলি কথা আছে, সেইগুলি লিখাইয়া দিব।"

কথাগুলি বলিবার সময় বাবুর দুটী চক্ষু দিয়া দরদর ধারে জল পড়িল। রোদন করিতে নিষেধ করিয়া ডাক্তারেরা সে গৃহ হইতে অন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন, একজন মুহুরীকে বাবুর কাছে আসিবার জন্য সংবাদ দেওয়া হইল।

বাবুর পরিবার, দুইজন দাসী, একজন চাকর আর পণ্ডিত শিবপ্রসাদ প্রায় সর্ব্বক্ষণ বাবুর নিকটে থাকেন, ডাক্তারেরা যখন আসেন, গৃহিণী তখন একটু সরিয়া যান।

রাত্রি প্রায় এক প্রহর। সেরেস্তার একজন মুহুরী বাবুর গৃহে প্রবেশ করিল। বাবু তাহাকে কি এক প্রকার ইঙ্গিত করিলেন, সে তৎক্ষণাৎ

গৃহের জানালা-দরজা বন্ধ করিয়া দিল। গৃহের এক পার্শ্বে ক্ষুদ্র একটী টেবিলের উপর দুইখানি কেতাব আর দোয়াত, কলম, কাগজ রক্ষিত ছিল, বাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, "লিখিবার সরঞ্জামগুলি এইখানে লইয়া আইস, উপরের কেতাবখানি আমার হাতে দাও।"

মুহুরী তাহাই করিল। পার্শ্বে একটী রূপার গেলাসে সুশীতল জল ছিল, এক চুমুক পান করিয়া বাবু পুনরায় ধীরে ধীরে মুহুরীকে বলিলেন, "একখানা কাগজ ধর, যাহা আমি বলি, সাবধান হইয়া লিখিয়া লও।" মুহুরী কাগজ-কলম লইল, বাবু একে একে থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিলেন, মুহুরী লিখিতে লাগিল।

"আত্মীয়বর শ্রীযুক্ত নরসিংহচন্দ্র মজুমদার মহাশয় মহাশয়েষু।

সবিনয়-নমস্কারপূর্ব্বক-নিবেদনমিদম্। আপনি জানেন, সংসারে আমার কেহ নাই। আমার প্রাণ যায়, এত দিন যাহা আমি করিয়াছি, সমস্ত কথা আমার মনে পড়িতেছে। এই আসন্নকালে আপনার প্রতি আমার এই অনুরোধ যে, সেই বালকটীকে আপনি যে দেশে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তারযোগে শীঘ্র সেই দেশে সংবাদ পাঠাইয়া তাহাকে আমার নিকটে এই ঠিকানায় অবিলম্বে—"

বলিতে বলিতে বাবু হঠাৎ থামিয়া গেলেন; মুহুরীও হাত গুটাইল। মুহুরীর মুখপানে অল্পক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া প্রায় অবরুদ্ধস্বরে বাবু বলিলেন, "রও, আর লিখিও না;—না,—তুমি পারিবে না;—শি—"

আবার হঠাৎ থামিয়া গিয়া, আবার এক চুমুক জল খাইয়া, অতি কষ্টে এক হস্ত দ্বারা নেত্রমার্জ্জন পূর্ব্বক স্তম্ভিতকণ্ঠে বাবু বলিলেন, "তুমি যাও, তুমি পারিবে না; শিবপ্রসাদকে আমার কাছে পাঠাইয়া দাও।"

কাগজ-কলম রাখিয়া, একটী দরজা খুলিয়া, মুহুরী চলিয়া গেল, একটু পরে পণ্ডিত শিবপ্রসাদ সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। বাবুর আদেশে শিবপ্রসাদ সেই মুক্তদ্বার পুনরায় বন্ধ করিয়া দিয়া শয্যার এক পার্শ্বে বসিলেন। মনে মনে কি চিন্তা করিয়া বিষণ্ণ-নয়নে শিবপ্রসাদের বিষণ্ণ বদন নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণনেত্রে গদগদস্বরে বাবু বলিতে লাগিলেন, "শিব! তুমি অনেক শাস্ত্র পাঠ করিয়াছ, তুমি আমার অনেক উপকার করিয়াছ, তুমি আমার সমস্ত বিষয়-কার্য্য বুঝিয়াছ, তোমার প্রতি আমার পূর্ণ-বিশ্বাস। আমি পৃথিবী হইতে বিদায় হইতেছি, আমার

সমস্ত সম্পদ্ পড়িয়া রহিল, আমার উত্তরাধিকারী নাই, আমার পত্নী রহিলেন, তাঁহাকে তুমি মাতৃবৎ ভক্তি কর, তাহা আমি জানি, আমি চলিলাম, তাঁহাকে তুমি সান্ত্বনা করিও; যত্নে প্রতিপালন করিও, বিষয়গুলি রক্ষা করিও।”

এই পর্য্যন্ত বলিয়া, চক্ষের জল ফেলিয়া বাবু একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন; অন্তদিকে মুখ ফিরাইয়া শিবপ্রসাদও উভয় হস্তে আপন উভয় নেত্র-মার্জ্জন করিলেন। সে দিকে না চাহিয়াই নেত্র-নিমীলন পূর্ব্বক বাবু আবার বলিতে লাগিলেন, “শিব! তুমি একটী কার্য্য কর। একখানি কাগজে আমার গুটীকতক মনের কথা লিখিয়া লও। অনেক দিন অবধি সেই সকল কথা আমি মনে করিয়া রাখিয়াছিলাম, আমার মন-প্রাণ এখন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিল, সে সকল গুহ্যকথা আর এখন কাহার কাছে রাখিয়া যাইব, কাগজেই লেখা থাকুক; কাগজখানি তোমার কাছেই থাকিবে। যদি কেহ কখন এখানে আসিয়া আমার কথা জিজ্ঞাসা করে, অকপটে নিজের পরিচয় দেয়, যাইবার সময় কি কথা আমি বলিয়া গিয়াছি, তাহা যদি জানিতে চায়, তাহাকে বলিও, আমি অতি হতভাগ্য, আমি মহাপাতকী, বিষয়লোভে ধর্ম্মপথ ভুলিয়া চিরজীবন অধর্ম্মপথে পরিভ্রমণ করিয়াছি, সে যেন আমাকে ক্ষমা করে।”

এইখানে পুনরায় নেত্রজল ফেলিয়া, অবশ-হস্তে পুনরায় অশ্রুমার্জ্জন পূর্ব্বক পুনরায় বাবু বলিতে লাগিলেন, “শিব! বুঝিয়াছ আমার কথা? যদি কেহ আসিয়া আত্মপরিচয় দিতে পারে, ঐ সকল কথা তাহাকে বলিও, যে কাগজখানি এখন তুমি লিখিবে, সেখানিও তাহাকে দেখাইও। [illegible] বাবুর মুখের কথা শুনিয়া শুনিয়া শিবপ্রসাদ লিখিতে লাগিলেন;—

“প্রাণাধিকেষু—

তুমি আমাকে চিনিতে পারিবে না। আমার দেহ থাকিলেও তাহা দেখিয়া, আমার মুখে কোন কথা শুনিয়া, কোন প্রকারে তুমি আমাকে জানিতে পারিতে, কিন্তু আমার দেহ থাকিবে না; অচিরেই এই দেহ অন্তিম-শ্মশানে ভস্ম হইয়া যাইবে।

প্রাণাধিক! আমি অতি অধম, আমাকে ঘৃণা করিয়া পরমেশ্বর আমাকে পুত্র-কন্যা প্রদান করেন নাই। বৎস! তুমি আমার একমাত্র বংশধর; বিষয়-

লোভে মত্ত হইয়া আমি তোমার জন্মদাতা পিতাকে গোপনে সংহার করিয়া সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হইয়াছিলাম। তুমি তখন অতি শিশু, আমি তোমাকে সূতিকাগারে একবারমাত্র দেখিয়াছিলাম, তাহার পর আর দেখি নাই। তোমাকে প্রাণে মারিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, ভগবান্ বাধা দিয়াছিলেন; তথাপি তোমাকে চিরবঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে তোমাকে আমি নির্ব্বাসিত করিয়াছিলাম। তুমি তোমার গর্ভধারিণীর সহিত শিশুকালে মাতামহাশ্রমে কিছুদিন বাস করিয়াছিলে, তাহাতেও আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি নাই, অন্য লোককে মন্ত্রণা দিয়া, পাঠশালা হইতে তোমাকে চুরি করিয়া বিদেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। সে কথা হয় ত তুমি স্মরণ করিতে পারিবে। মনে করিও, আমিই সেই পাপকার্য্যের মূলাধার। আমার পাপকে ক্ষমা করিবার কর্ত্তা একজন আছেন, তিনি ক্ষমা করিবেন কি না, তাহা আমি জানি না, কিন্তু প্রাণাধিক! তুমি আমাকে ক্ষমা করিও।

বৎস! তোমার গর্ভধারিণী জননী জীবিতা আছেন। গঙ্গাস্নানে গিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন, লোকে বলিয়াছিল, জলে ডুবিয়া গিয়াছেন, সে কথা মিথ্যা। আমি তোমার জননীকে অন্য লোকের দ্বারা স্থানান্তরিত করিয়া দামোদর-নদীর তীরে মহেশ্বরপুরের কৃপানন্দ ভট্টাচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছিলাম; মধ্যে মধ্যে সংবাদ লইয়াছি, তিনি বাঁচিয়া আছেন।

বৎস! পূর্ব্ব-পরিচয় এই পর্য্যন্ত এখন আমি বলিলাম, পাপ আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল; প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার অতি অল্পমাত্র বাকী, পাপের অনলে এখনও আমার সর্ব্বশরীর দগ্ধ হইতেছে, সহস্র সহস্র কালসর্প যেন আমাকে মুহুর্মুহু দংশন করিতেছে! হায় হায়! দেহে জীবন থাকিতে থাকিতে আমি ভীষণ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি!

মৃত্যুকালে আর একটী আমার মহা চিন্তা। বৎস! ইহ-সংসারে তুমি বাঁচিয়া আছ কি না, সে সমাচার কিছুই আমি জানিতে পারি নাই। সর্ব্বজীবের জীবনদাতা জগদীশ যদি তোমাকে নিরাপদে বাঁচাইয়া রাখিয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্যই একদিন না একদিন স্বদেশ-দর্শনে তুমি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিবে; আমার একজন বিশ্বস্ত প্রতিনিধির নিকটে এই পত্রখানি রহিল, ইহাও তুমি দেখিতে পাইবে। তোমার মাতা যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন

তাহাও এই পত্রে লিখিয়া দিলাম, তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া পরমসুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিও।

বৎস! আমি চলিলাম। সংসারের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ রহিল না; আর কাহারও সহিত সম্বন্ধ রহিল না বটে, কিন্তু তোমার সহিত সম্বন্ধ রহিল। তুমি আমার কনিষ্ঠ সহোদরের একমাত্র পুত্র। আমি তোমার পিতৃব্য, আমি তোমার পিতৃহন্তা! আমি নরাধম, তুমি আমাকে ভুলিয়া যাইও।

শাস্ত্রকারেরা ভ্রাতৃপুত্রকে আপন পুত্রতুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তুমি আমার ভ্রাতৃপুত্র, অতএব আমার পুত্রতুল্য স্নেহাস্পদ। সংসারে আমি বহুধনের অধিকারী হইয়াছিলাম, দেবকার্য্যে, পিতৃকার্য্যে অথবা শাস্ত্রসম্মত ধর্ম্মকার্য্যে একটী কপর্দ্দকও আমি ব্যয় করি নাই; তাহাতেই আমার এই দুর্গতি হইল। বুদ্ধির দোষে অনর্থক অপব্যয়ে যাহা নষ্ট করিয়াছি, তদ্ব্যতীত সমস্তই সঞ্চিত আছে, আমার সেরেস্তার কাগজপত্রে এবং গৃহের মুদ্রাধারে তাহা তুমি দেখিতে পাইবে, তুমিই একাকী নির্ব্বিরোধে আমার সমস্ত ধনের অধিকারী হইবে। আমার বনিতা তোমার জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী, তিনি তোমার মাতৃতুল্যা, মাতৃতুল্য ভক্তি-যত্নে তাঁহাকে তুমি সৎপথে রক্ষা করিবে, এই আমার আশা।

বৎস! এইবার আমার শেষকথা। যত কথা আমি বলিলাম, এতৎসমস্ত যথার্থ কি না, তাহা বুঝিতে তোমার মনে সন্দেহ জন্মিতে পারিবে। সেই সন্দেহ যাহাতে বিভঞ্জন হয়, এই স্থলে আমি সেই কথা বলিব। আমি তোমার নাম জানি; তোমার নাম শ্রী-ভ-ব-র-ত্ন।"

চক্ষের জলে ভাসিয়া, কাগজ-কলম দূরে নিক্ষেপ করিয়া পণ্ডিত শিবপ্রসাদ মুমূর্ষু জ্যেষ্ঠতাতের চরণতলে নিপতিত হইলেন, শোকে অধীর হইয়া বাষ্পনিরুদ্ধ কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "তাত! তাত! আর লিখিতে হইবে না, আর বলিতে হইবে না, আর আমি লিখিতে পারিব না;—আমি সেই অজ্ঞাত অপরিচিত বিদেশী শিবপ্রসাদ নহি, আমিই সেই শৈশব-নির্ব্বাসিত পরিজনবঞ্চিত হতভাগ্য ভবরত্ন।"

রোগীর উত্থানশক্তি ছিল না; ভ্রাতৃপুত্রকে আলিঙ্গন করিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু মনে মনেই সে ইচ্ছা বিলীন হইয়া গেল; কেবল নেত্রনীরে গণ্ড-

দেশ প্লাবিত করিয়া তিনি পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। একটু পূর্ব্বে শিবপ্রসাদের,—না,—এখন আর তাঁহাকে শিবপ্রসাদ বলিবার প্রয়োজন নাই,—একটু পূর্ব্বে ভবরত্নের চক্ষেও জল আসিয়াছিল, অকস্মাৎ সেই জল বিশুষ্ক হইয়া তাঁহার মুখখানিকে কেমন এক প্রকার বিবর্ণ করিয়া দিল; ভবরত্ন কাঁপিতে লাগিলেন।

বাবু ব্রজরত্ন তত যন্ত্রণার উপরেও কম্পিত-কলেবরে ভবরত্নের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। ভয়ে কি বিস্ময়ে কিম্বা জীবনের পূর্ব্বকথা স্মরণে হঠাৎ তাঁহার কম্প উপস্থিত হইল, তাহা কেবল তিনিই জানিতে পারিলেন। ইত্যগ্রে যতগুলি কথা তিনি বলিয়াছিলেন, সেই সকল কথার সঙ্গে সঙ্গেও রসনার কম্পন ছিল; পাঠ করিবার সুবিধার নিমিত্ত তাঁহার সেইরূপ কম্পিত বাক্যগুলি আমরা একসঙ্গে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছি; বস্তুতঃ পত্রের বয়ানগুলি বলিয়া দিবার সময় তিনি বার বার থামিয়াছিলেন, বার বার কাঁপিয়াছিলেন, বার বার নিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন, বার বার অশ্রুবর্ষণ করিয়া কম্পিত-হস্তে নেত্রমার্জ্জন করিয়াছিলেন, বার বার পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া একটু একটু জল পান করিয়াছিলেন, একটানে সকল কথা বলিতে পারেন নাই। ভবরত্নের পরিচয় না জানিয়াও ভবরত্নের উদ্দেশে যতক্ষণ তিনি ভবরত্নের পরিচয় দিতেছিলেন, ততক্ষণ তাঁহার তপ্তহৃদয়ে বিন্দুমাত্রও শান্তি ছিল না; ভবরত্নের নিজমুখে সত্যপরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, কিঞ্চিৎ শান্তির উদ্রেক হইলেও এককালে তাঁহার বাক্‌রোধ হইল, নয়ন মুদিত করিয়া নিস্পন্দ গাত্রে তিনি নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। অবস্থা দর্শন করিয়া ভবরত্নের ভয় হইল। খানিকক্ষণ সামলাইয়া অল্পে অল্পে নয়ন উন্মীলন পূর্ব্বক রোগী পুনরায় অল্পে অল্পে স্তম্ভিতস্বরে বলিতে লাগিলেন, "হাঁ,—সত্য কি তুমি আমার কাছে বসিয়া রহিয়াছ? হাঁ,—সত্যই কি তুমি ভবরত্ন? সত্যই কি তুমি বাঁচিয়া আছ? সত্যই কি তুমি শিবপ্রসাদ নাম লইয়া আমার কাছে আশ্রয় লইয়াছিলে? হাঁ,—সত্যই তুমি ভবরত্ন। তোমার মুখের আকৃতিতে এখন আমি তোমার পিতৃমুখের প্রতিবিম্ব দর্শন করিতেছি। হায় হায়! আমি তোমার ধর্ম্মশীল পিতাকে বিনা দোষে বিনাশ করিয়াছি! আমার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। কিছুতেই আমার পরিত্রাণ নাই! সত্যই কি তুমি সেই ভবরত্ন?—হাঁ, সত্যই তুমি ভবরত্ন। ভবরত্ন! তুমি কি আমাকে ক্ষমা করিতে পারিবে? আমার পাপ-

জীবনের লীলা-খেলা ফুরাইল। ভাগ্যে ছিল, মৃত্যুকালে আমি তোমার নিকট বিদায় লইতে পারিলাম। বৎস! তুমি আমাকে বিদায় দাও! সংসারের নিকট বিদায় হইয়া আমি—”

কথা সমাপ্ত হইল না। বাহির হইতে গৃহের দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত। কাহারা জোরে জোরে ডাকিয়া বলিতেছেন, “দ্বার খুলিয়া দাও, দ্বার খুলিয়া দাও! এত বিলম্ব কিসের জন্য? শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দাও!”

শীঘ্র শীঘ্র উঠিয়া ভবরত্ন দ্বার খুলিয়া দিলেন, প্রবেশ করিলেন দুই জন ডাক্তার। দ্বার উন্মুক্ত রহিল। রোগী পুনরায় নির্ব্বাক্,—নিমীলিত-নেত্র। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, চৈতন্য নাই। ভবরত্নকে সম্বোধন করিয়া একজন ডাক্তার বলিলেন, “নায়েব মহাশয়! আপনি এ কি করিয়াছেন? প্রাণ থাকিতে মারিয়া ফেলিবেন কি? আপনি বিজ্ঞ, এমন সঙ্কটাপন্ন রোগীকে এতক্ষণ বকাইয়া আপনি ভাল কর্ম্ম করেন নাই। এখনও যদি—”

কথা কহিতে কহিতে সম্মুখের নূতন লেখা কাগজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ডাক্তার-মহাশয় চমকিতস্বরে কহিলেন, “এ কি? এ সকল লেখা কাগজ কিসের? এতক্ষণ কি আপনি এই কাজ করিতেছিলেন? আপনি নিজে উহা লিখিয়াছেন কিম্বা রোগীকে বকাইয়া বকাইয়া লিখিয়া লইয়াছেন, শীঘ্র বলুন, শীঘ্র প্রতীকার না করিলে আমরা আর চিকিৎসার অবসর পাইব না। কেন আপনি এ সকল কাগজ লিখিয়াছেন, এখনি আমরা তাহা জানিতে চাই।”

মুহূর্ত্তকাল ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ভবরত্ন কহিলেন, “বাধ্য হইয়াছিলাম। কর্ত্তা ঐ সকল কথা লিখিতে বলিলেন, অবাধ্য হওয়া উচিত হয় না, সেই জন্যই লিখিতেছিলাম।”

“ভাল কর্ম্ম হয় নাই” বলিয়া ডাক্তার-মহাশয় পুনর্ব্বার রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া একমাত্রা তরল ঔষধ তাঁহার মুখে ঢালিয়া দিলেন, কতকাংশ কণ্ঠস্থ হইল, কতকাংশ কস্ বাহিয়া পড়িয়া গেল। দ্বিতীয়বার আর এক মাত্রা; দশ মিনিট পরে আর এক মাত্রা। এই তিনবার ঔষধ সেবন করিয়া প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে রোগী একবার পার্শ্বের দিকে চাহিলেন, কাহাকে দেখিলেন, ঠিক করিতে না পারিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “আঃ!—এতক্ষণ কোথায় ছিলে?—ভবরত্ন! আমাকে কি চিনিতে পারিতেছ?—উঃ! কালান্তক!—আমি তোমার

পিতার পক্ষে কালান্তক হইয়াছিলাম!—আমি তোমার পিতৃহন্তা!—পিতৃহন্তা!—পিতৃহন্তা!—উঃ!—ঐ যে! ঐ যে আমার—ঐ যে আমার প্রাণের ভাই!—ভবরত্ন! ঐ যে তোমার পিতা আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিকট-দর্শনে ঘন ঘন আমার দিকে চাহিতেছে!—নীলরতন! নীলরতন! ভাই, গ্রাস কর! গ্রাস কর! তুমি আমাকে গ্রাস করিয়া ফেল!—উঃ! অত রক্ত কেন? অত রক্ত তোমার গায়ে কে মাখাইল?—ভাই, ঐ রক্তে আমাকে স্নান করাও! রক্তে স্নান করাইয়া তুমি আমাকে নরকে পাঠাও! আবার ও কি? আবার ও কি?—জবাফুলের মালা! ভাই, ঐ জবার মালা আমার গলে পরাও! না না,—আর আমি তোমার দিকে চাহিব না!—আমার চক্ষু পুড়িয়া যাইতেছে!—ভবরত্ন! রক্ষা কর! রক্ষা কর! ক্ষমা কর! ক্ষমা কর! তুমিই রক্ষাকর্ত্তা!—তুমিই আমার সংসারের কর্ত্তা!—তুমিই আমার সমস্ত বিষয়ের কর্ত্তা!—ভোগ কর! ভোগ কর! ভোগ কর!—আমি যাই! চলিলাম! চলিলাম!! চলিলাম!!!”

রোগী নিস্তব্ধ। নয়ন নিমীলিত হইল না, কিন্তু বাক্য হরিয়া গেল। ডাক্তারেরা বুঝিলেন, আর রক্ষা নাই। ভিতরে ভিতরে জ্বর আসিয়াছে,—ভিতরে ভিতরেই বিকারপ্রাপ্ত। এ সমস্ত অবশ্যই বিকারের প্রলাপ! ভবরত্নের মুখের দিকে চাহিয়া একজন ডাক্তার বলিলেন, “কর্ত্তা এখন প্রলাপ বকিতেছেন; সম্মুখে যমদূত দেখিতেছেন, রক্ত দেখিতেছেন;—জবার মালা দেখিতেছেন! ভবরত্ন বলিয়া ডাকিতেছেন, নীলরতনকে ডাকিতেছেন, কে তাহারা?—ভবরত্নের পিতৃহন্তা বলিয়া উনি সম্মুখে বিভীষিকা দেখিতেছেন! নায়েব মহাশয়! ভবরত্ন কে, তাহা কি আপনি জানেন?”

ভবরত্ন উত্তর করিলেন না। এই সময় আর এক বীভৎস দৃশ্য। একজন এলোকেশী রমণী যেন উন্মাদিনীবেশে চঞ্চল-চরণে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া রোগীর বিছানার উপর আছাড় খাইয়া পড়িল;—চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, “এ কি সর্ব্বনাশ! এ কি সর্ব্বনাশ! বাবু! বাবু! তুমি কোথায় যাও?—আমাকে ফেলিয়া তুমি কোথায় চলিলে?—আমাকে সঙ্গে করিয়া লও!—কিছুই আমি জানিতাম না, এইমাত্র শুনিলাম, এই বিপদ্! আমি তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি! বাবু! আমার দিকে একবার ফিরিয়া চাও! আমার

সঙ্গে একটী কথা কও! একটীবার মুখ ফুটিয়া বল, আমার দশা কি করিয়া যাও! আমি তোমার সেই কাঙ্গা—”

ডাক্তারেরা হতবুদ্ধি হইয়া সেই রমণীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, ভাব-ভক্তি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ভবরত্ন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে গা? তুমি এখানে কোথা হইতে আসিলে? তুমি এমন করিয়া কাঁদিতেছ কেন? বাবুকে লক্ষ্য করিয়া ও সব কথা বলিতেছ কেন? স্থির হও, সুস্থ হও, চুপ কর, এ সময় এখানে গোল করিও না, বাবুকে তোমার কি কি কথা বলিবার আছে, স্থির হইয়া আমাদের সাক্ষাতে বল, আমরা তোমার কষ্টের কারণ দূর করিব।”

ডাক্তারেরাও ভবরত্নের ঐ সকল বাক্যের প্রতিধ্বনি করিলেন। স্ত্রীলোক উঠিয়া বসিল। আর তাহার পূর্ব্বভাব রহিল না। শিথিল অঙ্গবস্ত্র যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত করিয়া, ভবরত্নের মুখপানে চাহিয়া, সে বলিতে লাগিল, “আমার নাম কাদম্বিনী, পাড়াগাঁয়ে আমার বাপের বাড়ী, এই বাবু অনেক লোভ দেখাইয়া, আমাকে আমার বাপের বাড়ী হইতে বাহির করিয়া কলিকাতায় আনিয়া রাখিয়াছেন। আমার স্বামী ছিল, আমি তাহাকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। দশ বৎসরের কথা। এখন আমি বেশ্যা, স্বামী এখনও বাঁচিয়া আছে, কুলে কালি দিয়া এ পথে আমি আসিয়াছি, সে আর আমাকে ঘরে লইবে না, বাপের বাড়ীতেও আমি স্থান পাইব না, গৃহস্থ লোকালয়েও আর মুখ দেখাইতে পারিব না। বাবুর যদি কিছু ভাল-মন্দ ঘটে, তখন আমি কোথায় যাইব, কে আমাকে আশ্রয় দিবে? আপনারা দেখুন, এখন আমার বয়স হইয়াছে. এ পথে অধিক বয়সে কেহ ফিরিয়া চায় না। আমি অনাথা, আমি বেশ্যা, আমি কাঙ্গালিনী, বাবু বিহনে আমার উপায় কি হইবে? যে বাড়ীতে আমি আছি, সে বাড়ীখানা ভাড়া করা। বাবু বলিয়াছিলেন, সেইখানা আমার নামে কিনিয়া দিবেন, সে আশা ত ফুরায়. তা ছাড়া মদের দোকানের খাতায় দেনা ২২৫৲ টাকা, স্যাকরার পাওনা ৭৫৲টাকা, রহিম খানসামা নিত্য নিত্য বাবুর জন্য মুরগীর মাংস যোগাইত, তাহার পাওনা ৭৭৲ টাকা, তা ছাড়া আরও আমার অনেক রকম দেনা আছে, সে সকল দেনা আমি কোথা হইতে শোধ দিব? বাবু আদর করিয়া আমার নাম দিয়াছিলেন পিয়ারবানু। সেই পিয়ারবানু এখন পথের ভিখারিণী হয়, উপায় কি?”

এই সকল কথা বলিয়া এক নিশ্বাস ফেলিয়া পিয়ারবানু নিস্তব্ধ হইল; তাহার চক্ষু দিয়া দুই ফোঁটা জল পড়িল। লজ্জা পাইয়া, ডাক্তারদিগের মুখের দিকে চাহিয়া, পিয়ারবানুকে সম্বোধন পূর্ব্বক ভবরত্ন কহিলেন, “দেখ, তুমি এখন ঘরে যাও, দুর্ভাবনা করিও না। ডাক্তারবাবুরা বলিতেছেন, বাবুর প্রাণ-রক্ষা হইবার আশা আছে। ঈশ্বর না করুন, ভাল-মন্দ যদি কিছু ঘটে, তোমার কোন ভয় নাই। বাবু তোমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইবে; আমি তোমাকে বাড়ী কিনিয়া দিব; তোমার যত টাকা দেনা আছে, সুদে আসলে সমস্তই আমি শোধ করিব; কোন চিন্তা করিও না। আমার কথা মিথ্যা হইবে না। এই বাড়ীতেই আমি থাকিব, তোমার যখন ইচ্ছা হইবে, তখনই আমার সঙ্গে দেখা করিও, যাহা আমি বলিলাম, তাহাই ঠিক হইবে, এই আমার অঙ্গীকার রহিল। তুমি এখন ঘরে যাও।”

খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া, আপন মনে ভাল-মন্দ কত কি ভাবিয়া, পিয়ারবানু বিদায় হইল। তাহার বিদায়ের পর ভবরত্ন কিয়ৎক্ষণ সেই রূপ-শয্যাশায়ী সমাজ-সংস্কারক উপদেশকের চরিত্র চিন্তা করিলেন, রোগী তখনও নিঃসাড় নিস্তব্ধ। ডাক্তারেরা ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে যে তিন মাত্রা ঔষধ সেবন করাইয়াছিলেন, সে ঔষধ বলকারক, অথচ তাহাতে নিদ্রা হয়। বাবু নিদ্রাগত। ডাক্তারেরা পরস্পর যুক্তি করিয়া ভবরত্নকে বলিলেন, “এখানে এখন যেন কেহ কোন গোলমাল না করে; নিদ্রাভঙ্গের পর যদি জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়, নিকটেই আমরা থাকি, জানেন আপনি, তৎক্ষণাৎ সংবাদ পাঠাইবেন, তৎক্ষণাৎ আমরা আসিয়া নূতন ব্যবস্থা করিব।”

ডাক্তারেরা বিদায় হইলেন, দাসীরা প্রবেশ করিল, দাসীগণকে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়া ভবরত্ন বাহির-মহলে গমন করিলেন। রাত্রিকালে গৃহিণী আসিয়া আবশ্যকমত কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। কতক্ষণ পরে বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল কি না, ভবরত্ন তাহা জানিতে পারিলেন না। গৃহ হইতে যখন তিনি বাহির হইয়া যান, তাঁহার নিজের লেখা ও অসমাপ্ত বক্তৃতার লেখা কাগজগুলি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, এইখানে সেই কথাটী বলিয়া রাখা উচিত।

পরদিন প্রাতঃকালে বোসের গৃহে প্রবেশ করিয়া ভবরত্ন দেখিলেন, তিনি

একটু ভাল আছেন। ডাক্তারেরা আসিলেন, তাঁহারাও দেখিলেন, পূর্ব্বরজনী অপেক্ষা অবস্থা একটু ভাল। তিনজনেই একটু একটু আশ্বস্ত।

ভবরত্নের মনের ভাব এক প্রকার, ডাক্তারত্রয়ের মনোভাব অন্য প্রকার। তাঁহারা উভয়ে পরস্পর মুখ চাহাচাহি করিয়া বারম্বার রোগীর দেহের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভবরত্ন সেরূপ দৃষ্টিপাতের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না।

নূতন প্রকার ঔষধের ব্যবস্থা হইল। রোগী যেন একটু সুস্থ বোধ করিয়া ভবরত্নের সহিত দুটী পাঁচটী কথা কহিলেন, ডাক্তারদিগকে বলিলেন, "কিঞ্চিৎ আরাম বোধ হইতেছে বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে যেন নূতন প্রকার যন্ত্রণা অনুভব করিতেছি, অঙ্গসঞ্চালন করিতে অতিশয় কষ্ট বোধ হইতেছে।"

ডাক্তারেরা পুনর্ব্বার পরস্পর মুখ-চাহাচাহি করিয়া, অল্পক্ষণ তথায় থাকিয়া, তাঁহারা উভয়েই সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, ভবরত্ন একাকী শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিলেন।

সে দিন সে রাত্রি একভাবে গেল। ডাক্তারেরা দুই তিনবার আসিলেন, অঙ্গে এক প্রকার প্রলেপ দিবার ব্যবস্থা করিলেন, ঔষধ বদল করিলেন না। সে রাত্রে রোগীর ভালরূপ নিদ্রা হইল না, কি যে নূতন যন্ত্রণা, তাহা তিনি কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে পারিলেন না। সেই যে কাদম্বিনী আসিয়াছিল, যাহার ডাকনাম পিয়ারবানু, সেই কাদম্বিনী যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছিল, আচ্ছন্ন অবস্থাতে বাবু হয় তো তাহা শুনিতে পাইয়াছিলেন, অস্থিরতা দেখিয়া ভবরত্ন তাহাই অনুমান করিয়া লইলেন।

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রা। তিনবার প্রলেপ দেওয়া হইল, সময়মত ঔষধ-সেবন করান হইল, ভবরত্ন সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিলেন। পরিচয় না পাইলে হয় তো তিনি তত কষ্ট স্বীকার করিতেন না, পরিচয় পাইয়াছিলেন বলিয়াই রোগীর সঙ্গে যেন রোগী হইয়া নিশা-জাগরণ করিলেন।

রজনী প্রভাত হইল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ডাক্তারেরা উপস্থিত হইলেন। অন্য কোন প্রকার পরামর্শ করিবার অগ্রেই রাত্রের অবস্থা শ্রবণ করিয়া, তাঁহারা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন; তাহার পর একজন দাসীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, দাসী আসিল। ডাক্তারের আদেশে সেই দাসী এক হাঁড়ি জল

গরম করিয়া আনিল, পরিষ্কার একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা বাবুর অঙ্গের প্রলেপগুলি ধীরে ধীরে প্রক্ষালন করিয়া দেওয়া হইল, দাসী চলিয়া গেল।

ডাক্তারেরা একটু নিকটে বসিয়া রোগীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনিমেষ-নেত্রে নিরীক্ষণ করিলেন, কি তাঁহাদের মনে হইল, অগ্রে তাহা কিছু প্রকাশ করিলেন না; তাহার পর ভবরত্নকে বাহিরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া তিনজনে চুপি চুপি কি পরামর্শ করিলেন। চিন্তা করিয়া ভবরত্ন বলিলেন, "তাহাতে যদি কোন বিপদের সম্ভাবনা না থাকে, তবে সে কার্য্যে আমার অমত নাই।" একজন ডাক্তার বলিলেন, "বিপদের সম্ভাবনা অসম্ভাবনা আমাদের হাত নয়, না করিলেও কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা আছে। আপনি বোধ হয় দেখিয়াছেন, উত্তমরূপ পরিপক্ক; আর বিলম্ব করাও উচিত নহে।"

মনে সন্দেহ থাকিলেও ভবরত্ন আর কোন প্রতিবাদ করিলেন না, তিনজনে একসঙ্গে গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। পাঠক-মহাশয়ের স্মরণ আছে, যন্ত্র দ্বারা সে সকল কণ্টক বাহির করিবার উপায় ছিল না, বাবুর দেহের মধ্যে মাংস ভেদ করিয়া সেই সকল কণ্টকের অগ্রভাগ সমভাবে রহিয়া গিয়াছে। শালকাঁটা বিদ্ধ হইলে একস্থানে থাকে না, চলিয়া চলিয়া বেড়ায়, এমন কথাও লোকে বলে, অঙ্গের যে যে স্থান সুপক্ক হইয়াছিল, সেই সেই স্থানেই কাঁটার ফুটিয়া আছে, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। দুইজনের মধ্যে যে ডাক্তারটী অস্ত্রচিকিৎসায় অধিক নিপুণ, তিনি আপন অস্ত্রাধার গোপনভাবে সঙ্গে আনিয়াছিলেন; কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে চৈতন্য-স্তম্ভনের ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগীকে তিনি অচেতন করিলেন, তাহার পর একে একে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অস্ত্র বসাইয়া, অপরবিধ যন্ত্রসাহায্যে গুটীকতক কাঁটা বাহির করিলেন। ঔষধের পরাক্রম থাকিলেও সেই প্রক্রিয়ার সময় রোগী কয়েকবার শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিলেন; প্রক্রিয়া বন্ধ হইল। অস্ত্রব্যবহারের পর যাহা যাহা করিতে হয়, ডাক্তারেরা তাহার সুব্যবস্থা করিলেন, অল্পে অল্পে রোগীর চৈতন্যোদয় হইল, তিনি যেন অনেকটা সুস্থ বোধ করিলেন। কথা কহিতে নিষেধ করিয়া ডাক্তারেরা একখানা মোটা কাপড়ে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা দিয়া রাখিলেন, পার্শ্বে বসিয়া ভবরত্ন নিঃশব্দে সেই আবৃত গাত্রে ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিলেন। দুই ঘণ্টা পরে আবার আসিব বলিয়া ডাক্তারেরা তখন বিদায় হইলেন।

বাবুর মুখে ভবরত্নের পরিচয় প্রকাশ হইয়াছিল, গৃহিণী তাহা শ্রবণ করেন নাই, ভবরত্ন নিকট থাকিলে গৃহিণী সেখানে আইসেন না, একজন দাসী আসিয়া ভবরত্নকে বলিল, "ঠাকুরাণী আসিতেছেন।"

ভবরত্ন উঠিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন, গৃহিণী প্রবেশ করিলেন।

দুই ঘণ্টা অতীত। যিনি অস্ত্র করিয়াছিলেন, সেই ডাক্তার সরকারীতে দর্শন দিলেন। ভবরত্নের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনকার অবস্থা কিরূপ?"—ভবরত্ন কহিলেন, "দুই ঘণ্টার সংবাদ আমি জানিতে পারি নাই। কর্ত্তাঠাকুরাণী সেখানে আছেন, এই দুই ঘণ্টা আমি সে ঘরে প্রবেশ করি নাই।" ডাক্তার পুনরায় বলিলেন, "এখন একবার আমি দেখিব, সংবাদ দিতে বলুন।"

সংবাদ প্রেরণ করা হইল। গৃহিণী সরিয়া গেলেন, ভবরত্নের সহিত ডাক্তার-মহাশয় রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। দুইজন দাসী সেখানে ছিল, তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল, ডাক্তার গিয়া শয্যার উপর বসিলেন, পার্শ্বে উপবেশন করিয়া ভবরত্ন রোগীর গাত্রাবরণ মোচন করিয়া দিলেন, ডাক্তার সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন। রোগীর মুখের ভাব দেখিয়া তিনি যেন একটু শিহরিলেন, আর একটু নিকটে গিয়া হস্তদ্বারা পূর্ব্বক নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, বক্ষে ললাটে করস্পর্শ করিলেন, বদন গম্ভীর হইল, পুনর্ব্বার নাড়ী পরীক্ষা করিলেন; ভবরত্নের মুখের দিকে চাহিলেন, একটীও কথা কহিলেন না; অন্যমনে মস্তকসঞ্চালন পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইয়া, হস্তসঙ্কেতে ভবরত্নকে ডাকিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন, পূর্ব্ববৎ রোগীর অঙ্গ আবৃত করিয়া, সেই দিকে চাহিতে চাহিতে ভবরত্ন সন্দিগ্ধচিত্তে ডাক্তারের অনুগমন করিলেন।

সরকারীর একটী নির্জ্জন গৃহে উপবিষ্ট হইয়া বিমর্ষ-বদনে ডাক্তার-মহাশয় ভবরত্নকে কহিলেন, "পূর্ব্বে আমি যাহা অনুমান করিয়াছিলাম, তাহাই যথার্থ। ভিতরে ভিতরে জ্বর হইয়াছিল, সেই জ্বর এখন প্রকাশ পাইয়াছে। ঔষধ দিতে হয়, লিখিয়া দিতেছি, অবিলম্বে আনাইয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেবন করাইবেন, কিন্তু জীবনের আশা অতি অল্প। এখন আমি চলিলাম, অবস্থা দেখিয়া প্রয়োজন হইলে সংবাদ দিবেন।"

ডাক্তার চলিয়া গেলেন, দশ মিনিটের মধ্যে ঔষধ আনাইয়া ভবরত্ন স্বয়ং

সেই ঔষধের শিশি হস্তে রোগীর গৃহে উপস্থিত হইলেন, ঔষধ খাওয়াইতে আরম্ভ করিলেন। তিন ঘণ্টায় তিনবার ঔষধ সেবন করিয়া বাবু ব্রজরত্ন একবার মনে আপনার অবস্থা বিস্মৃত হইয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, যন্ত্রণায় অধীর হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ভবরত্ন অতি সাবধানে তাঁহাকে ধরিয়া ধীরে ধীরে শয়ন করাইয়া দিলেন, বাবু একবার হাঁ করিলেন। ভবরত্ন বুঝিলেন, পিপাসা। নিকটেই জল ছিল, রূপার চামচে করিয়া তিনি একটু একটু জল তাঁহার মুখে দিলেন, তিনি একটী নিশ্বাস ফেলিয়া, অতি কষ্টে ললাটে হস্তার্পণ করিয়া উচ্চারণ করিলেন "আঃ!"

পাঁচ মিনিট নিস্তব্ধ; উভয়েই নিস্তব্ধ; পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দাসীরাও নিস্তব্ধ। বাবুর গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া ভবরত্ন বুঝিলেন, জ্বর অত্যন্ত প্রবল, গাত্রে যেন অগ্নির উত্তাপ; চক্ষের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, দুই চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ। অত্যন্ত উদ্বেগবৃদ্ধি হইল। ডাক্তারকে ডাকিয়া পাঠাইবার জন্য তিনি একজন দাসীকে বলিলেন, "সেরেস্তার একজন মুহুরীকে গিয়া বল, ডাক্তারবাবুকে শীঘ্র সংবাদ দেয়।"

দাসী যাইবার উপক্রম করিতেছিল, কষ্টে ভবরত্নের দিকে মুখ ফিরাইয়া, দাসীদের দিকে হস্তসঞ্চালন করিয়া নয়নভঙ্গীতে বাবু এক প্রকার ইঙ্গিত করিলেন। ভবরত্ন বুঝিলেন, দাসীদের উভয়কেই তাড়াইবার ইঙ্গিত। কি কারণে উহাদিগকে তাড়াইবার ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা না বুঝিয়াও দাসী দুটীকে তিনি বলিলেন, "যাও, সেরেস্তায় খবর দিয়া তোমরা উভয়েই এখন ঠাকুরাণীর নিকটে ফিরিয়া যাও; এখানে আর এখন তোমাদের থাকিবার প্রয়োজন নাই।"

মাথা হেঁট করিয়া কি যেন ভাবিতে ভাবিতে দাসীরা বাহির হইল। বাবু আবার দরজার দিকে হস্তসঙ্কেত করিয়া ভবরত্নের মুখপানে চাহিলেন, ভবরত্ন উঠিয়া গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন; মনে মনে ভাবিলেন, না জানি আজ আবার কি কাণ্ড হয়। বদন বিকৃত করিয়া, ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া, বাবু অতিক্ষীণ ভঙ্গস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "উঃ! কি যন্ত্রণা! প্রাণ যায়!" এইটুকু বলিয়াই অল্পক্ষণ থামিয়া পুনর্ব্বার হাঁ করিলেন, ভবরত্ন এবার জল না দিয়া একমাত্রা ঔষধ তাঁহার মুখবিবরে ঢালিয়া দিলেন; মুখ বিকট করিয়া, কষ্টে চক্ষু ঘুরাইয়া, ভবরত্নকে দেখিয়া দারুণ বেদনাব্যঞ্জক স্বরে কর্ত্তা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করিলেন, "যন্ত্রণা!—যন্ত্রণা

নিদারুণ যন্ত্রণা!—উঃ!—ভ ব-র-ত-ন! তুম আছ?—হাঁ,—সেই কথা।—ভ-ব র-ত-ন! সেই—কাগজ তোমার সঙ্গে আছে?"

ভবরত্ন বুঝিলেন, কোন্ কাগজের কথা। বাবুর কথা শুনিয়া শুনিয়া সে রাত্রে যে কাগজ তিনি লিখিয়াছিলেন, সেই কাগজ তদবধি তাঁহার সঙ্গেই ছিল, প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া তিনি উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, সে কাগজ কোথাও আমি রাখি নাই, কাহাকেও দেখাই নাই, জামার পকেটেই রাখিয়া দিয়াছি, সঙ্গেই আছে।"

যন্ত্রণায় একটা হাই তুলিয়া, যন্ত্রণাব্যঞ্জক ভগ্নকণ্ঠে বাবু কহিলেন, "বা—হি—র—কর; আমি—আমি—আমি—হাঁ,—আমি—লি—খি—ব।"

প্রলাপ কি প্রকৃত, বুঝিবার সন্দেহ থাকিলেও ভবরত্ন আপন পকেট হইতে সেই কাগজগুলি বাহির করিলেন। বক্রনয়নে বাবু তাহা দেখিলেন; পূর্ব্বরূপ ভগ্নস্বরে কহিলেন, "বা—হি—র—কর;—যেখানে আমার কথা শেষ, যে পর্য্যন্ত লিখিয়া তুমি কলম ফেলিয়া দিয়াছিলে, সেই স্থানটা বাহির কর;—দোয়াত-কলম দাও;—কলমটা আমার হাতে দাও;—জায়গাটা দেখাইয়া দাও;—আমি লি-খি।"

ভাবার্থ বুঝিতে না পারিয়াও ভবরত্ন আদেশপালন করিলেন; দোয়াত-কলম সম্মুখে রাখিয়া সেই কাগজখানি বাবুর হস্তের নিকটে ধরিলেন; যেখানে লেখা ছিল, "আমি তোমার নাম জানি;—তোমার নাম ভ—ব—র—ত—ন—" সেই স্থানটী অঙ্গুলী দ্বারা দেখাইয়া দিলেন; কম্পিত-হস্তে লেখনী ধারণ করিয়া বাবু সেইখানে আপন নামটী দস্তখৎ করিলেন। অক্ষরগুলি কিছু বাঁকা বাঁকা হইলেও লিখিতে কিছু ভুল হইল না। পঞ্জিকা দর্শন করিয়া সেইখানে সন-তারিখ লিখিয়া দেওয়া হইল।

আর কোন কথা নাই। দ্বারের বাহিরে ডাক্তার-মহাশয় ডাকিলেন, ভবরত্ন দ্বার খুলিয়া দিলেন। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই ভবরত্নের দিকে চাহিয়া ডাক্তার-মহাশয় বলিলেন, "আবার আপনি তাই করিতেছেন? এখন কি আর বিষয়-কর্ম্মের কাজ-পত্র লেখা পড়া করিবার সময়? ও সকল কিসের কাগজ?"

কাগজগুলি গুটাইয়া আপনার পকেটে রাখিয়া ভবরত্ন উত্তর করিলেন, "আর এক সময় আপনাকে দেখাইব। আজ আর লেখাপড়া কিছুই হয় নাই, কর্ত্তা একটু ভাল আছেন।"

ডাক্তার-মহাশয় বসিলেন। রোগীর বামপার্শ্বে ভবরত্ন খানিকক্ষণ ভবনাথের মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া, চকিত-নেত্রে ডাক্তার-মহাশয় রোগীর মুখের দিকে চাহিলেন। রোগীর চক্ষু মুদিত, মুদিত চক্ষের ক্রোড়ে অশ্রুধারা। দুই তিনবার মস্তকসঞ্চালন করিয়া ডাক্তার একবার সন্দেহে সন্দেহে রোগীর উভয় হস্তের নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, আরও দুইবার মস্তকসঞ্চালন করিলেন; মুখে কিছু বলিলেন না, অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া কি যেন চিন্তা করিয়া ভবরত্নকে কহিলেন, "আর একটা নূতন ঔষধ আবশ্যক হইতেছে; সেই ঔষধে যদি বিশেষ কিছু উপকার হয়, তাহা হইলে আর একবার আমাকে সংবাদ দিবেন।" এই বলিয়া তিনি এক টুক্‌রা কাগজে তিনটী ঔষধের নাম লিখিয়া দিলেন, ঔষধ আসিবার অপেক্ষা করিলেন না, শীঘ্র শীঘ্র উঠিয়া গেলেন।

ঔষধ আসিল, কিন্তু দুই ঘণ্টার মধ্যে রোগীকে তাহা সেবন করাইবার অবসর হইল না। তিনি চক্ষু বুঝিয়া ছিলেন, শরীর অস্পন্দ হইয়াছিল, ভবরত্ন তিন চারিবার ডাকিলেন, উত্তর পাইলেন না; মনে করিলেন, হয় তো নিদ্রিত; মুখের দিকে চাহিয়া আধঘণ্টা বসিয়া রহিলেন, স্পন্দনলক্ষণ অনুভব করিতে পারিলেন না। হঠাৎ একবার রোগীর চক্ষুদুটী উন্মীলিত হইল; ভবরত্ন চমকিয়া উঠিলেন। চক্ষুর তারকা যেন চক্রাকারে ঘূর্ণিত হইতেছিল, এক একবার অদৃশ্য হইতেছিল। অদ্ভুত বিঘূর্ন। চক্ষু দেখিলে ভয় হয়। তিনি জাগিয়াছেন, মনে করিয়া, ভবরত্ন একমাত্রা ঔষধ ঢালিয়া তাঁহার মুখ দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, চেষ্টা বিফল হইল; মুখে হাত দিয়া দেখিলেন, দাঁতে দাঁত লাগিয়া গিয়াছে, শুনিলেন, কড়মড় করিয়া শব্দ হইতেছে। তাঁহার ভয় হইল, ডাক্তারকে সংবাদ দিবেন, একবার এইরূপ ভাবিলেন, কিন্তু নূতন ঔষধ-সেবনের কার্য্য দেখিয়া সংবাদ দিবার কথা, সেই কথা স্মরণ হওয়াতে সে কল্পনা তখন পরিত্যাগ করিলেন। দুই ঘণ্টা পরে আপনা হইতেই দাঁতকপাটী ছাড়িল, মাথা ঘুরাইয়া কর্ত্তা একবার হাঁ করিলেন; জলপিপাসায় মুখব্যাদান, ইহা বুঝিয়াও পানীয় জল প্রদান না করিয়া, ভবরত্ন সেই অবসরে পূর্ব্বকথিত ঔষধের মাত্রাটী তাঁহার মুখে ঢালিয়া দিলেন, আধঘণ্টা পরে আর একবার, পুনরায় আধঘণ্টা পরে তৃতীয়বার। রোগীর চক্ষের দিকেই ভবরত্নের নিনিমেষ দৃষ্টি। আরও আধঘণ্টা পরে চক্ষের পূর্ব্বভাবের পরিবর্ত্তন হইল, ঘূর্ণন থামিল; পুত্তলিকা বিবর্ণ হইয়াছিল, স্বাভাবিক বর্ণ ধারণ

করিল। ভবরত্ন তখন ললাটে হস্তার্পণ করিয়া বুঝিলেন, উত্তাপটা অনেক কমিয়াছে।

কিঞ্চিৎ ভরসা পাইয়া ভবরত্ন তখন ডাক্তারকে সংবাদ পাঠাইলেন, ডাক্তার আসিলেন, পরীক্ষা করিলেন, সঙ্কেতে ভবরত্নকে ডাকিয়া বারন্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন। রোগীকে একাকী রাখিয়া ভবরত্নও ডাক্তারের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অল্পক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া ডাক্তার মহাশয় বলিলেন, "আর কেন বৃথা চেষ্টা। আর আশা নাই। শরীরের রক্ত জল হইয়া গিয়াছে, তাহাতেই জ্বরের উত্তাপ অল্প হইয়া আসিয়াছে, ভিতর পচন ধরিয়াছে, ক্ষতস্থানের উপরিভাগে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শুষ্ক বোধ হয়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে পচিতেছে। কাঁটা বাহির করিবার জন্য অস্ত্র করা হইয়াছিল, তাহাতে আশামত ফল হইল না। যতদূর পারেন, সাবধানে রাখিবেন, গরমজলে ক্ষতস্থান সর্ব্বদা প্রক্ষালন করিয়া দিতে বলিবেন। যে ঔষধ এইবার দেওয়া হইয়াছে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাহাই সেবন করাইবেন, জ্বরত্যাগ হইবে; জ্বর আসিবার মূলকারণ যাহা, তাহা দমন করিবার উপায় আর নাই, সমস্তই শেষ হইয়া আসিয়াছে। যাহা যাহা আমি বলিলাম, রোগী যেন তাহা শুনিতে না পান, গৃহিণী যেন এই নিরাশার সংবাদটী এখন জানিতে না পারেন।"

ডাক্তার আর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন না, বারান্দা হইতেই সিঁড়ির দরজা পার হইয়া নামিয়া গেলেন, ভবরত্ন গৃহে প্রবেশ করিলেন।

আরও দুই দিন গেল। ক্রমে ক্রমে শরীরের প্রায় অর্দ্ধাংশ পচিয়া উঠিল। গাত্রের দুর্গন্ধে নিকটে কেহ তিষ্ঠিতে পারে না। অষ্টপ্রহর ধুনা গুগ্‌গুলের ধূমে গৃহটী প্রায় অন্ধকার করিয়া রাখা হয়, তথাপি সে দুর্গন্ধ যায় না। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ চিকিৎসা, বিশেষতঃ বড়লোক, এই কারণে ডাক্তারেরা নামমাত্র ঔষধ দেন, সে সকল ঔষধে আর কোন ফল হয় না। মুখে বাক্য নাই, হস্তপদে সাড় নাই, নেত্র-কর্ণও বিকল; কোন ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য নাই; কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আহার ছিল, তাহা পর্য্যন্ত বন্ধ। অন্তরের যাতনা কত, তাহা তিনি অনুভব করিতে পারিতেছিলেন কি না, তাহাও জানা গেল না। ইহজন্মে ইহশরীরে ঐরূপ অবস্থায় পাপের ফল কিরূপ বোধ হয়, যিনি সর্ব্বকর্ম্মের ফলদাতা, তিনিই তাহা জানিতে পারেন।

ঐরূপ অবস্থায় পাঁচ দিন গেল, জীবন আছে, কেবল নাসিকার নিশ্বাসে আর হৃদয়ের অল্প অল্প স্পন্দনে তাহা অনুভূত হয়। পাপীলোকের মৃত্যুযন্ত্রণা যে কত অধিক, ভুক্তভোগীরাই তাহা বুঝিতে পারে। প্রাণ গেলেই শান্তি হয়, পাপীর প্রাণ কিন্তু শীঘ্র বাহির হয় না;—যায় যায় যায় না। অবর্ণনীয় অননুভবনীয় অসহনীয় যন্ত্রণা। বাড়ীর সকলেই মহা উদ্বিগ্ন, মহা বিষণ্ণ, সমভাবে নিস্তব্ধ। সে সময় যদি সেই বাড়ীর মধ্যে কোন নূতন লোক প্রবেশ করিত, বাড়ীতে মানুষ আছে, তেমন লক্ষণ কেহই কিছুই বুঝিতে পারিত না।

ডাক্তার-বিদায়ের পর ষষ্ঠ রজনীর শেষভাগে বাবু ব্রজরত্ন চৌধুরীর বহু-পাপ-দগ্ধ বহুতাপতপ্ত প্রাণপক্ষী উড়িয়া গেল। শরীরের সমস্তই প্রায় গলিত হইয়াছিল, কেবল অবশিষ্ট দুর্গন্ধময় খণ্ড খণ্ড গলিত মাংসপিণ্ড ভীষণ শ্মশানপ্রান্তে দগ্ধ করা হইল। স্ত্রীলোকেরা দুই চারি দিন অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া রোদন করিলেন, ক্রমে ক্রমে শোকের অবসান। ত্রয়োদশ দিবসে সমস্তই ফুরাইল; রহিল কেবল নাম আর মহা মহা পাপের নিদর্শন। জগতের রীতিই এই। পাপ-পুণ্যের পরিণাম এই প্রকারেই হইয়া থাকে; প্রভেদ কেবল পুণ্যবানের পুণ্যকীর্ত্তির ঘোষণা, পুণ্যাত্মার বিমল শান্তি আর পাপীলোকের পাপকোলাহলময় নরকধামের চির-অশান্তি।

বাবু ব্রজরত্নের ভবলীলা ফুরাইল। বাবু ভবরত্ন চৌধুরী তাঁহার সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইলেন। ব্রজরত্নের পত্নী শেষকালে স্বামীর রুগ্নশয্যায় মুমূর্ষু স্বামীর মুখে এক রাত্রে ভবরত্নের পরিচয় শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকটে আর নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইল না, ভবরত্নকে তিনি পরমাদরে পুত্রতুল্য স্নেহ করিতে লাগিলেন; ভবরত্নও আপন জ্যেষ্ঠতাতপত্নীকে মাতৃতুল্য সেবা-ভক্তি করিতে লাগিলেন।

বাড়ীর দাসী-চাকরেরা ভবরত্নের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকেই বাড়ীর কর্ত্তা বলিয়া পরমানন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। ভবরত্ন ইতিপূর্ব্বে একজন ডাক্তারকে বলিয়াছিলেন, সময়ে একদিন আপনি সকল কথা জানিতে পারিবেন;—সকল কথা জানাইবার দিন আসিয়া উপস্থিত হইল, যাঁহারা চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আহ্বান করা হইল, প্রতিবাসী ভদ্র ভদ্র লোকেরাও আহূত হইলেন, প্রশস্ত দপ্তরখানায় মজ্‌লীস্ বসিল; সেরেস্তার আমলারা সকলেই সেই

মজ্‌লীসে উপস্থিত থাকিল। ভবরত্ন তখন আর ব্রজবাবুর সেরেস্তার নায়েব-মহাশয় নহেন, সর্ব্বময় কর্ত্তা, তিনি একখানি শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট হইলেন, চতুর্দ্দিকে সভাসদ্‌বর্গ পরিবেষ্টন করিয়া বসিলেন; প্রকৃতই যেন রাজসভার ন্যায় শোভা হইল। মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া বাবু ব্রজরত্ন চৌধুরী ভবরত্নের দ্বারা যে দলীলখানি লিখাইয়াছিলেন, ভবরত্নের আদেশে সেরেস্তার একজন আমলা দিব্য পরিষ্কার উচ্চারণে উচ্চকণ্ঠে সেইখানি পাঠ করিলেন। সকলে তাহা শ্রবণ করিয়া অভাবনীয় বিস্ময়ানন্দে অভিভূত হইলেন। মৃত ভূম্যধিকারী ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য হইয়া অকিঞ্চিৎকর ধনলোভে আপন কনিষ্ঠ সহোদরকে (ভবরত্নের জন্মদাতা পিতাকে) খুন করিয়াছিলেন, ঐ দলীলের মধ্যে সেই অংশ শ্রবণ করিতে করিতে সকলেরই শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছিল। পাপীর নিজমুখে পাপকর্ম্মস্বীকার একটী অনুতাপ, ইহা সত্য, কিন্তু সেই অনুতাপে ব্রজরত্নের তত বড় পাপের মোচন হওয়া সম্ভাবিত নহে, নরকবাস অনিবার্য্য, সকলের মুখে সেই কথা বারংবার ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

একজন ভদ্রলোক বাবু ভবরত্নের সহিষ্ণুতা ও মহানুভাবতার উচ্চ-প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "পত্র লিখিবার সময় দুরাচার জ্যেষ্ঠতাতের মুখে আপন পিতৃ-হত্যার পরিচয় শুনিয়া, তাহার পরেও যে ইনি সেই পাপাত্মা জ্যেষ্ঠতাতের ব্যাধিশয্যায় বসিয়া অনুগত ভৃত্যের ন্যায় সেবা করিয়াছেন, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত একদিনের জন্যও কাছ-ছাড়া হন নাই, নরপিশাচের গলিত দেহের পৈশাচিক দুর্গন্ধেও কিছুমাত্র ঘৃণা করেন নাই, তাহাতে ইহাঁকে মানবরূপী দেবতা বলিয়া পূজা করিতে হয়।"

সমবেত সর্ব্বলোকেই সাধু সাধু বলিয়া ঐ বাক্যের প্রতিধ্বনি করিলেন। প্রথমে যিনি ঐ প্রশংসাবাদ ব্যক্ত করিলেন, করযোড়ে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া, অবশিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা নমস্য, তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া, অপরাপর ব্যক্তিগণের নিকটে নম্রতা প্রকাশ করিয়া, ভবরত্ন আপন স্বভাবসিদ্ধ শিষ্টাচারের পরিচয় দিলেন। সেই দিন রজনীযোগে সেই বাড়ীতে সমাগত সমস্ত লোকের মহাভোজ এবং নৃত্যগীতাদি মহোৎসব হইল। নিদ্রাগত হইবার অগ্রে ভবরত্নের মনে একটী কথা উদয় হইল। মূলদলীলের সঙ্গে যে একখানি স্বতন্ত্র কাগজ ছিল, সেখানি কি? সেরেস্তার মুহুরী যেখানি লিখিতে লিখিতে অর্দ্ধ-

সমাপ্ত রাখিয়াছিল, সেখানি তাহাই। সে পত্র কাহাকে লেখা হইতেছিল, চিন্তা করিয়া ভবরত্ন তাহা তখন স্থির করিলেন। যাঁহার পাঠশালা হইতে ভবরত্নকে নির্ব্বাসিত করা হয়, তাঁহারই নামে ব্রজরত্ন অগ্রে উহা লিখাইতেছিলেন; লিখাইতে লিখাইতে কি ভাবিয়া মুহুরীকে তিনি বিদায় করিয়া দেন। তাহার পরেই ভবরত্নের লিখিত মূলদলীলের জন্ম।

সকলের নিকটে আত্মপরিচয় প্রকাশ করিয়া, ভবরত্ন একদিন একজন ভৃত্য সমভিব্যহারে বর্দ্ধমান জেলার দামোদরতীরবর্ত্তী মহেশ্বরপুর গ্রামের কৃপানন্দ ভট্টাচার্য্যের গৃহে গমন করিয়া আপন জননীর চরণবন্দনা করেন, পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিয়া আত্ম-পরিচয় দেন, স্নেহময়ী জননী স্নেহাশ্রুবর্ষণে পুত্রের মস্তক অভিষিক্ত করিয়া আনন্দপ্রবাহে নিমগ্ন হন। বহুদিনের পর মাতা-পুত্রের পুনর্ম্মিলনে সেখানে যে কতদূর আনন্দলহরী ছুটিয়াছিল, লেখনীমুখে তাহা ব্যক্ত করা দুর্ঘট। যাঁহাদের অনুভবশক্তি আছে, তাঁহারা অনুভবেই সে আনন্দ বুঝিয়া লইবেন; যাঁহাদের ভাগ্যে সেরূপ আনন্দলাভ ঘটিয়াছে, তাঁহারা তাহা স্মরণ করিয়া আপন আপন অবস্থার সহিত সেই আনন্দ মিলাইবেন। কৃপানন্দেরও পরমানন্দ, তাঁহার পরিবারবর্গেরও অতুল আনন্দ। কৃপানন্দের অনুরোধে তিন দিন তথায় অবস্থান করিয়া ভবরত্ন আপন জননীকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। কলিকাতার সেই নিকেতন তখন ভবরত্নের আনন্দনিকেতন হইল।

একমাস অতীত। প্রতিবাসী ভদ্রলোকেরা নিত্য নিত্য সেই বাটীতে উপস্থিত হইয়া নবীন অধিকারীর সহিত প্রিয়সম্ভাষণ করেন, ভবরত্নের অমায়িক ব্যবহারে পরম পরিতৃপ্ত হন, নানা প্রসঙ্গে নানাপ্রকার গল্প হয়, সকলেই আমোদিত। কথায় কথায় একজন একদিন বলিলেন, "আপনার পিতৃব্যকে আমরা বেশ চিনিয়াছিলাম। প্রথমবয়সে নিজ বাসগ্রামে কি কি কার্য্য তিনি করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের জানা ছিল না, এখানে আসিয়া দিনে দিনে সকলের সহিত মিশিতে আরম্ভ করিলেন, ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচার করিতে লাগিলেন, বড় বড় সভায় সমাজসংস্কারের কথা তুলিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা জুড়িয়া দিলেন, দেখিয়া শুনিয়া আমরা চমৎকৃত হইলাম। সমাজসংস্কারের কথাটা কলিকাতায় তখন পথে ঘাটে আন্দোলিত হইত না, ব্রহ্মসভার দুই একজন লোক আপনাদের সভামন্দিরে আমাদের সমাজ-সম্বন্ধে কিরূপ তর্ক-বিতর্ক করিতেন, সকলে তাহা

শুনিতে পাইত না, শুনিবার জন্য ব্রহ্মসভাতে যাইত না। আপনার পিতৃব্য আমাদের কর্ণে নিত্য নিত্য নূতন কথা শুনাইতে লাগিলেন। তিনি একজন বড়লোক, তাঁহার টাকা অনেক ছিল, অনেক লোক তাঁহার অনুগত হইল। লোকে যেমন তামাসা দেখিবার জন্য রাসযাত্রা, দোলযাত্রা, রথযাত্রার মেলাস্থলে গমন করে, আমোদের জন্য যেমন যাত্রা, কবি, পাঁচালী ইত্যাদি শুনিতে যায়, আমরাও সেইরূপে ব্রজবাবুর বক্তৃতা শুনিতে যাইতাম। এক একটা কথা শুনিয়া রাগ হইত, এক একটা কথা শুনিয়া হাসি পাইত, এক একটা কথা শুনিয়া তাঁহাকে পাগল মনে করিতাম, কিন্তু মনের সকল প্রকার ভাব চাপিয়া চাপিয়া রাখিতাম। দশের কাছে যিনি ধর্ম্মজ্ঞানী বড়লোক বলিয়া পরিচিত হইতেছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ কথা বলিয়া কোন ফল হইবে না, ইহা ভাবিয়াই আমরা নিস্তব্ধ থাকিতাম। তিনি ধর্ম্মজ্ঞানী, তাহার নিদর্শন ছিল গঙ্গাস্নান আর নিত্য তর্পণ। টাকার মানুষ, কিন্তু বাড়ীতে কোন পূজা-পার্ব্বণ অথবা অন্যপ্রকার ক্রিয়া-কর্ম্ম হইত না, ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি সামাজিক অনুষ্ঠানেও তিনি বিরত ছিলেন; অধিক কথা কি, ভিখারীরাও তাঁহার দ্বারে মুষ্টি-ভিক্ষা পাইত না। সাহেবলোকের সহিত মিশিবার সাধটাও তাঁহার বিলক্ষণ ছিল, ইংরাজী কথা ভাল বুঝিতেন না বলিয়া বড় বড় সাহেবের মজ্‌লীসে যাইতে তাঁহার বড় একটা সাহস হইত না। সাহেবেরা ভাল বলিবে, দাতা বলিবে, হিতৈষী বলিবে, তেমন কোন কার্য্য করিবার সুবিধা পাইলে তিনি সাহেবের মনোরঞ্জনের জন্য এক একটা হুজুগে কিছু কিছু দান করিতেন। বিলাতে একবার কে একজন সাহেব মরিয়াছিল, তাহার একটা পাথরের মুরদ গড়াইয়া দিবার জন্য কলিকাতায় চাঁদা হয়, ব্রজবাবু সেই চাঁদায় খাতায় ৫০৲ টাকা দান দস্তখৎ করিয়াছিলেন। খবরের কাগজে সেই দানের কথাটা ছাপা হইয়াছিল। ছাপার কাগজে আপনার নাম উঠিয়াছে দেখিয়া তিনি বড় খুসী হইয়াছিলেন। দেশের লোকের উপকারের নিমিত্ত তিনি কখনও একটী পয়সাও দান করেন নাই।"

যে দুটী ডাক্তারের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারাও সেই দিনের মজ্‌লীসে উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকের কথা সমাপ্ত হইলে সেই দুই জন ডাক্তারের মধ্যে একজন সম্মুখদিকে একটু সরিয়া বসিয়া অত্যল্প ভূমিকার পর মুক্তকণ্ঠে

কহিলেন, "সমাজ-সংস্কারের বক্তৃতায় ব্রজবাবুর খুব ঝোঁক ছিল, কিন্তু নিজের সংস্কারের দিকে আদৌ মনোযোগ ছিল না। তাঁহার গুপ্তচরিত্রে অনেক গোলমাল ছিল। ধরি মাছ না ছুঁই পানি, এই যে একটা কথা আছে, চতুর ব্রজবাবু সেই কথার মর্য্যাদা বুঝিয়া চলিতেন, সকল কার্য্যেই তাঁহার লুকাচুরি ছিল। ছিপ ফেলিয়া মৎস্য ধরিলে গায়ে জল লাগে না, ডাঙ্গায় দাঁড়াইয়া জাল ফেলিয়া মৎস্য ধরিলে জল ছুঁইতে হয় না, ইহা তিনি বুঝিতেন। যত কিছু পাপ-কার্য্য তিনি করিয়াছেন, তৎসমস্তই কৌশলক্রমে অপরের দ্বারা সাধন করা হইয়াছে; স্বহস্তে তিনি কোন প্রকার দুষ্কার্য্য করেন নাই, স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া পরের দ্বারা করিবার হুকুম দেন নাই, লোকে তাঁহাকে সাধু বলিয়া জানুক, ইহাই তাঁহার অভিসন্ধি ছিল।"

ভবরত্ন কহিলেন, "আপনারা আর আমাকে সে সকল কথা শুনাইবেন না। লোকের অসাক্ষাতে নিন্দা করা যেমন দোষ, মরা মানুষের নিন্দা করা তদপেক্ষা অধিক দোষ; মৃত ব্যক্তির নিন্দাবাদ আমি শুনিতে ইচ্ছা করি না। তিনি নিজ মুখে আমার সাক্ষাতে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, স্বহস্তে যাহা আমি লিখিয়া লইয়াছি, তাহাই যথেষ্ট; তাহাতেই আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছি, তাঁহার গুপ্ত-চরিত্রের অধিক ব্যাখ্যা আর আমাকে শুনিতে হইবে না।"

যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে ভবরত্নকে সাধুবাদ দিলেন। সে দিনের মত মজ্‌লীস্ ভঙ্গ হইল। সপ্তাহ পরে ভবরত্ন একটী নির্জ্জন কক্ষে উপবিষ্ট আছেন, পার্শ্বে মুরুব্বীয়ানা ধরণের একটী লোক গম্ভীরবদনে বসিয়া আছেন, একজন স্ত্রীলোক সেই গৃহে প্রবেশ করিল। সেই কাদম্বিনী। দেখিবামাত্র ভবরত্ন তাহাকে চিনিলেন। পার্শ্বের লোকটীর প্রতি একবার কটাক্ষপাত করিয়া কাদম্বিনীকে তিনি বলিলেন, "তোমার দেনার একখানা ফর্দ্দ আমাকে দিও, আমি সমস্ত পরিশোধ করিয়া দিব; কর্ত্তা ইহসংসার হইতে চলিয়া গিয়াছেন, এখন তুমি ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পার; তিনি জীবিত থাকিলে আমি তোমাকে একখানা বাড়ী কিনিয়া দিতে পারিতাম, কিন্তু এখন আর তাহা আমার কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি না। যে দিন তুমি দেনার ফর্দ্দ আনিবে, সেই দিন সেই দণ্ডে আমি হিসাব পরিষ্কার করিব।"

অঞ্চল হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া কাদম্বিনী বলিল, "ফর্দ্দ আমি

আনিয়াছি, এই দেখুন সেই ফর্দ্দ।" কাদম্বিনীর হস্ত হইতে ফর্দ্দখানা গ্রহণ করিয়া ভবরত্ন আগাগোড়া অঙ্কগুলি অবলোকনপূর্ব্বক একজন চাকরকে ডাকিলেন, চাকর আসিলে তাহার হস্তে একখণ্ড চিরকুট লিখিয়া দিয়া দপ্তরখানায় পাঠাইলেন। চাকর ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার হস্তে খানকতক ব্যাঙ্কনোট প্রদান করিল, গণনা করিয়া তিনি সেইগুলি কাদম্বিনীকে দিলেন, দ্বিরুক্তি না করিয়া, পার্শ্বস্থ লোকটীর দিকে কটাক্ষসন্ধান করিতে করিতে কাদম্বিনী চলিয়া গেল।

পার্শ্বস্থ লোকটীর নাম রামতনু ঘোষাল। কাদম্বিনীকে তিনি চিনিলেন। ব্রজরত্নের সঙ্গে তিনি মধ্যে মধ্যে কাদম্বিনীর বাড়ীতে যাইতেন, এক এক রাত্রে একাকীও দর্শন দিতেন; কাদম্বিনীর সঙ্গে তাঁহার গুপ্তপ্রেম ছিল; সে সকল কথা গোপন করিয়া কাদম্বিনী বিদায় হইবার পর ভবরত্নকে তিনি কহিলেন, "ঐ স্ত্রীলোককে আমি চিনি, আপনি যাহা করিলেন, তাহাও বুঝিলাম; আপনার জ্যেঠা মহাশয় একজন তুখোড় লোক ছিলেন; যে সূত্রে কাদম্বিনীর সহিত তাঁহার আলাপ, সে সূত্র বাজারের সাধারণ প্রণয়ালাপের সূত্র নহে, কাদম্বিনী পূর্ব্বে কুলকন্যা ছিল, আপনার জ্যেষ্ঠতাত উহাকে কুলের বাহির করেন। আমি একবার—"

মনে মনে বিরক্ত হইয়া, বেশী কথা না শুনিয়াই ভবরত্ন কহিলেন, "সে পরিচয় আমার শুনিবার আবশ্যক নাই। আপনি উহাকে চিনিয়াছেন, ইহা আমি জানিলাম, ঐ পর্য্যন্তই ভাল।"

রামতনু ঘোষাল অপ্রতিভ হইলেন না, তাঁহার লম্বা লম্বা দাড়ী ছিল, মুখ ভারী করিয়া সেই দাড়ীতে পাক দিতে দিতে গম্ভীরস্বরে তিনি বলিতে লাগিলেন, "আপনি শুনিতে চান না, কিন্তু আমার প্রাণে বড় লাগে। আমার ভাগিনেয়ের সহিত ঐ কাদম্বিনীর বিবাহ হইয়াছিল, সেই ভাগিনেয় আজিও বাঁচিয়া আছে, এই সহরের ষ্ট্যাম্প-আফিসে চাকরী করে, কাদম্বিনীকে হারাইয়া সেই অবধি সে আর বিবাহ করে নাই। বিবাহের সময় হইতে কুলের বাহির হওয়া পর্য্যন্ত কাদম্বিনী আমাকে দেখে নাই, আমিও কাদম্বিনীকে দেখি নাই। ব্রজবাবুর সহিত আমার বন্ধুত্ব হইয়াছিল, একরাত্রে তাঁহার সঙ্গে গিয়া কাদম্বিনীকে আমি দেখি; সেই আমার প্রথম দেখা। আমি তাহার মামাশ্বশুর, সে তাহা জানিত না; খোলামুখে আমার সঙ্গে কথা কহিয়াছিল, বাবুর সঙ্গে মদ খাইয়াছিল, নাচিয়া নাচিয়া গীত গাহিয়াছিল, কাদম্বিনীর রূপ দেখিয়া আমি মোহিত হইয়াছিলাম। অন্য কোন সূত্রে কাদম্বিনীর সত্যপরিচয় আমি জানিতে পারি। মনে বড় লজ্জা হয় ও দুঃখও হয়, ব্রজবাবু যাহাতে কাদম্বিনীকে ত্যাগ করেন, চুপি চুপি কাদম্বিনীকে ঘরে লইয়া গিয়া যাহাতে আমি তাহাকে জাতিতে তুলিতে পারি, সেই চেষ্টা পাইয়াছিলাম, কিন্তু চেষ্টা সফল হয় নাই। একজনের প্রতি ব্রজরত্নের বদ্ধ অনুরাগ ছিল না, কাদম্বিনী ছাড়া সৌদামিনী, নিতম্বিনী, নিস্তারিণী, ভবতারিণী, বিন্দুবাসিনী, মুক্তকেশী ও পায়রাপুতী প্রভৃতি তাঁহার আরও অষ্টাদশ নায়িকা ছিল, ঈর্ষা জন্মাইবার অভিপ্রায়ে সেই সকল কথা আমি কাদম্বিনীর কাণে তুলিয়াছিলাম। কাদম্বিনীর অন্ধ অনুরাগ, আমার কথায় তাহার বিশ্বাস হয় নাই, ব্রজরত্নকে ছাড়ে নাই। এক রাত্রে আমি—"

রামতনুর অন্তরের ভাব ভবরত্ন বুঝিলেন, আরও অধিক বিরক্ত হইয়া একটু উগ্রস্বরে বলিলেন, "কেন আপনি বার বার ঐ সব কথা তুলিতেছেন? আমি আপনাকে বিনয় করিয়া বলিতেছি, ঐ সকল কথা তোলাপাড়া করিতে আপনি যদি ভালবাসেন, আমাকে ক্ষমা করিবেন, আপনি আর এ বাড়ীতে আসিবেন না।" সক্রোধে এই সকল কথা বলিয়া আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তিনি ত্বরিতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন, একটু পরে বিমর্ষবদনে রামতনুও বাহির হইলেন। প্রকাশ থাকুক, রামতনুও একজন সমাজ-সংস্কারক।

বাবু ভবরত্ন চৌধুরী অতঃপর জমীদারী-কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার মাতৃভক্তি প্রবলা হইয়া উঠিল, মাতৃসেবায় তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল; জ্যেষ্ঠতাতপত্নীর প্রতিও তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি এবং মাতা ও জ্যেষ্ঠতাতপত্নীর অভিমতানুসারে তিনি সমস্ত সংসারিক কার্য্য অতি সুচারুরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইলেন। সেরেস্তার আমলারা এবং বাটীর দাসী-চাকরেরা তাঁহার সদ্ব্যবহারে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া আপন আপন কর্ত্তব্যকার্য্য মনোযোগ পূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

নায়েবী কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়া বাবু ভবরত্ন বিষয়কার্য্য-সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র বুঝিয়া লইয়াছিলেন; ভার প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে আমলাদের মুখে শুনা হইয়াছিল, বিষয়ের বার্ষিক আয় ৮০ হাজার টাকা। নিজে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব করিয়া বুঝিতে পারিলেন, বাস্তবিক বার্ষিক আয় ২০০০০০ লক্ষ টাকার

অধিক, নিয়মিত খরচ-পত্রের সুব্যবস্থা করিয়া বিবিধ সদুপায়ে সেই আয় তিনি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জ্যেষ্ঠতাতের আমলে বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্ম কিছুই হইত না, ভৈরবচন্দ্র নিজে কর্ত্তা হইয়া দোল-দুর্গোৎসবাদি ধর্ম্মকর্ম্মে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া দশের নিকটে যশের ভাজন হইলেন। দুই বৎসর পরে চাঁপাতলার একজন সম্ভ্রান্ত ধনবানের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। বঙ্গাব্দ ১২৭০।

গঙ্গার ঘাটে উদাসীন-সন্ন্যাসীর ন্যায় এক রাত্রে তিনি শয়ন করিয়া ছিলেন, ব্রজরত্ন চৌধুরী সেই অবস্থায় তাঁহাকে বাটীতে আনয়ন করিয়া আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছিলেন, কলিকাতা সহর কিরূপ, কলিকাতার আভ্যন্তরাল অবস্থা কিরূপ, তাহা তিনি ভাল করিয়া দর্শন করেন নাই, নগরবাসী হইয়া সংসারধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর কলিকাতার মর্ম্ম বুঝিতে তাঁহার কৌতূহল জন্মিল; বাহিরে যাহা যাহা দেখিবার, একে একে তাহা দর্শন করিয়া বিদ্যালয়াদি-পরিদর্শন করিতে তিনি অভিলাষী হইলেন। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষা অধিক হয়, বালকেরা মাতৃভাষা-শিক্ষায় অধিক মনোযোগী হয় না, ইহা দর্শনে তাঁহার মনে আক্ষেপের উদয় হইল। কেবল মাতৃভাষা-শিক্ষার অপ্রচুরতা তাঁহার আক্ষেপের কারণ নহে, কোন বিদ্যালয়েই ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয় না, হিন্দু-সন্তানেরা স্বধর্ম্মের প্রতি ভক্তিমান্ হইতে চাহে না, ভক্তি-শিক্ষার সুযোগও প্রাপ্ত হয় না, বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী লোকের ব্যবহার ও বক্তৃতাই তাহাদিগের বিশ্বাস টলাইয়া দেয়, তাহারা নিজে নিজেও সমাজ-বিরুদ্ধ ব্যবহারে আমোদিত হইতে ইচ্ছা করে, ইহাই সমধিক আক্ষেপের বিষয়। স্বদেশে যাঁহারা শিক্ষিত এবং উন্নতিশীল বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যেও যাঁহারা সমাজসংস্কারক হইয়া দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করেন, তাঁহারাও স্বধর্ম্মের গৌরব দেখাইতে উদাসীন, স্বজাতীয় আচার-ব্যবহারের নিন্দাবাদ করাই যেন তাঁহাদের প্রধান কার্য্য, বক্তৃতা-শ্রবণে কেবল তাহাই বুঝা যায়। আমাদের দেশাচার ভাল নহে, আমরা কুসংস্কারের দাস, সাহেবের দেশাচার ভাল, সামাজিক বক্তৃতায় সামাজিক বক্তারা এই সকল কথাই বেশী বলেন। কেবল মুখের কথাও নহে, ব্যবহারেও অনেকটা সেইরূপ আদর্শ দেখান। হিন্দুসমাজের সংস্কার আবশ্যক, সেই আবশ্যকতা যাঁহারা বুঝাইতে চাহেন, অবশ্যই তাঁহারা হিন্দু; কিন্তু নিজে তাঁহারা যেরূপ দেখান, তাহাতে তাঁহাদিগকে হিন্দু বলিয়া বুঝিয়া

লইতে অনেক বিলম্ব হয়। তাঁহারা সাহেবী পোষাক পরিতে ভালবাসেন, সাহেবী খাদ্য-পানীয় ভালবাসেন, সাহেবী ভাষায় লেক্‌চার দিতে ভালবাসেন, সাহেবী ধরণের চুল কাটিতে ভালবাসেন, সাহেবী ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে ভালবাসেন; নাম মাত্র বঙ্গবাসী, কার্য্যের অনুকরণে তাঁহারা যেন বিদেশবাসী বলিয়া লোকের চক্ষে প্রতীয়মান হন। এমন অবস্থায় তাঁহাদিগকে হিন্দুর সমাজ-সংস্কারক বলিয়া স্বীকার করিতে কি জন্য সন্দেহ উপস্থিত হইবে না, তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবার লোক নাই। আমাদের সমাজ ভাল নয়, ইংলণ্ডের সমাজ আমাদের দেশে আনয়ন কর, বক্তারা স্পষ্ট করিয়া এইটুকু বলেন না, কিন্তু বক্তৃতাসমুদ্র মন্থন করিয়া যাঁহারা সার উত্তোলন করেন, তাঁহারা কি পান, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে যেরূপ উত্তর পাওয়া সম্ভব, তাহাতে মহা গোলমাল। দেবাসুরের সমুদ্রমন্থনে কমলা উঠিয়াছিলেন, চন্দ্র উঠিয়াছিলেন, অমৃত উঠিয়াছিল, শেষকালে হলাহলও উঠিয়াছিল; হিন্দু বক্তার বক্তৃতা-সাগর-মন্থনে অমৃত কিম্বা বিষ পাওয়া যায়, তাহা নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা সেই সকল বক্তৃতা শ্রবণ করেন, তাঁহারা কিরূপ উপদেশ অথবা কিরূপ উপকার প্রাপ্ত হন, তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত। শ্রোতাদলে অধিকাংশ বালক থাকে, বালকেরা বড় হইলে তাহাদের দ্বারা ভবিষ্যতে সমাজমঙ্গলের আশা করা যায়, কিন্তু পুনঃ পুনঃ ঐ প্রকারের উপদেশ শ্রবণ করিলে তাহাদের মন কোন্ প্রকার মঙ্গলের দিকে ধাবিত হইবে, যাঁহারা ভবিষ্যৎ ভাবনা করেন, তাঁহারা মনে মনে তাহা বুঝিয়া, ঘরে বসিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। কতিপয় বালক আপনাদের ছুটীর পর একটী তর্কসভায় উপস্থিত হইয়া পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করিয়া, মীমাংসা আনিয়াছিল, হিন্দু-সমাজ-সংস্কারের তিনটী অঙ্গ:—হিন্দুর জাতিভেদ পরিত্যাগ করা, সকল জাতির সহিত সকল জাতির একত্র ভোজন করা এবং সকল জাতির সহিত সকল জাতির পুত্র-কন্যার বিবাহ দেওয়া। এই তিনটী অঙ্গ পরিপুষ্ট হইলেই হিন্দুসমাজ নির্ম্মল হইয়া উঠিবে; যদি কিছু ময়লা থাকে, বিধবা-বিবাহ চালাইয়া দিলেই সে ময়লাটুকু বিধৌত হইয়া যাইবে।

সমাজ-সংস্কারের বক্তৃতা এই প্রকার। বাবু ভৈরবচন্দ্র কয়েকটী স্থানে এই প্রকার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া স্বদেশের অবস্থা এক প্রকার বুঝিয়া লইলেন; আর

কোথায় কি প্রকার কার্য্য আছে, তাহা দর্শন করিতে তাঁহার অভিলাষ হইল। আর এক দল সমাজবন্ধু তিনি দেখিলেন, তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া পরিচয় দেন। যাঁহাদের নিজ মুখে ঐ প্রকার পরিচয়, তাঁহারা সপ্তাহে সপ্তাহে এক একটী ব্রহ্মসভায় সমবেত হইয়া নয়ন মুদিয়া ব্রহ্মোপাসনা করেন, পরব্রহ্ম যদি প্রাচীন বেদশাস্ত্রের ভাষা বুঝিতে অক্ষম হন, এই চিন্তা করিয়া কোন কোন স্থলে ইংরাজী ভাষাতেও উপাসনা করা হয়; বক্তৃতাও অধিকাংশ ইংরাজী। ইংরাজের রাজত্বে ইংরাজী ভাষাতেই ব্রহ্মোপাসনা হওয়া উচিত, ইহাই কতকগুলি লোকের সংস্কার। ব্রহ্মজ্ঞানীরাও সমাজ-সংস্কারের বক্তৃতা করেন। যাঁহারা হিন্দু-সমাজের কোন ধার ধারেন না কিম্বা হিন্দুর সহিত কোন প্রকার সংস্রব রাখিতে চাহেন না, অধিক কথা কি, আপনাদিগকে হিন্দু-সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতেও ঘৃণা বোধ করেন, তাঁহারা হিন্দুসমাজ সংস্কার করিতে অগ্রসর, ইহা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার। যে সকল ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রহ্মজ্ঞানীর খাতায় নাম লিখাইতে আগ্রহবান্, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে গলদেশের যজ্ঞসূত্র দূরে ফেলিয়া দেন। কি কি লক্ষণে মানুষকে ব্রহ্মজ্ঞানী অথবা ব্রাহ্ম বলিয়া চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে, ব্রাহ্মেরা সেই সকল লক্ষণ অবধারণ করিয়াছেন। প্রকাশ্য লক্ষণে দাড়ী আর চস্‌মা। বিদ্যালয়ের কতকগুলি বালক সমাজের আচার-বিচার পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মনাম ধারণ করিতে যত্নবান্; বয়স অল্প, দাড়ী উঠিবার সময় হয় নাই, সুতরাং তাহাদের মনস্তাপ মনে মনেই থাকে; একটী অঙ্গ অতি সুলভ, দশম, একাদশ অথবা দ্বাদশবর্ষীয় বালকেরাও চস্‌মা চক্ষে দিয়া ব্রাহ্মসমাজে গতিবিধি করে; পথে চলিবার সময়েও চসমাশূন্য হইয়া চলে না, জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া যায়, অদূরদৃষ্টি; ইংরাজী কথায় সর্ট-সাইট। বিংশতিবর্ষ পূর্ব্বে এত সর্ট-সাইট কোথায় ছিল, অনুমান করিয়া স্থির করা যায় না। মিথ্যাকথা আপনা হইতেই প্রকাশ হইয়া পড়ে; সর্ট-সাইটেরা যখন কোন পুস্তক অথবা পত্র পাঠ করে, তখন চস্‌মাগুলি নাসাগ্র হইতে সরাইয়া কপালের উপর তুলিয়া রাখিতে হয়। তাহাতেই বুঝা যায়, চস্‌মা অবশ্য ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী অলঙ্কার। এমনও শুনা যায় যে, চস্‌মা পরিয়া এক একটী বালকের এরূপ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, চস্‌মা চক্ষে না থাকিলে রাত্রিকালে তাহাদের নিদ্রা হয় না। পরমপিতা পরমেশ্বরের এমন বিড়ম্বনা ইতিপূর্ব্বে কেহ কখনও শ্রবণ করেন নাই!

বাবু ভবরত্ন চৌধুরী আমাদের আর্য্যধর্ম্মের ঐ প্রকার বৈলক্ষণ্য দর্শন করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা অবশ্যই পরম ধর্ম্ম; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকেরা সে ধর্ম্মের মহিমা কতদূর বুঝিতে পারে, তাহা আমরা অনুধাবন করিতে অসমর্থ; তবে কেন তাহারা ব্রাহ্ম হয়? বাবু ভবরত্ন আপন মনে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া মনে মনে মীমাংসা করিলেন, কথিত ব্রাহ্মধর্ম্মে বিলক্ষণ স্বেচ্ছাচার চলে, দেবদেবীর পূজা করিতে হয় না, সন্ধ্যাহ্নিক না করিয়া উপবীতধারী ব্রাহ্মণপুত্রকে জলগ্রহণ করিতে নাই, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলে সে বাধা থাকে না, হিন্দুধর্ম্মের কোন প্রকার পবিত্রাচার মান্য করিতে হয় না, যাহার মনে যাহা আইসে, স্বচ্ছন্দে সে তাহা করিতে পারে, কেহই তাহাদের স্বাধীন কার্য্যের উপর কথা কহিতে পারেন না, ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রহণে এতগুলি সুবিধা, এই কারণেই পরিণতবয়স্ক জ্ঞানী লোক অপেক্ষা ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজে বালকের সংখ্যা অধিক।

পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি ভবরত্নের ভক্তি রহিল, কিন্তু আধুনিক ব্রাহ্মনামধারী বালক ও যুবকগণের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি কমিল; সমাজ-সংস্কারের দিকে তাঁহার মন টলিল না। আমাদের বর্ত্তমান সমাজে যতগুলি অশাস্ত্রীয় কুব্যবহার প্রবেশ করিয়াছে, সেগুলির সংশোধন আবশ্যক, ইহা তিনি স্বীকার করিলেন, কিন্তু বাছিয়া বাছিয়া সেগুলি বাহির করে কে, উপযুক্ত সংশোধনের ব্যবস্থা করে কে, তাদৃশ বিজ্ঞলোক দুটী চারিটী ভিন্ন তাঁহার নয়নগোচর হইল না। বাঙ্গালীর একঘেয়ে বক্তৃতার দ্বারা হিন্দু-সমাজের সংস্কার হইবে, এমন আশা নাই। যদবধি এদেশে বক্তৃতার স্রোত প্রবল হইয়াছে, তদবধি লোকের মুখে বাঙ্গালীর উপাধি হইয়াছে,—বক্তৃতাবাগীশ বাক্যবীর।

বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল, বাবু ভবরত্নের দুটী পুত্র এবং একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। ১২৭৫ সালে প্রথম পুত্রের জন্ম। ভবরত্ন তখন ঘোরতর সংসারী হইয়া পড়িলেন। প্রথম-জীবনে তিনি দায়ে পড়িয়া দেশ-পর্য্যটক হইয়াছিলেন, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তীর্থধামে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, দেশভ্রমণে তাঁহার আনন্দ বাড়িয়াছিল, সংসারী হইয়াও তীর্থ করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল। জননীকে, জ্যেষ্ঠতাতপত্নীকে এবং সহধর্ম্মিণীকে যাহা কিছু বলিবার, তাহা বলিয়া কহিয়া একদিন তিনি সেরেস্তায় গিয়া বসিলেন।

সেরেস্তার সদর আমলা দ্বাদশ জন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান, তিনি অতি বিচক্ষণ লোক; তাঁহার নাম সর্ব্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়। জমীদারী কাজকর্ম্মের সমস্ত ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিলেন; উপদেশ দিবার সময় ভবরঞ্জ তাঁহাকে কহিলেন, কিছু দিনের জন্য আমি তীর্থ-দর্শনে যাইব, ফিরিয়া আসিতে কিছু অধিক বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা, ইতিমধ্যে আমার সন্তানেরা বিদ্যাশিক্ষার বয়স প্রাপ্ত হইবে; কন্যাটী এখন ছোট, লেখাপড়া শিখাইবার সময় হইলে তাহাকে কোন প্রকার পাঠশালায় প্রেরণ করিবেন না, তাহার গর্ভধারিণী বিদ্যাবতী; বালিকার যেরূপ শিক্ষা প্রয়োজন, ঘরে বসিয়াই সে তাহা শিখিতে পারিবে। আমি দেখিলাম, মিশনরী দলের বিবিরা হিন্দু গৃহস্থের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কন্যাগণকে এবং বধূগণকে লেখা-পড়া শিখায়, কার্পেট বুনিতে শিখায় কাপড়ের উপর কাজ করিতে শিখায়, আমার অন্তঃপুরে যেন তাদৃশী বিবিরা প্রবেশ করিতে না পায়। তাহাদিগের শিক্ষাদানের পদ্ধতি আমি ভালবাসি না; না বাসিবার প্রধান কারণ এই যে, তাহারা আমাদের কুলকন্যাগণের ধর্ম্মবিশ্বাস টলাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া থাকে; সে বিষয়ে আপনি সাবধান থাকিবেন। আর একটী কথা। কলিকাতা ইংরাজী বিদ্যালয়-সমূহের অনেক বালক সঙ্গদোষে চরিত্রভ্রষ্ট হয়, অল্পবয়সে নেশা করিতে শিক্ষা করে; অতএব আমার ইচ্ছা এই যে, আমার ছেলে দুটীকে কোন স্কুলে না পাঠাইয়া গৃহে শিক্ষা দিবার সুবন্দোবস্ত করিবেন। সুশিক্ষিত গৃহশিক্ষক দুর্লভ নহে, যাঁহারা তদ্বিষয়ে উপযুক্ত এবং ব্যবহারে যাঁহারা সচ্চরিত্র, তাঁহাদের মধ্যে দুইজনকে আপনি নির্ব্বাচন করিয়া নিযুক্ত করিবেন; একজন সাহিত্যশিক্ষা দিবেন, একজন পণ্ডিত রাখিবে, বালক দুটীকে তিনি সংস্কৃত পড়াইবেন; কাব্য, সাহিত্য ও ব্যাকরণ-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে তাহাদের জাতীয় ধর্ম্মের সুশিক্ষা হয়, পণ্ডিতমহাশয়কে তৎপক্ষে মনোযোগী হইতে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিবেন; আর আপনি নিজেও সর্ব্বদা বালকদিগের চরিত্রচর্য্যার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। বিষয়-কার্য্যের সমস্ত ভার আপনার উপর; বার্ষিক ক্রিয়া-কর্ম্ম যেরূপ চলিতেছে, সেইরূপ চলিবে; আমার অনুপস্থিতিকালে আমন্ত্রিত নিমন্ত্রিত অভ্যাগত যাঁহারা যাঁহারা এ বাটীতে উপস্থিত হইবেন, কোন প্রকারে তাঁহাদের কাহারও যেন অমর্য্যাদা না হয়। আর আমার কিছু বলিবার নাই, আপনার বিবেচনায় যাহা ভাল বোধ হইবে, তাহাই আপনি করিবেন।”

নমস্কার করিয়া নায়েব-মহাশয় সম্মত হইলেন। সপ্তাহ পরে একটী শুভদিন দেখিয়া, অতি অল্পমাত্র পারিষদ্ ও ভৃত্য সমভিব্যাহারে বাবু ভবরঞ্জ চৌধুরী তীর্থযাত্রা করিলেন। কলিকাতার বাতাস, কলিকাতায় ব্যবহার এবং কলিকাতার আমোদ তাঁহার পক্ষে সর্ব্বক্ষণ তৃপ্তিকর বোধ হইত না, গঙ্গাপার হইয়া কলিকাতার বাহিরের গণনীয় প্রদেশগুলি একে একে তিনি দেখিতে দেখিতে চলিলেন। কলিকাতায় থাকিয়া তিনি ভাবিতেন, কলিকাতার আচার-ব্যবহার আর মফস্বলের আচার-ব্যবহার বিভিন্নপ্রকার হওয়াই সম্ভব; বাস্তবিক অনেক স্থলে তাহাই তিনি দেখিলেন; যে সকল স্থান কলিকাতার কিছু নিকটবর্ত্তী, সেই সকল স্থলে কলিকাতার হাওয়া ছুটিতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা অনুভব করিয়া মনে মনে তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন। প্রদেশ দর্শন করিতে করিতে গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা, পুষ্কর এবং আর কয়েকটী দর্শনীয় স্থানে প্রায় আট বৎসর বাস করিয়া একবার তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। যখন গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কন্যাটীর বয়ঃক্রম ছিল তিন বৎসর; সেই কন্যা একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে, অতএব সম্বন্ধ স্থির করিয়া দুই মাসের মধ্যে কন্যার শুভবিবাহ সম্পাদন করিলেন। পুত্রেরা তখন উপযুক্ত শিক্ষকের নিকটে সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষা উত্তমরূপ শিক্ষা করিতেছে, তদ্দর্শনে তাঁহার পরম সন্তোষ জন্মিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়ঃক্রম তখন সপ্তদশ বর্ষ; তত অল্পবয়সে বিবাহ দেওয়া তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং সে বিষয়ের কোন প্রসঙ্গ না করিয়াই, ছয় মাস পরে তিনি পুনরায় হরিদ্বারাদি তীর্থদর্শনে বাহির হইলেন; সেইবার তাঁহার জননী ও জ্যেষ্ঠতাতপত্নী সঙ্গে রহিলেন। বঙ্গাব্দ ১২৯২।

দেখিতে দেখিতে দিন চলিয়া যায়, কাহারও সময় অসময় প্রতীক্ষা করে না, দিনে দিনে সংসারের কোথায় কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে, চন্দ্র-সূর্য্য তাহা দেখিয়া দেখিয়া যান, কিন্তু হিসাব রাখিয়া যান না; মানুষের কাছেই হিসাব থাকে অল্পদিন ভ্রমণ করিয়াই ফিরিয়া আসিবেন, ভবরঞ্জের মনে এইরূপ কল্পনা ছিল; কিন্তু কার্য্যগতিকে ছ বৎসর বিলম্ব হইল। উত্তর-

ভারতের দর্শনীয় সর্ব্বতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে বঙ্গের চট্টগ্রাম জেলার চন্দ্রনাথপর্ব্বতস্থ চন্দ্রনাথ-মহাদেব দর্শন করিয়া ১২৯৮ সালের শ্রাবণমাসে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ভবরত্নের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শিবরত্ন। ১২৯৮ সালে শিবরত্নের বয়ঃক্রম ত্রয়োবিংশতি বৎসর। জননী ও পত্নীর অনুরোধে বাবু ভবরত্ন সেই সময় শিবরত্নের বিবাহ দিবার নিমিত্ত দুই তিনজন ঘটক নিযুক্ত করিলেন। সে সময় কলিকাতা সহরে ঘটকীর আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু ভবরত্ন তাহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন, সত্যই তাহারা ঘৃণার পাত্রী, এ বিবাহের সম্বন্ধে তাহারা মুখ পাইল না। কলিকাতা সহরের মধ্যেই পুত্রের বিবাহ দেওয়া ভবরত্নের ইচ্ছা; একান্তপক্ষে সহরের সীমার মধ্যে যদি যোগ্য-পাত্রী না পাওয়া যায়, তাহা হইলে দক্ষিণে ভবানীপুর এবং উত্তরে বরাহ-নগর পর্য্যন্ত মনোনীত করিতে পারেন, ঘটকদিগের নিকটে তিনি এইরূপ অভিপ্রায় দিলেন। ঘটকেরা স্থানে স্থানে গৃহে গৃহে পাত্রী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

ভবরত্নের জননী ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা দর্শন করেন নাই, কলিকাতার ব্যবহারেও তিনি বিদেশিনী ছিলেন, সুতরাং পাত্রী-নির্ব্বাচনে তিনি কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারিলেন না; জ্যেষ্ঠতাতপত্নী যদিও অধিক বয়সে কলিকাতায় আসিয়াছেন, কিন্তু তিনি পল্লীগ্রামের কন্যা; কলিকাতার গৃহস্থ লোকের বাটীতেও তাঁহার গতিবিধি ছিল না; সহরের কন্যারা অধুনা কিরূপ উপকরণে সজ্জিতা হইয়া কি ভাবে দাঁড়াইতেছে, তাহা তিনি জানিতেন না; সুতরাং তিনিও ঐ বিবাহের সম্বন্ধে পাত্রীনির্ব্বাচনে কোন কথাই বলিলেন না; শিবরত্নের জননী সহরের কন্যা, সহরে পুত্রের বিবাহ দিতে তিনি আপত্তি করিলেন।

জ্যেষ্ঠতাতের মৃত্যুর পর বাবু ভবরত্ন বিষয়াধিকারী হইয়া নগরবাসী ভদ্রলোকদিগের বাটীতে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন, অনেক বড় বড় লোকের সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল; নগরের বালক-বালিকারা এখন কিরূপ প্রণালীতে লালিত-পালিত ও শিক্ষিত হয়, তাহা তিনি অনেক দূর জানিয়াছিলেন; সহধর্ম্মিণীর আপত্তি-শ্রবণের অগ্রে সেই প্রণালী তিনি

স্মরণ করিতে পারেন নাই; আপত্তিগুলি শ্রবণ করিয়া তাঁহার চক্ষু ফুটিল। সহরের বালকেরা ইংরাজী স্কুলে লেখা-পড়া শিক্ষা করে, লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্যাঠামী শিক্ষা করে, ইংরাজী স্কুলের পদ্ধতিমত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া বড় বড় পণ্ডিতের সহিত ব্যাকরণের বিচার করিতে যায়, ধর্ম্মশাস্ত্রের তর্ক করে, গুরুজনের মান রাখিতে চাহে না, শিষ্টাচার ভুলিয়া যায়, এই তাহাদের রোগ। তাহাদের মধ্যে যাহারা চরিত্র ভাল রাখিতে যত্ন করে, তাহাদের সে যত্নও বিপরীত ফল প্রসব করিয়া থাকে। জ্যাঠামীটা সংক্রামক, অবিচ্ছেদে তাহা ত থাকেই, তাহার উপর কিছু নূতন নূতন ব্যবহারের যোগ হয়। বিলাতী সাহেবের মতে তামাক খাওয়া বড় দোষ; তামাক খাইলে শিরোরোগ জন্মে, মস্তিষ্ক বিকৃত হয়, বিজ্ঞান-বিশারদ সাহেব লোকেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন, সেই সকল যুক্তির উপর অটল বিশ্বাস রাখিয়া কলিকাতার কতকগুলি যুবক অতি অল্পবয়স হইতেই নস্যগ্রহণ অভ্যাস করে; দণ্ডে দণ্ডে নস্যগ্রহণ করাতে কাহারও কাহারও উচ্চারণ অনুনাসিক হইয়া যায়। অল্প দিন হইল, বাড্‌সাই নামক এক প্রকার নূতন বস্তু কলিকাতায় আমদানী হইয়াছে, পঞ্চমবর্ষীয় বালক পর্য্যন্ত সেই বস্তুর বিষাক্ত ধূম উদ্গীরণ করিয়া আমোদ অনুভব করে, চরিত্রশোধনের ভাব জানায়, নস্য এবং বাড্‌সাই অতি পবিত্র পদার্থ, উহা তামাক নহে, তামাকের সম্পর্ক-পরিশূন্য, ইহাই তাহারা মনে করে। যাহা তামাক নহে, তাহা সেবনে মস্তিষ্ক বিকৃত হয় না, ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। সাহেবেরা যাহা বলেন, তাহাতে অবিশ্বাস করিবার কারণও তাহারা বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করে না। আশ্চর্য্য! যাঁহারা দিবা-রজনী অমিশ্র তামাকের চুরুট মুখে করিয়া শয়ন, উপবেশন ও ভ্রমণ করেন, তাঁহারা তামাকনিষেধের ব্যবস্থা দেন, ইহা কৌতুকাবহ বটে। তামাকের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া যাহারা নস্যভক্ত ও বাড্‌সাইভক্ত হয়, তাহাদের অপরাপর গুণাবলীও সেই প্রকারে গণনা করিয়া লওয়া যায়।

বালকের পক্ষে এইরূপ। ওদিকে বালিকারাও কিছু কিছু লেখা-পড়া শিখিয়া এ দেশে যেন আর এক প্রকার নূতন জীব হইয়া উঠিতেছে। কোন কোন বালিকার মুখে বাড্‌সাইধূম দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্কুলে

তাহারা বর্ণপরিচয় ও পুস্তকপাঠ শিক্ষা করে, কার্পেটের ব্যাগ এবং কার্পেটের জুতা বুনিতে শিক্ষা করে, বাঙ্গালী সংসারের অবশ্যকর্ত্তব্য গৃহকার্য্য কিছুই শিক্ষা করে না, বিবাহের পর বিবিয়ানা ধরণে পোষাক পরিয়া, মোজা ও জুতা পায়ে দিয়া, চেয়ারে বসিয়া, পুস্তক পাঠ করিয়া থাকে, বেলা দশটা পর্য্যন্ত নিদ্রা যায়, দুইবেলা গরম গরম চা না খাইলে তাহাদের ভুক্তবস্তু পরিপাক হয় না, গা মাটী মাটী করে, মৌতাতী গুলীখোরের মৌতাতের সময় অতীত হইলে যেমন যেমন হয়, চা প্রস্তুত হইবার বিলম্ব হইলে সেই সকল বাঙ্গালীকন্যারও সেইরূপে ঘন ঘন হাই উঠিয়া থাকে। আরও অনেক উপসর্গ আছে। কলিকাতার গৃহস্থের অন্তঃপুরের সমাচার যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা আরও অনেক কথা বলিতে পারেন। সমাজসংস্কারের বক্তৃতায় গলাবাজী করিতে যাঁহারা পটু, তাঁহারা এ সকল উপসর্গ দেখিতে পান না, যাহা সংশোধনের চেষ্টা করিলে প্রকৃতপক্ষে সমাজের সংশোধন হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া, যাহাতে অনিষ্ট আছে, তাহাতেই হুংকার প্রদান করা কতকগুলি লোকের কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইয়াছে। স্ত্রীলোকরা সংসারের লক্ষ্মী, সেই লক্ষ্মীরা লক্ষ্মীর গুণ ভুলিয়া অন্য পথে বিচরণ করিতে ধাবিত হইতেছে, সমাজসংস্কারকরা তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করেন না, সে চেষ্টা দূরে থাকুক, স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন হইয়া পুরুষগণকে দাসের ন্যায় করিয়া রাখে, সেই বিষয়েই উৎসাহদান করা তাঁহাদের কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে! নারীগণের ঐ প্রকার স্বাধীনপ্রবৃত্তি দেশব্যাপিনী হইয়া উঠিলে দেশের যে কি অবস্থা দাঁড়াইবে, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যেন দৈববাণীর ন্যায় তাহা বলিয়া গিয়াছেন। সেই দৈববাণীর কয়েকটী পদ এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"দেশের মেয়ে ঘরের কাজে আর কি এমন রত রবে।
এরা এ-বি পড়ে বিবি সেজে বিলিতী বোল কবেই কবে॥
আর কি এরা এমন করে সাঁজ-সেঁজুতির ব্রত নেবে।
আর কি এরা আদর করে পিঁড়ি পেতে অন্ন দেবে?
আর কিছুদিন থাক্‌লে বেঁচে সবাই দেখ্‌তে পাবেই পাবে।
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বলদ গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে॥"

এই দৈববাণী ফলিবার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। ঠাঁই ঠাঁই ফলিতেছে; ইহা বলিলেও ভুল বলা হইবে না। ভবরঙ্গের স্ত্রী কলিকাতা সহরে পুত্রের বিবাহ দিতে অমত করিয়া যে যে আপত্তি করিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া ভবরঙ্গের মন টলিল; তিনি পূর্ব্বসঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। শিবপুরের একটী রূপবতী কন্যার সহিত শিবরঙ্গের বিবাহ হইল। শিবপুর যদিও কলিকাতার অতি নিকট, তথাপি কলিকাতার ঐ সকল বিকার শিবপুরে পূর্ণমাত্রায় বিকাশ পায় নাই। স্রোত যদি অব্যাহত থাকে, তাহা হইলে কেবল শিবপুর কেন, বঙ্গের সমস্ত স্থানেই আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। সে আগুন নির্ব্বাণ করিবার লোক কোথায় পাওয়া যাইবে, ভাবিয়া স্থির করা যায় না। এখন যাঁহারা সমাজ-সংস্কার সমাজ-সংস্কার বলিয়া নৃত্য করিতেছেন, তাঁহারা বরং জ্বলন্ত আগুনে আহুতি দিতেছেন। এ দেশের বিবাহের বাজারে আগুন লাগিয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বিবাহের সময় কন্যা-বিক্রয় করিলে কন্যার পিতাকে পতিত হইতে হইত, সমাজ তাহাকে ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করিত। বিক্রীতা কন্যার পিতাই কেবল পতিত হইয়া থাকিত, তাহাই নহে; শাস্ত্রবাক্য আছে, "যে দেশে শুক্র-বিক্রয় হয়, সে দেশ পর্য্যন্ত পতিত হইয়া থাকে।" এ দেশের লোক এখনও শাস্ত্রের দোহাই দিয়া চলেন, কিন্তু কার্য্যে কিরূপ হইতেছে, তাহা কেহই দেখেন না। বিবাহ-বাজারে ভদ্র ভদ্র সমাজে আজকাল নীলামডাকের ন্যায় উচ্চমূল্যে পুত্র-বিক্রয় হইতেছে। এক একটী পুত্রের মূল্য আট হাজার টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধিলাভের সংখ্যা অনুসারে বরের মূল্য অবধারিত হইয়া থাকে, অথচ সমাজ-সংস্কারের চিন্তায় সংস্কারকদিগের রাত্রে ঘুম হয় না। বিশেষরূপ চিন্তা করিয়া হুতোমদাস বলিয়া গিয়াছেন, ঘুম না হইবার প্রধান কারণ মশারির অভাব।

এই বাজারে বাবু ভবরঙ্গ চৌধুরী আপন পুত্রের বিবাহ দিলেন। তিনি জমীদার, পুত্রটীও রূপবান্ গুণবান্; যাঁহার কন্যার সহিত বিবাহ হইল, তিনিও সম্পত্তিশালী; তথাপি সদাশয় ভবরঙ্গবাবু সেই বৈবাহিকের নিকটে নিয়মমত দান-শয্যা ও দক্ষিণা ব্যতীত আর একটী পয়সাও গ্রহণ করিলেন না। তিনি আদর্শস্থলে দাঁড়াইবার যোগ্য, কিন্তু পুত্র বিক্রয় করিয়া বড়মানুষ হইবার আশা যাহাদের অত্যন্ত বলবতী, তাহারা ভবরঙ্গবাবুকে আদর্শস্থলে গ্রহণ করিতে কদাচ সম্মত

হইবে না ; বাজার খারাপ করিয়া দিল, এই বলিয়া বরং ঐ সাধু ব্যক্তির নিন্দাবাদ করিতে সহস্র রসনা ধারণ করিবে। সমাজসংস্কারকেরাও বাবু ভবরত্নকে সৎকার্য্যের দৃষ্টান্তস্থলে গ্রহণ করিতে ভুলিয়া যাইবেন। বাজেকথা লইয়া আন্দোলন করা যাঁহাদের আমোদ, চীৎকার করিয়া বাহাদুরী লওয়া যাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা, সাধুকার্য্যের নিদর্শন অন্বেষণ তাঁহাদের নিকটে উপেক্ষণীয়, লজ্জার মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাঁহারা নিজেই হত ত উহা স্বীকার করিবেন ; মুখে যদিও স্বীকার না করেন, তাঁহাদের কার্য্য স্বতই উজ্জ্বল হইয়া তাহার পরিচয় দিয়া দিবে।

সমাজ-সংস্কার ব্যতীত উচ্চ আশা যাঁহারা ধারণ করেন, তাঁহারা আর একটা উচ্চকার্য্যে বক্তৃতা ছড়াইয়া থাকেন। সে কার্য্যের নাম ভারত-উদ্ধার। ভগবান্ নারায়ণ মৎস্য-অবতারে বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন, বরাহ অবতারে পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন, বঙ্গের নবীন বক্তারা কি প্রকারে ভারত উদ্ধার করিবেন, বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তাহা বুঝিতে পারা যায় না। বাবু ভবরত্ন চৌধুরী দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতার পক্ষপাতী ছিলেন না, সকল বক্তৃতাই প্রায় শূন্য-গর্ভ, ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল, তথাপি ভারত-উদ্ধারের বক্তৃতাগুলি কেমন হয়, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত এক একটী সভায় তিনি উপস্থিত হইতেন। তাঁহার পিতৃহন্তা জ্যেষ্ঠতাত ব্রজরত্ন চৌধুরী অনেক প্রকার বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তিনি জানিতেন, ভারত-উদ্ধারের বক্তৃতা তাঁহার জিহ্বাগ্রে নৃত্য করিত কি না, ভবরত্ন তাহা শ্রবণ করেন নাই ; ব্রজরত্নের মৃত্যুর পর সেই অঙ্গের বক্তৃতা তাঁহার কর্ণে মধু বৃষ্টি করিত ; সেই মধুর আস্বাদন বাস্তবক মধুর কিম্বা তিক্ত, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না। তিনি বরং এক একদিন নির্জ্জনে একাকী বসিয়া ভাবিতেন, ভারতের হইয়াছে কি ? ভারত কি জলে ডুবিয়া গিয়াছে ? উদ্ধার করিতে হইবে। কোথা হইতে উদ্ধার ? ভারতের একদিকে পর্ব্বত, তিনদিকে জলরাশি ; ভারত যদি সেই জলরাশিতে নিমগ্ন হইয়া যাইত, তাহা হইলে বরং এক প্রকার মঙ্গল হইত, উদ্ধার করিবার নিমিত্ত কাহাকেও আর বক্তৃতা করিতে হইত না ; নিমগ্ন ভারতকে উদ্ধার করিবার জন্য বোমর বাঁধিয়া সকলকেই সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইত ; সমস্তই ফুরাইয়া যাইত। যাঁহারা বক্তৃতা করেন, তাঁহাদের ভুল। আমাদের ভারত জলসাগরে নিমজ্জিত হয় নাই, পাপসাগরে ডুবিয়াছে ; সেই সাগর হইতে ভারতকে উদ্ধার করিতে হইলে অনেক তপস্যার প্রয়োজন ; তাদৃশ

তপস্বী এখন কোথায় ? এখন যাঁহারা বক্তৃতা করেন, তাঁহারা তপস্বী নহেন ; তবে তাঁহারা কি ?

বাবু ভবরত্ন এই প্রকার অনেক ভাবিতেন, মীমাংসা আসিত না। একদিন তিনি এক স্থানের একটা বিরাট্ সভায় ভারত-উদ্ধারের বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন, পর্য্যায়ক্রমে দশজন বক্তা সুললিতকণ্ঠে বড় বড় বক্তৃতা করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, দেশ কাঁপাইয়া বর্ত্তমান রাজনীতির আন্দোলন কর, দেশের লোকে যাহাতে রাজ-সরকারে বড় বড় চাকরী পায়, তাহার জন্য বিলাতের পার্লমেণ্ট-সভায় দরখাস্ত কর, বাঙ্গালীরা দুর্ব্বল বলিয়া রাজতরফে যুদ্ধের চাকরী পায় না, সেই অপবাদ দূর করিবার নিমিত্ত রাজদরবারে দাঁড়াও, তোমরা আমাদের যুদ্ধের চাকরী দাও, এই বলিয়া করযোড়ে প্রার্থনা কর, তাহা হইলেই আচরাৎ ভারত-উদ্ধার হইবে।

বাবু ভবরত্ন এইরূপ বক্তৃতা শুনিলেন ; শুনিয়া তাঁহার মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইল, বলিতে পারা যায় না, কিন্তু সেইরূপ ভারত-উদ্ধারে কিরূপ মঙ্গললাভ হইবে, তাহা চিন্তা করা উচিত। দীনবন্ধু মিত্রের একখানি নাটকের একজন নট একটী বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছিল, ভাই সকল, তোমরা মাতৃভাষায় চাষ দাও ; প্রচুর ফল ফলিবে, রাস্তাঘাটে ময়লা থাকিবে না, গাভীগণ অগণন দুগ্ধ দান করিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ দেশের লোকে রাজ-সরকারে বড় বড় চাকরী পাইলে, ভারতের সেনাদলে ভর্ত্তি হইলে, মানুষ হইয়া মানুষ মারিতে শিখিলে ভারত-উদ্ধার হইবে। সে উদ্ধারেও পূর্ব্বোক্ত নাটকের নটোক্ত উপকারলাভ হইতে পারিবে, অনুমানে এইরূপ আশা করা যায়।

যাহা যখন হইবার, বিধাতার বিধানে তাহাই তখন হয় ; যাহা হইবার নহে, তাহা কখনও হয় না। এ দেশের বক্তারা ভারতের অধঃপতনের প্রকৃত হেতু নির্ণয় করিতে না পারিয়া কেবল চাকরী অন্বেষণ করিতেছেন, ইহা তাঁহাদের গৌরবের কথা বটে। দেশে যেরূপ পাপের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, কলিকালের মাহাত্ম্য বলিয়া লোকে যেরূপ আমোদ করিয়া সেই পাপের স্রোতে গা-ভাসান দিতেছে, কিছু দিন সেইরূপ চলিলে ভারত-উদ্ধারের আর বিলম্ব থাকিবে না। ইংরাজ-পুরুষেরা ভারতের মঙ্গলার্থ ভারত অধিকার করিয়াছেন, ভারতের মঙ্গলার্থ ভারত শাসন করিতেছেন, তাঁহাদের নিজের উক্তি এই যে, "ভারতের মঙ্গলার্থই জগদীশ্বর

তাঁহাদিগকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছেন।" এই কথাই ঠিক। সদাশয় ইংরাজেরা কৃপা করিলেই ভারত-উদ্ধার হইবে, ইহাই জগদীশ্বরের ইচ্ছা।

কলিকাতার ভাব-ভক্তি দর্শন করিয়া বাবু ভবরত্ন চৌধুরী মনে মনে স্থির করিলেন, কলিকাতা তাঁহার বাসের উপযুক্ত স্থান নহে। যেখানে রাজধানী, সেইখানেই পাপ। সপরিবারে পাপপঙ্কে নিমগ্ন হওয়া অপেক্ষা কলিকাতা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কোথায় যাওয়া হয়, এই চিন্তা দ্বিতীয়। ভবানন্দপুর তাঁহার জন্মস্থান, ভবানন্দপুর এখন অরণ্যময়; ভবানন্দপুর বাসযোগ্য করিয়া সেই স্থানেই বসতি করা তাঁহার অভিপ্রেত হইল। জঙ্গল কাটাইয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পরিবারবর্গকে লইয়া বাবু ভবরত্ন সেই স্থানেই গিয়া বাস করিলেন। তাঁহার দেখাদেখি আরও অনেক লোক তথায় বসতি করিল। ভবানন্দপুরের ভবরত্ন ভবানন্দপুর উজ্জ্বল করিলেন। কলিকাতার বাড়ী কলিকাতাতেই রহিল।

পল্লীগ্রাম এখনও একটু একটু ভাল আছে, তথাপি হাওয়া ফিরিতেছে। বাবু ভবরত্ন পল্লীগ্রামে বাস করিলেন; তাঁহার বাসগ্রামের নিকটে নিকটে যে কয়েকটী গণ্ডগ্রাম, তিনি সেই সেই গ্রামে গ্রামবাসীগণের সহিত আলাপ করিবার অভিপ্রায়ে দিনকত গতিবিধি করিয়া জানিতে পারিলেন, পূর্ব্বের সুখের অবস্থা দিন দিন বদল হইতেছে। বদল হইবার কারণ এই যে, গ্রামের লোক গ্রামে থাকে না; তাহাদের সকলকেই প্রায় প্রতিদিন কলিকাতায় আসিতে হয়; কেহ কেহ কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকে, সপ্তাহ অন্তর বাড়ী যায়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেক পল্লীগ্রামে সুখের অবস্থা ছিল, অনেকেই চাষবাস করিত অথবা জমীদার-সরকারে চাকরী করিয়া স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত; জিনিসপত্র সস্তা ছিল; যাঁহাদের কিঞ্চিৎ বেশী আয় হইত, সংসারনির্ব্বাহ করিয়া তাঁহারা দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়াকর্ম্মও করিতে পারিতেন। এখন আর সে অবস্থা নাই। এখন প্রায়-সকল গ্রামের গৃহস্থ-সন্তানেরা কিছু কিছু ইংরাজী শিখিয়া জীবিকা অর্জ্জনের নিমিত্ত কলিকাতায় কেরাণীগিরী করিতে আইসে, কলিকাতার চালচলন দেখিয়া অনেকেই শাপ শাপ বাবু হইয়া পড়ে, অল্পমূল্যের পরিচ্ছদ, অল্পমূল্যের পাদুকা আর তাহাদের ভাল লাগে না; পল্লীগ্রামের আচারাদিতেও তাহারা অবজ্ঞা করিতে শিখে, তাহাদের মেজাজ গরম হইয়া উঠে। কলিকাতার ফাসন্ অনেকেই

আপনাদের গ্রামে লইয়া যাইতে যায়। এক একখানি গ্রামে ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে, সমাজ-সংস্কারিণী সভা হইয়াছে, বক্তৃতার তুফান উঠিতেছে, সকল রকমেই সহরের অনুকরণে অনেকে ব্যস্ত। সভ্যতা শিক্ষা করিয়া কতকগুলি মফস্বলের কেরাণী নেশা করিতে শিখিয়াছে। সেই সভ্যতা এতদূর উচ্চে উঠিয়াছে যে, শনিবারে শনিবারে বাড়ী যাইবার সময় কতকগুলি কেরাণী কার্পেটের অথবা ক্যাম্বিসের ব্যাগে করিয়া দুই এক বোতল বীর-সরাপ্ কিম্বা পোর্ট সরাপ্ লুকাইয়া লইয়া যায়; গৃহের বধূগণকে তাহা পান করাইতে শিখায়; বধূরাও নূতন নূতন নভেল পাঠ করিয়া বাবুদের ইচ্ছামত বিবি সাজিয়া সুখাসনে বসিয়া থাকে, গৃহকর্ম্ম ভুলিয়া যায়। সহরের অনেক রোগ মফস্বলে প্রবেশ করিতেছে। মফস্বলের প্রাচীন রোগ হিংসা, দলাদলি, মকর্দ্দমা কলহ; সেই রোগগুলির চিকিৎসার জন্য চেষ্টা নাই, বরং তাহার উপর নূতন নূতন উপসর্গ যোগ করিয়া সভ্যতার মানবৃদ্ধি করা হইতেছে।"

বাবু ভবরত্ন চৌধুরী এই সকল পরিবর্ত্তন দর্শন করিলেন। অল্পবয়সে তাঁহাকে দেশত্যাগ করিয়া প্রবাসে যাইতে হইয়াছিল, দেশের এ সকল অবস্থা পূর্ব্বে তিনি কিছুই জানিতেন না, স্বদেশে আসিয়া অবধি যাহা যাহা তিনি দেখিতেছেন, শুনিতেছেন, ভুগিতেছেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণে আঘাত লাগিতেছে। দুই বৎসর তিনি পল্লীগ্রামে বাস করিলেন, বঙ্গের ১৩০০ সাল পূর্ণ হইল। এখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৫ বৎসর। সাহেবের চাকরী করিলে এই বয়সে তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত হইতে হইত, সাহেবেরা তাঁহাকে অকর্ম্মণ্য অথবা কর্ম্মের অযোগ্য বিবেচনা করিতেন, কিন্তু তিনি স্বাধীন, তাঁহার জীবনে ও সকল উৎপাত ছিল না, পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তিনি ধর্ম্মকর্ম্মে মন দিলেন। যে সকল স্থলে পুরাণাদি পাঠ হয়, যে সকল স্থলে ধর্ম্মক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়, যে সকল স্থলে সাধুলোকের সমাগম হয়, তত্ত্ব জানিয়া জানিয়া সেই সকল স্থলেই ভবরত্নবাবু উপস্থিত হন; অবকাশকালে গৃহে বসিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করেন, এই প্রকারে তাঁহার দিন যায়। সমাজ-সংস্কার এবং ভারত-উদ্ধারের গণ্ডগোলে আর তাঁহাকে মিশিতে হয় না।

দ্বাদশ তরঙ্গ।

অবতার।

দেশের লোকে বিস্তাবুদ্ধিতে যতই অগ্রসর হয়, ততই তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে মন যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে সেরূপ শুভদিন সমাগত হইতেছে না। শতাধিক বৎসরাবধি এক বিলাতী সভ্যতা এ দেশে প্রবেশ করাতে আধ্যাত্মিক ভাবের সহিত ভিন্ন ভিন্ন বিপরীত ভাবের বিমিশ্রণে এক প্রকার খিচুড়ি প্রস্তুত হইতেছে। যাঁহারা ধর্ম্মসংস্কার করিতে চাহেন, ইংরাজী সভ্যতার দিকে চাহিয়া তাঁহারা পাছু হাটিয়া হাটিয়া অন্ধকারকূপে ঢলিয়া পড়েন। একদিকে সংসারের মায়ার আকর্ষণ, অন্যদিকে পরমাত্মভাবের সূত্র-ধারণের অভিলাষ; কোন্ দিকে অধিক নির্ভর করিতে হইবে, তাহা তাঁহারা ঘুঝিয়া উঠিতে পারেন না। সনাতন হিন্দুধর্ম্মে যে সকল উপদেশ, সেই সকল উপদেশপূর্ণ যে সকল গ্রন্থ, তাহা তাঁহারা আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু যেখানে যেখানে শাস্ত্রের কূটার্থ বাহির হয়, সেই সকল স্থলে তাঁহারা মহা সংশয়ে অভিভূত হইয়া পড়েন; ছাটিয়া কাটিয়া মনের মত বাক্যগুলি গ্রহণ করিতে এবং দুর্ব্বোধ পাঠগুলি পরিত্যাগ করিতে তাঁহারা বাধ্য হন। যাঁহারা পণ্ডিত নামে বাচ্য, তাঁহারা শাস্ত্রীয় গ্রন্থে কোন কোন অংশ বর্জ্জন করিয়া সেই সকল স্থলে নূতন নূতন পাঠ লিখিয়া দেন। পণ্ডিতগণের এইরূপ অভ্যাস হওয়াতে আমাদের বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থে বিস্তর প্রক্ষিপ্ত পাঠ সংযোজিত হইয়াছে, মূলপাঠগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই ত গেল পণ্ডিতের কথা, তদ্ব্যতীত ধর্ম্মের দোহাই দিয়া সমাজমধ্যে যাঁহারা অগ্রগণ্য হইতে অভিলাষী, যাঁহাদিগকে পণ্ডিতাভিমানী বলা যায়, তাঁহারা শাস্ত্র মান্য

করেন না, মানুষের সহজজ্ঞানে মানুষের যুক্তিসঙ্গত বলিয়া যাহা স্থির হয়, তাহাই তাঁহারা ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করেন। জগতের উপকারার্থ পুরাকালীন মহর্ষিগণ রত্নাকর সদৃশ যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, আত্মবিশ্বাসী ধার্ম্মিকাভিমানী উপাধ্যায়গণ সেই সকল গ্রন্থকে ভ্রমপূর্ণ যুক্তিশূন্য স্বার্থদূষিত বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ অত্যধিক সাহস অবলম্বন করিয়া ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রগুলির সম্পূর্ণ অলীকত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান। অতি চমৎকার বিচার। আপনাদের বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ যে প্রকারে অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা দেখিয়াই ঐরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয়, তাহাই আমরা মনে করিতে পারি। বোধ করুন, একজন পণ্ডিত শতপৃষ্ঠা-পরিমিত একখানি পুস্তকের আদর্শ প্রস্তুত করিলেন, মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে সেই পুস্তক মুদ্রিত করিতে কত ব্যয় হইবে, কত টাকার কাগজ লাগিবে, বাঁধাই-খরচা কত পড়িবে, বাজারে সে পুস্তক কত মূল্যে বিক্রীত হইতে পারিবে, বিক্রয় করিয়া কত টাকা লাভ থাকিবে, গ্রন্থকার মহাশয় সর্ব্বাগ্রে সেই গণনাই করিয়া থাকেন, লাভের আশা না থাকিলে মুদ্রাঙ্কনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করা হয়। প্রাচীন মুনি-ঋষিগণ সমুদ্রতুল্য ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া কি এখনকার ব্যবসায়ী গ্রন্থকারগণের ন্যায় লাভের হিসাব করিতেন? অকিঞ্চিৎকর অর্থলাভে কি তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল? তাঁহাদের গ্রন্থ স্বার্থদূষিত, ভ্রমপূর্ণ, অলীক, কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এমন কথা মুখে আনিতে পারেন? যোগাসনে বসিয়া পরমেশ্বরে যাঁহারা জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা রাশি রাশি মিথ্যাকথা লিখিয়া সংসারের মানবগণকে বিড়ম্বিত করিয়া গিয়াছেন, এখনকার তর্কবাগীশেরা সেই সকল ঋষিবাক্যের ভুল করিতেছেন, অলীকত্ব সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ঋষিগণকে স্বার্থপর বলিতেছেন, এ সকল কথা কর্ণে স্থান দিলেও পাপ হয়। শাস্ত্রবাক্য অগ্রাহ্য করিয়া যাঁহারা স্বেচ্ছাচারের আদর করেন, তাঁহারাই এখনকার পণ্ডিত। সেই সকল পণ্ডিতের মধ্যে কেহ কেহ আপনাদিগকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পরিচয় দিতেও ভয় করেন না।

বাবু ভবরত্ন চৌধুরী কলিকাতার বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় গতিবিধি বন্ধ করেন নাই। ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক উভয়শ্রেণীর লোক কলিকাতায় পাওয়া যায়, ধার্ম্মিকলোকের সহিত সদালাপ করা তাঁহার

নিতান্ত স্পৃহণীয় হইয়াছিল, পল্লীগ্রামে যাঁহারা ধর্ম্মানুশীলনে তৎপর, তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া তিনি যতদূর তৃপ্তিলাভ করিলেন, সহরে তদপেক্ষা সমধিক তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন কি না, সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহার কলিকাতায় গতিবিধি। ধর্ম্ম একটীমাত্র সূক্ষ্মপদার্থ, এতদ্দেশে সেই ধর্ম্মকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নানা লোকে নানা প্রকার নাম দিয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, শৈব, গাণপত্য, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি নানাধর্ম্মাক্রান্ত লোকের ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা-পদ্ধতি বহুদিবসাবধি এ দেশে প্রচলিত আছে; এখন আবার কতকগুলি লোক নূতন নূতন নাম দিয়া নূতন নূতন উপাসনার প্রবর্ত্তন করিতেছেন; তাঁহাদের মধ্যেই অবতারের আবির্ভাব।

শাস্ত্রে ভগবানের দশ অবতারের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে নয়টী অবতার হইয়া গিয়াছে, একটী এখনও বাকী। আধুনিক বৈষ্ণবেরা নদীয়ার চৈতন্যদেবকে পূর্ণাবতার বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু দশাবতারের মধ্যে চৈতন্যদেবের নাম পাওয়া যায় না; না পাওয়া গেলেও মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব অবতারের মহিমা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য, ইহা স্বীকার করিলে ধর্ম্মের মহিমাই বর্দ্ধন করা হয়। আজকাল যাঁহারা ধর্ম্মের কথা লইয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বক্তৃতা করিতে পটু, লোকে বলুক না বলুক, তাঁহারা আপনারাই আপনাদের মধ্যে অবতার হইয়া দাঁড়ান, তাঁহাদের চেলারাও অবতার বলিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাদের পূজা করে। দেশের অবস্থা এখন এইরূপ। অল্পদিনের মধ্যে বঙ্গদেশে কতকগুলি অবতার হইয়া গিয়াছে, কোথায় কতকগুলি অবতার এখনও বাঁচিয়া আছে, ঠিক ঠিক তাহা নির্ণয় করা যায় না। বাবু ভবরত্ন একদিন বৈকালে কলিকাতার সদররাস্তার ধারে একটী অবতার দেখিয়াছিলেন। সেই অবতারটী শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ত্রিভঙ্গভঙ্গীতে বংশী ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া মুদিত-নেত্রে সমাধিস্থ ছিলেন। সে সময় হয় ত অবতারের বাহ্যজ্ঞান ছিল না, কিন্তু বুদ্ধি ছিল। গাড়ী-ঘোড়ার ধাক্কা এবং পুলিসের গদাঘাতের ভয়ে সাবধান হইয়া তিনি একটী ফুটপাথের এককোণে দাঁড়াইয়া ছিলেন। অনেক কৌতুকীলোক সেই রঙ্গ দর্শন করিবার জন্য তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ভ্রমণ করিতে করিতে বাবু ভবরত্ন সেইস্থানে উপস্থিত হন, দর্শকলোকের জনতা ভেদ করিয়া তিনি সেই অবতারের সম্মুখে গিয়া দাঁড়ান। কতক্ষণে সমাধিভঙ্গ হয়, কৌতূহল

বশে প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। অর্দ্ধঘণ্টা পরে অবতারের সমাধিভঙ্গ হয়; তখন তিনি চাহিয়া দেখেন, চারিদিকে অনেক লোক। লোকেরা সকলেই নিস্তব্ধ। ভবরত্ন ইতিপূর্ব্বে একজনের মুখে শুনিয়াছিলেন, লোকটী শ্রীকৃষ্ণের অবতার, সেই কথা স্মরণ করিয়া লোকটীকে সম্বোধন পূর্ব্বক তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর! আপনি কে? লোকেরা বলিতেছিল, আপনি শ্রীকৃষ্ণের অবতার, সত্যই কি আপনি তাই?"

ত্রিভঙ্গভঙ্গী সংবরণ করিয়া অবতার তখন সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার দীর্ঘ দীর্ঘ কেশ ছিল, বৃক্ষ সাজিবার সময় সেই কেশগুলি কপালের উপর চূড়া করিয়া বাঁধা হইয়াছিল, অভাব ছিল ময়ূরপুচ্ছের; ভঙ্গী ঘুচিল, চূড়াটী রহিল। তীব্রদৃষ্টিতে ভবরত্নের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া চূড়াধারী উত্তর করিলেন, "লোকে আমাকে অবতার বলে, আমি নিজে বলি না। আমি জানি, আমি একজন ভক্ত।"

ভবরত্ন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "চৈতন্যপ্রভু যেমন হরিভক্ত ছিলেন, আপনিও কি সেইরূপ?" চূড়াধারী ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, কি উত্তর দিবেন, ঠিক করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে মনে হয় ত ধারণা ছিল, চৈতন্য অপেক্ষা তিনি বড়। কেন না, তাঁহার নিজমুখের উত্তরেই তাহার আভাষ প্রকাশ পাইল। মৌনভঙ্গ করিয়া পরক্ষণেই তিনি উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা না, আমি সে প্রকার ভক্ত নহি। নবদ্বীপের চৈতন্য এ দেশের কোন উপকার করেন নাই, বরং অপকার করিয়া গিয়াছেন। দেশের সহস্র সহস্র লোককে কৌপীনধারী করিয়া চিরদিনের মত অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখা তাঁহার কার্য্য ছিল। যাহারা চৈতন্যের উপদেশে কৌপীন পরিধান করিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তনে মাতিয়াছিল, তাহাদের বংশাবলী সেইরূপে কাজের বাহির হইয়া রহিয়াছে। নিমাই সন্ন্যাসীর উপাখ্যান যাঁহারা জানেন, দেশের মঙ্গলামঙ্গল যাঁহারা বুঝিতে পারেন, তাঁহারা সকলেই আমার এই কথা অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিবেন। আমি সে প্রকার সন্ন্যাসী নহি, আমি পলিটিক্যাল্ সন্ন্যাসী। ধর্ম্মে মতি রাখিয়া দেশের লোকে যাহাতে দেশীয় শিল্পবাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে যত্নবান্ হয় ধর্ম্মে মতি রাখিয়া আমি দেশস্থ লোকদিগকে সেইরূপ উপদেশ দিয়া বেড়াই।"

অবতারের গলদেশে যজ্ঞসূত্র ছিল না, পরিধান ছিন্ন গৈরিক বসন, পৃষ্ঠদেশে.

বহির্বাস, চরণ পাদুকাশূন্য; চেহারায় দিব্য সুপুরুষ। মনোযোগ পূর্ব্বক তাঁহার বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া গম্ভীরবদনে ভবরত্ন কহিলেন, "আপনার আকৃতি যেন বলিয়া দিতেছে, আপনি ব্রাহ্মণের সন্তান, বয়সে তরুণ যুবা, অথচ আপনার গলদেশে উপবীত নাই, এই লক্ষণে আমি বুঝিতেছি, আপনি জাতিভেদ মানেন না, জাতীয় লক্ষণ অথবা জাতীয় চিহ্ন আপনি রাখিতে চান না; অথচ আপনি জাতীয় লোকের শিল্পবাণিজ্যাদির উন্নতি চান। শিল্পবাণিজ্য এ দেশে ছিল না, ইহা আপনি বলিতে পারিবেন না। আপনি পলিটিক্যাল্ সন্ন্যাসী, অবশ্যই আপনি ইংরাজী পড়িয়াছেন, এ দেশের শিল্পবাণিজ্য এখন প্রায় সর্ব্বতোভাবে ইংরাজবণিক্‌দিগের এক্‌চেটে, তাহাদের সহিত এ দেশের লোকে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না, তাহাও বোধ হয় আপনি জানেন, শীঘ্র যাহা হইতে পারিবে না, সেই উপদেশ দিবার জন্য আপনি সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন, ইহা বড় চমৎকার কথা। সন্ন্যাসধর্ম্ম আপনার অবলম্বন নহে, অথচ আপনি সন্ন্যাসী; হিতোপদেশের বিড়াল যেমন সন্ন্যাসী হইয়াছিল, পঙ্কনিমগ্ন ব্যাঘ্র যেমন সন্ন্যাসী হইয়াছিল, আপনি হয় তো সেইরূপ সন্ন্যাসী হইবেন, আপনার ভাবভঙ্গী দেখিয়া এবং আপনার মধুর মধুর বচনাবলী শ্রবণ করিয়া লোকের মনে সেইরূপ সন্দেহের উদয় হওয়া বিচিত্র বোধ হয় না। পলিটিক্যাল্ সন্ন্যাসের ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশে আপনি নারায়ণের অবতার বলিয়া ঘোষিত হন, ইহা কদাচ মঙ্গলের নিমিত্ত হইবে না, আপনি সাবধান হইয়া কাজ করিবেন।"

সন্ন্যাসী চটিয়া উঠিলেন। যে ব্যক্তি অবতার সাজিয়া মানুষ ভুলাইবার বাসনা রাখে, সে ব্যক্তি ততদূর ক্রোধের বশবর্ত্তী, তাহা দর্শন করিয়া ভবরত্ন হাস্য করিলেন, পরক্ষণেই গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া মিষ্টবচনে কহিলেন, "আপনি শান্ত হউন, সন্ন্যাসধর্ম্মে ক্রোধ বর্জ্জন করিতে হয়, আপনি কি প্রকার সন্ন্যাসী, অগ্রে তাহা বুঝিতে না পারিয়াই কয়েকটী কথা আমি আপনাকে বলিয়াছি, আশ্রমে নির্জ্জনে চিন্তা করিয়া দেখিবেন কিম্বা সন্ন্যাসধর্ম্মের কোন প্রকার পুস্তক যদি আপনার নিকটে থাকে, সেই পুস্তকের উপদেশগুলি পাঠ করিবেন। আরও এক কথা, সন্ন্যাসী হইলেই ভগবানের অবতার হওয়া যায়, এরূপ ধারণা যদি আপনার জন্মিয়া থাকে, সে ধারণা আপনি পরিত্যাগ করিবেন।"

সন্ন্যাসী গৌরবর্ণ, ভবরত্নের বাক্যে তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইল, ঘন ঘন নিশ্বাস

পড়িতে লাগিল, উভয় হস্তে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সক্রোধগর্জ্জনে তিনি উচ্চকণ্ঠে বাগ্‌বিতণ্ডা আরম্ভ করিলেন, গতিক বুঝিয়া ভবরত্ন অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া গন্তব্য স্থানে প্রস্থানোন্মুখ হইলেন। অবতারের রঙ্গ দেখিবার কৌতুকে যাহারা সেই স্থলে জড় হইয়াছিল, অবতারের মুখের কাছে করতালি দিয়া তাহারা হো হো শব্দে হাস্য করিয়া উঠিল। তত লোকের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষা করা বিফল হইবে, ইহা স্থির জানিয়া সন্ন্যাসী তখন আপন মনে বকিতে বকিতে দ্রুতপদে উত্তরদিকের রাস্তা ধরিয়া পলায়নপরায়ণ হইলেন। হটলোকেরাও পশ্চাতে করতালি দিতে দিতে খানিক দূর পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সন্ন্যাসী একটা গলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া লুক্কায়িত হইলেন।

এইরূপ সন্ন্যাসী আজকাল অনেক জায়গায় অনেক দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে আমাদের দেশে সন্ন্যাসী ছিল, বিংশতি বৎসর পূর্ব্বেও আমরা সন্ন্যাসী দেখিয়াছি, কিন্তু এখন যেমন হইয়াছে, কলিকাতায় এমন সন্ন্যাসীর আমদানী তখন ছিল না। সময়ে সময়ে দুই একজন সন্ন্যাসী দেখা দিত, তাহারা গৃহস্থ-বাটীতে ভিক্ষার ছলে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে নানাপ্রকার ঔষধ দিত, ভোজবাজী দেখাইত, ভাগ্যফল বলিয়া দিত, তাম্র পিত্তলাদি ধাতুকে স্বর্ণ করিয়া দিবার লোভ দেখাইত, বন্ধ্যানারীর সন্তান-উৎপাদনের ব্যবস্থা করিত, শেষকালে জুয়াচুরী করিয়া পলাইত। যথার্থ সাধু সন্ন্যাসী সর্ব্বদা সাধারণের চক্ষে পড়ে না, তাদৃশ সন্ন্যাসী কলিকাতায় আসিতেন কি না, কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না। বৎসর বৎসর পৌষমাসের শেষে গঙ্গাসাগরে যাইবার নাম করিয়া ঝাঁক ঝাঁক সন্ন্যাসী এ অঞ্চলে উপস্থিত হইত, তাহারা জটাধারী কৌপীনধারী ছাইমাখা সন্ন্যাসী; তাহারা কেহই ঠাকুরের অবতার সাজিয়া কোন প্রকার উৎপাত করিত না। পুলিশের লোকেরা কিন্তু তাহাদের উপর সর্ব্বক্ষণ নজর রাখিত। সন্ন্যাসীর দলে চোর থাকে, ইহা অনেকেই বিশ্বাস করিতেন, বস্তুতঃ এখনকার সন্ন্যাসী অপেক্ষা তখনকার সন্ন্যাসীরা কতক পরিমাণে ভালমানুষ ছিল। তখনকার সন্ন্যাসীরা সকলেই হিন্দীভাষায় কথা কহিত, তাহাতেই বুঝা যাইত, সকলেই হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী; সজ্জায় এবং বাহ্য লক্ষণে সকলেই শিবের উপাসক। আধুনিক ব্রহ্মসমাজের কতকগুলি যুবকের যেমন বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, দাড়ী না রাখিলে এবং চস্‌মা না পরিলে ব্রাহ্ম হওয়া যায় না, সন্ন্যাসীদেরও সেইরূপ বিশ্বাস ছিল যে,

ছাই না মাখিলে এবং গাঁজা না খাইলে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। এখনও সে প্রকার সন্ন্যাসী অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা অর্দ্ধ উলঙ্গ হইয়া সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করে, মুখে চক্ষে রং মাখে, মস্তকে দীর্ঘ দীর্ঘ জটা রাখে, সর্ব্বক্ষণ গাঁজা খাইয়া দুইচক্ষু রক্তবর্ণ করে। সন্ন্যাসীর দলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক আইসে, তাহারা ছোক্‌রা সন্ন্যাসী। যাত্রার দলে ছোট ছোট ছোক্‌রার যেমন খড়ি-মাটী মাখিয়া, বাঘছাল পরিয়া শিব সাজে, ছোক্‌রা-সন্ন্যাসীরাও দেখিতে অনেকাংশে তদ্রূপ। কোন কোন আমোদপ্রিয় লোক এবং নানা শ্রেণীর স্ত্রীলোক সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ন্যাসী লইয়া কত প্রকার কৌতুক করেন। ছোক্‌রা সন্ন্যাসীরাও বিলক্ষণ গাঁজা খায়। যখন খায়, তখন তাহাদের চক্ষু দেখিলে ভয় হয়।

এখন এ দেশে নূতন সভ্যতার যুগ। এখন এমন অনেকগুলি সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাঁহারা ছাই মাখেন না, জটা রাখেন না, গাঁজা খান না, হিন্দী ভাষায় কথাও কহেন না। লক্ষণের মধ্যে তাঁহারা কেবল গেরুয়া-বসন পরেন, কাছা দেন না, বাঙ্গালা কথা কহেন। তাঁহারা বাঙ্গালী সন্ন্যাসী; তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ শীতকালে গেরুয়া জামা, গেরুয়া শাল, গেরুয়া টুপী গেরুয়া মোজা এবং গেরুয়া জুতা ব্যবহার করেন। গেরুয়ার সঙ্গে সন্ন্যাসধর্ম্মের অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ। সমস্তই বুঝা যায়, কিন্তু এই শ্রেণীর সন্ন্যাসিগণের সন্ন্যাসধর্ম্মানুযায়ী কার্য্যানুষ্ঠান কিরূপ, কেবল সেইটী বুঝা যায় না।

এখনকার সন্ন্যাসিগণের মধ্যেও কেহ কেহ ভাবভঙ্গীতে জানান, তাঁহারাও এক একটী অবতার। পূর্ব্ববর্ণিত অবতারের মুখে স্বীকৃত হইয়াছে যে, তিনি একজন পলিটিক্যাল্ সন্ন্যাসী, বাস্তবিক পলিটিক্যাল সন্ন্যাসীর সংখ্যাও এখন নিতান্ত অল্প নয়। তাঁহারা পলিটিক্যাল্ ধর্ম্মের উপাসক, পলিটিক্যাল্ খাদ্য তাঁহারা আহার করেন, পলিটিক্যাল্ পানীয় তাঁহারা পান করেন, পলিটিক্যাল্ পরিচ্ছদ তাঁহারা ধারণ করেন, পলিটিক্যাল্ তত্ত্বের লেক্‌চার দেন, পলিটিক্যাল্ বিধি অনুসারে বিবাহ করিয়া গৃহাশ্রমে দীক্ষিত হন, পলিটিক্যাল্ ব্যবহারে সন্তান উৎপাদন করেন; পলিটিক্যাল্ ব্যবস্থানুসারে পরমহংস সাজেন। ইতিপূর্ব্বে একটী পরমহংস দর্শনের নিমিত্ত লোকে লালায়িত হইতেন, পরমহংসকে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বলিয়া ভক্তি করিতেন, কি কি গুণে কি কি লক্ষণে পরমহংস ভূষিত, শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ অন্বেষণ করা হইত, পরমহংস দুর্লভ, ইহাই সকলে জানিতেন,

আজকাল স্থানে স্থানে পরমহংসের ছড়াছড়ি, ইহা ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। আলস্য ঘুচাইয়া যিনি একবার মুখে উচ্চারণ করেন, "আমি পরমহংস" তিনিই পরমহংস হন। পরমহংসের আহার-বিহার বাক্যালাপ সমস্তই এখন নূতন। একটু পরে গুটা কত পরমহংসের পরিচয় দেওয়া যাইবে। এখন সাধারণ সন্ন্যাসী-প্রসঙ্গে একটী গল্প মনে পড়িল। উপকথার ন্যায় গল্প নহে, প্রকৃত ঘটনা। পাঠক-মহাশয় এইখানে সেই গল্পটী পাঠ করুন।

এই বঙ্গদেশে একখানি গ্রামে একজন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বাস, তাঁহার নাম পরেশনাথ চক্রবর্ত্তী। তাঁহার একটীমাত্র পুত্র। পুত্রের নাম পঙ্কজকুমার। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সেই পঙ্কজকুমার নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। লোকে তাহাকে পঙ্কু পঙ্কু বলিয়া ডাকিত। পুত্রবিরহে কাতর হইয়া পরেশনাথ চক্রবর্ত্তী নানাস্থানে অন্বেষণ করিলেন, কোথাও কিছু সন্ধান পাওয়া গেল না। দ্বাদশ বৎসরবয়সে নিরুদ্দেশ, তাহার পর আর দ্বাদশ বৎসর অন্বেষণ, থানায় থানায় সংবাদঘোষণা, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন, বিদেশস্থ বন্ধুবান্ধবগণের নিকটে পত্র-লিখন, সমস্তই নিষ্ফল, কোথাও পঙ্কু নাই। গ্রামের কেহ কেহ অনুমান করিল, পঙ্কু মরিয়াছে; কেহ কেহ বলিল, সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে।

দ্বাদশ বৎসর গত হইল। পঙ্কু থাকিলে তাহার বয়স হইত চব্বিশ বৎসর। পঙ্কুর মাতা-পিতা নিরাশ হইলেন গ্রামবাসী লোকেরাও পঙ্কুর পুনর্দর্শনের আশা ছাড়িয়া দিল, প্রায় সকলেই পঙ্কুর কথা ভুলিয়া গেল। এই সময় সেই গ্রামে একজন সন্ন্যাসী আসিল। নারীমহলে বুজরুকী দেখাইয়া, কামনা পূর্ণ করিবার উদ্দেশে হোম যজ্ঞ করিয়া, সেই সন্ন্যাসী অনেকের নিকটেই প্রতিষ্ঠা-লাভ করিল, শীঘ্র তাহাকে গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে হইল না, তরুতলাও আশ্রয় করিতে হইল না, লোকের মনে ভক্তির সঞ্চার হওয়াতে গৃহস্থেরা তাহাকে আশ্রয় দিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসী একপ্রকার সুখ স্বচ্ছন্দে রহিল।

একদিন পরেশনাথ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে সেই সন্ন্যাসী উপস্থিত হয়। পরেশ-নাথের স্ত্রী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বার বৎসর হইল, আমার পুত্র পঙ্কজকুমার কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কোথায় আছে, ঘরে ফিরিয়া আসিবে কি না, যদি আসে, কবে আসিবে, তুমি কি তাহা বলিয়া দিতে পার?"

প্রশ্ন করিয়াই তিনি সতৃষ্ণনয়নে অনেকক্ষণ সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিয়া

ছাই না মাখিলে এবং গাঁজা না খাইলে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। এখনও সে প্রকার সন্ন্যাসী অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা অর্দ্ধ উলঙ্গ হইয়া সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করে, মুখে চক্ষে রং মাখে, মস্তকে দীর্ঘ দীর্ঘ জটা রাখে, সর্ব্বক্ষণ গাঁজা খাইয়া দুইচক্ষু রক্তবর্ণ করে। সন্ন্যাসীর দলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক আইসে, তাহারা ছোক্‌রা সন্ন্যাসী। যাত্রার দলে ছোট ছোট ছোক্‌রার যেমন খড়ি-মাটী মাখিয়া, বাঘছাল পরিয়া শিব সাজে, ছোক্‌রা-সন্ন্যাসীরাও দেখিতে অনেকাংশে তদ্রূপ। কোন কোন আমোদপ্রিয় লোক এবং নানা শ্রেণীর স্ত্রীলোক সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ন্যাসী লইয়া কত প্রকার কৌতুক করেন। ছোক্‌রা সন্ন্যাসীরাও বিলক্ষণ গাঁজা খায়। যখন খায়, তখন তাহাদের চক্ষু দেখিলে ভয় হয়।

এখন এ দেশে নূতন সভ্যতার যুগ। এখন এমন অনেকগুলি সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাঁহারা ছাই মাখেন না, জটা রাখেন না, গাঁজা খান না, হিন্দী ভাষায় কথাও কহেন না। লক্ষণের মধ্যে তাঁহারা কেবল গেরুয়া-বসন পরেন, কাছা দেন না, বাঙ্গালা কথা কহেন। তাঁহারা বাঙ্গালী সন্ন্যাসী; তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ শীতকালে গেরুয়া জামা, গেরুয়া শাল, গেরুয়া টুপী গেরুয়া মোজা এবং গেরুয়া জুতা ব্যবহার করেন। গেরুয়ার সঙ্গে সন্ন্যাসধর্ম্মের অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ। সমস্তই বুঝা যায়, কিন্তু এই শ্রেণীর সন্ন্যাসিগণের সন্ন্যাসধর্ম্মানুযায়ী কার্য্যানুষ্ঠান কিরূপ, কেবল সেইটী বুঝা যায় না।

এখনকার সন্ন্যাসিগণের মধ্যেও কেহ কেহ ভাবভঙ্গীতে জানান, তাঁহারাও এক একটী অবতার। পূর্ব্ববর্ণিত অবতারের মুখে স্বীকৃত হইয়াছে যে, তিনি একজন পলিটিক্যাল্ সন্ন্যাসী, বাস্তবিক পলিটিক্যাল্ সন্ন্যাসীর সংখ্যাও এখন নিতান্ত অল্প নয়। তাঁহারা পলিটিক্যাল্ ধর্ম্মের উপাসক, পলিটিক্যাল্ খাদ্য তাঁহারা আহার করেন, পলিটিক্যাল্ পানীয় তাঁহারা পান করেন, পলিটিক্যাল্ পরিচ্ছদ তাঁহারা ধারণ করেন, পলিটিক্যাল্ তত্ত্বের লেক্‌চার দেন, পলিটিক্যাল্ বিধি অনুসারে বিবাহ করিয়া গৃহাশ্রমে দীক্ষিত হন, পলিটিক্যাল্ ব্যবহারে সন্তান উৎপাদন করেন; পলিটিক্যাল্ ব্যবস্থানুসারে পরমহংস সাজেন। ইতিপূর্ব্বে একটী পরমহংস দর্শনের নিমিত্ত লোকে লালায়িত হইতেন, পরমহংসকে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বলিয়া ভক্তি করিতেন, কি কি গুণে কি কি লক্ষণে পরমহংস ভূষিত, শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ অন্বেষণ করা হইত, পরমহংস দুর্লভ, ইহাই সকলে জানিতেন,

আজকাল স্থানে স্থানে পরমহংসের ছড়াছড়ি, ইহা ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। আলস্য ঘুচাইয়া যিনি একবার মুখে উচ্চারণ করেন, "আমি পরমহংস" তিনিই পরমহংস হন। পরমহংসের আহার-বিহার বাক্যালাপ সমস্তই এখন নূতন। একটু পরে গুটীকত পরমহংসের পরিচয় দেওয়া যাইবে। এখন সাধারণ সন্ন্যাসী-প্রসঙ্গে একটী গল্প মনে পড়িল। উপকথার ন্যায় গল্প নাহে, প্রকৃত ঘটনা। পাঠক-মহাশয় এইখানে সেই গল্পটী পাঠ করুন।

এই বঙ্গদেশে একখানি গ্রামে একজন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বাস, তাঁহার নাম পরেশনাথ চক্রবর্ত্তী। তাঁহার একটীমাত্র পুত্র। পুত্রের নাম পঙ্কজকুমার। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সেই পঙ্কজকুমার নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। লোকে তাহাকে পঙ্কু পঙ্কু বলিয়া ডাকিত। পুত্রবিরহে কাতর হইয়া পরেশনাথ চক্রবর্ত্তী নানাস্থানে অন্বেষণ করিলেন, কোথাও কিছু সন্ধান পাওয়া গেল না। দ্বাদশ বৎসরবয়সে নিরুদ্দেশ, তাহার পর আর দ্বাদশ বৎসর অন্বেষণ, থানায় থানায় সংবাদঘোষণা, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন, বিদেশস্থ বন্ধুবান্ধবগণের নিকটে পত্র-লিখন, সমস্তই নিষ্ফল, কোথাও পঙ্কু নাই। গ্রামের কেহ কেহ অনুমান করিল, পঙ্কু মরিয়াছে; কেহ কেহ বলিল, সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে।

দ্বাদশ বৎসর গত হইল। পঙ্কু থাকিলে তাহার বয়স হইত চব্বিশ বৎসর। পঙ্কুর মাতা-পিতা নিরাশ হইলেন গ্রামবাসী লোকেরাও পঙ্কুর পুনর্দর্শনের আশা ছাড়িয়া দিল, প্রায় সকলেই পঙ্কুর কথা ভুলিয়া গেল। এই সময় সেই গ্রামে একজন সন্ন্যাসী আসিল। নারীমহলে বুজরুকী দেখাইয়া, কামনা পূর্ণ করিবার উদ্দেশে হোম যজ্ঞ করিয়া, সেই সন্ন্যাসী অনেকের নিকটেই প্রতিষ্ঠা-লাভ করিল, শীঘ্র তাহাকে গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে হইল না, তরুতলাও আশ্রয় করিতে হইল না, লোকের মনে ভক্তির সঞ্চার হওয়াতে গৃহস্থেরা তাহাকে আশ্রয় দিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসী একপ্রকার সুখ স্বচ্ছন্দে রহিল।

একদিন পরেশনাথ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে সেই সন্ন্যাসী উপস্থিত হয়। পরেশনাথের স্ত্রী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বার বৎসর হইল, আমার পুত্র পঙ্কজকুমার কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কোথায় আছে, ঘরে ফিরিয়া আসিবে কি না, যদি আসে, কবে আসিবে, তুমি কি তাহা বলিয়া দিতে পার?"

প্রশ্ন করিয়াই তিনি সতৃষ্ণনয়নে অনেকক্ষণ সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিয়া

রহিলেন। সন্ন্যাসীও অনেকক্ষণ উজ্জ্বলনেত্রে গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিয়া ঝুলী হইতে এক খণ্ড খড়ি বাহির করিয়া, ভূমিতে কয়েকবার কয়েকটা অঙ্কপাত করিল, বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া কি বকিল, গৃহিণীকে একটা ফুলের নাম করিতে বলিল। গৃহিণী বলিলেন, "পদ্মফুল।"—সন্ন্যাসী আবার গোটাকতক অঙ্কপাত করিল, গৃহিণীর ললাট নিরীক্ষণ করিয়া অস্পষ্ট অস্পষ্ট গোটাকতক মন্ত্র পড়িল, তাহার পর বলিল, "আজ হইল না। তোমার পুত্র অনেক দূরদেশে গিয়াছে, বাঁচিয়া আছে, সে দেশে যাইতে অনেক নদী পার হইতে হয়, জলপথের গণনায় অনেকটা সময় লাগে, সাতদিন গণনা করিতে হইবে, একটা হোম করিতে হইবে, কল্য আবার আমি আসিব।"

সন্ন্যাসী দাঁড়াইল। গৃহিণী তাহাকে দক্ষিণা দিতে চাহিলেন, সে তাহা লইল না, গাঁজা খাইবার দুটী পয়সা লইয়া চলিয়া গেল। পুত্র বাঁচিয়া আছে শুনিয়া জয়াবতী আশ্বাসপ্রাপ্ত হইলেন, ঠাকুরদেবতার কাছে পূজা মানতি করিলেন, সন্ন্যাসীর প্রতি, সন্ন্যাসীর গণনার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিল। পরেশনাথের পত্নীর নাম জয়াবতী।

অঙ্গীকারমত সন্ন্যাসী পরদিন আসিল, তৎপরদিন আবার; তৎপরদিন আবার; এইরূপে সাতদিন। আজ হইল না, আজ হইল না, ক্রমাগত সাতদিনই এক কথা; অষ্টমদিবসে হোম হইবে, এইরূপ বন্দোবস্ত। সন্ন্যাসী যতক্ষণ থাকে, যতক্ষণ গণনা করে, জয়াবতী ততক্ষণ একদৃষ্টে তাহার ভস্মাবৃত মুখপানে চাহিয়া থাকেন। সপ্তমরজনীতে তাঁহার মনে কি এক প্রকার নূতন ভাবের আবির্ভাব হইল; সে রাত্রে স্বামীর নিকটে সে ভাব তিনি ব্যক্ত করিলেন না, মনে মনেই চাপিয়া রাখিলেন, তিনি যেন ভাবিলেন, হঠাৎ তাঁহার বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল।

রজনীপ্রভাতে জয়াবতী প্রাতঃস্নান করিয়া হোমের আয়োজন করিলেন। পরেশনাথের বাড়ীতে সন্ন্যাসী হোম করিবে, প্রতিবাসী লোকেরা তাহা শুনিয়া বাড়ীতে বাড়ীতে পরস্পর নানা কথা বলাবলি করিতে লাগিল; আটদশটী প্রতিবাসী কামিনী যেন দেখিতে আসিলেন। বেলা প্রায় ছয় দণ্ডের সময় সন্ন্যাসী আসিল, হোম হইল, হোমের সময় পরেশনাথ স্বয়ং সেইখানে উপস্থিত থাকিলেন, সন্ন্যাসীর ভাবভঙ্গী ভাল করিয়া দেখিলেন, মনে যেন কি উদয় হইল, পত্নীর দিকে চাহিয়া তিনি একটু অন্যমনস্ক হইলেন।

হোমকার্য্য অবসানে সকলের ললাটে তিলকদান করিয়া, সন্ন্যাসী মৃদুস্বরে জয়াবতীকে বলিল, "মা! আজও হইল না, প্রত্যাদেশ আইসে আইসে আইসে না; আগামী পৌর্ণমাসী-যামিনীতে আমি আর একটী কার্য্য করিব; সেই রজনীতেই শেষফল বলিয়া দিব, আজ আমি বিদায় হইলাম।"

সন্ন্যাসী বিদায় হইতে উদ্যত, বাধা দিয়া জয়াবতী কহিলেন, "না বাছা, আমি তোমাকে বিদায় হইতে দিব না; পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তুমি আমাদের এই আশ্রমেই থাক; তোমার প্রতি আমার দিন দিন নূতন স্নেহ জন্মিতেছে, তোমার গণনার শেষফল প্রকাশ হওয়া পর্য্যন্ত এই আশ্রমে তোমাকে অবস্থান করিতে হইবে।" এই বলিয়া সন্ন্যাসীর বদন হইতে নয়ন ফিরাইয়া, জয়াবতী আপন পতির বদন অবলোকন করিলেন, প্রতিবাসী কামিনীর চমকিতনয়নে সেই ভাব দেখিলেন। পরেশনাথ দ্বিরুক্তি না করিয়া পত্নীর বাক্যেই সায় দিলেন। সন্ন্যাসীর বিদায় হওয়া হইল না, প্রতিবাসিনীরা বিদায় হইলেন। সদরবাড়ীর একটী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গৃহে সন্ন্যাসীর বাসা হইল।

সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন, সন্ধ্যার পর সন্ন্যাসীর উপযোগের সামগ্রী যথাস্থানে রাখিয়া আসিয়া, জয়াবতী গৃহকার্য্য সমাধা করিয়া, রাত্রিকালে নির্জ্জনে পতিকে গুটীকত কথা বলিলেন। পরেশনাথ সন্দিগ্ধমনে তিনবার মস্তক-সঞ্চালন পূর্ব্বক উদাসভাবে কহিলেন, "হুঁ।"

সে রজনীতে জয়াবতীর নিদ্রা হইল না। পতি নিদ্রিত হইল তিনি উঠিয়া চুপি চুপি সন্ন্যাসীর নিকটে গমন করিলেন। সন্ন্যাসী তখন সম্মুখে ধুনী জ্বালাইয়া চর্ম্মাসনে বসিয়া গাঁজা খাইতেছিল, জয়াবতী কিঞ্চিৎ অদূরে বসিয়া, সস্নেহবচনে তাহাকে বলিলেন, "বাছা! আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি, তুমিই আমার পঙ্কজকুমার। কেন বাছা আর সন্ন্যাসীর বেশ, কেন বাছা আর আমাকে ছলনা কর, সত্যপরিচয় দিয়া আমার এই অন্ধকার ঘর আলো কর। তুমি আমাকে মা বলিয়া ডাকিয়াছ, সেই সময় আহ্লাদে আমার বুক কাঁপিয়াছে, তাহাতেই আমি বুঝিয়াছি, তুমিই আমার সেই হারানিধি পঙ্কজকুমার।"

হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া সন্ন্যাসী বলিল, "তুমি পাগল! আমি কেন তোমার পঙ্কজকুমার হইব? আমার জন্ম এ দেশে নয়, আমার নামও পঙ্কজকুমার

নয়, আমি তোমাদের কখনও চিনিও না। অনেক দিন অবধি আমি উদাসীন বহুস্থান, বহুতীর্থ পর্য্যটন ক'রয়া সম্প্রতি আমি এই বঙ্গদেশে আসিয়াছি পূর্ব্বে বঙ্গদেশে আমার নিবাস ছিল বটে, কিন্তু তোমাদের গ্রামে আমি কখন আসি নাই।"

জয়াবতী ক হলেন, "আচ্ছা, কল্য আমি তোমাকে স্বীকার করাইব। তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়া পলায়ন করিতে পারিবে না। থাকো, কল্য আমি দশ জনের সম্মুখে তোমার পরিচয় লইব। আমি যেমন চিনিয়াছি, তোমার জন্মদাতাও সেইরূপে চিনিবেন, গ্রামের লোকেও চিনিতে পারিবে।"

সন্ন্যাসীকে আর কিছু না বলিয়া, সদরদরজায় চাবী লাগাইয়া, মনে নানা প্রকার তর্ক আনিতে আনিতে জয়াবতী অন্দরমহলে প্রবেশ করিলেন। রাত্রি তখন অতি অল্পমাত্রই অবশিষ্ট ছিল, অল্পক্ষণ পরেই উষা আসিল, বৃক্ষে বৃক্ষে পক্ষিগণ রব ক'রয়া উঠিল, প্রভাত হইল। পরেশনাথ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলে পর জয়াবতী তাঁহাকে রজনীর দৌত্যকার্য্যের ফলাফল শুনাইলেন, পরেশনাথ কহিলেন, "হুঁ।"

সূর্য্যোদয় হইল। সদরদরজায় চাবী বন্ধ, অপর কেহই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না। বাটীর পরিবারের মধ্যে কর্ত্তাগৃহিণী ব্যতীত কর্ত্তার এক বিধবা ভগিনী, একটী ভাগিনেয়ী, একটী পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্র আর একজন দাসী। রাত্রের ঘটনা তাহারা কেহই কিছু জানিল না। জয়াবতী প্রফুল্লমনে গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন, তাঁহার অজ্ঞাতসারে সন্ন্যাসীর নিকটে গমন করিয়া পরেশনাথ তাহাকে কহিলেন, "বৎস! তোমার হোম-যজ্ঞ সফল হইয়াছে। তোমার গর্ভধারিণী তোমাকে চিনিতে পারিয়াছেন। আমিও এখন চিনিতেছি, তুমিই অনুদ্দিষ্ট কুমার পঙ্কজকুমার। আজ আমার পরমাহ্লাদের দিন।"

সন্ন্যাসী রাত্রিকালে জয়াবতীর কথায় যেরূপ উত্তর দিয়াছিল, পরেশনাথের বাক্যেও সেইরূপ উত্তরদান করিল। পরে পরেশনাথ বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না, কিন্তু কিছু চিন্তাযুক্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, যাহারা সন্ন্যাসী হয়, তাহারা শীঘ্র পরিচয় দিতে চাহে না; এই নবীন সন্ন্যাসীও সেইরূপে আত্মগোপন ক'রবার চেষ্টা পাইতেছে। পাঁচ জনের সম্মুখে পরীক্ষা করিলে অধিকক্ষণ আর চাতুরী খাটাইতে পারিবে না।

চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই কার্য্য। সন্ন্যাসীর নিকট হইতে উঠিয়া, পরেশনাথ সদরদরজার নিকটে আসিলেন, দেখিলেন, দরজায় চাবী বন্ধ। হাস্যের উদয় হইল। তিনি বুঝিলেন, গৃহিণী ঐটী বেশ বুদ্ধির কার্য্য করিয়াছেন। ধরা প'ড়বার ভয়ে সন্ন্যাসী পাছে পলায়ন করে, তাহাই ভাবিয়া তিনি সাবধান হইয়াছেন। ভালই হইয়াছে।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, গৃহিণীর নিকট হইতে চাবী চাহিয়া লইয়া, পরেশনাথ দ্বার উন্মুক্ত করিলেন, নিকটে নিকটে যাঁহাদের বাস, সেই সকল প্রতিবাসীকে ডাকিলেন, পাঁচ জন পুরুষ আর আটজন স্ত্রীলোক তাঁহার সঙ্গে তাঁহাদের বাটীতে আসিলেন। জয়াবতী সংবাদ পাইলেন, তিনিও উল্লাসে উল্লাসে সন্ন্যাসীর গৃহমধ্যে দর্শন দিলেন, বাটীর পরিবারবর্গও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিল; কি বুঝি তামাসা হইতেছে, এইরূপ অনুমান করিয়া বাড়ীর দাসীও তাঁহাদের অনুবর্ত্তিনী হইল।

বাতাস কথা কয়। দুই এক জনের মুখে মুখে প্রচার হইল, বাতাস সেই বার্ত্তা লইয়া গ্রামের অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রচার করিয়া দিল, দেখিতে দেখিতে পরেশনাথের সদরবাড়ীতে লোকারণ্য।

অনেকগুলি পুরুষ, অনেকগুলি স্ত্রীলোক। কি প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবে, সমাগত লোকেরা অগ্রে তাহা কিছুই অনুমান করিতে পারিলেন না। পরেশনাথ যখন আসল প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন, সন্ন্যাসী যখন বারংবার অস্বীকার করিতে লাগিল, সকলে তখন আশ্চর্য্যজ্ঞান করিয়া অনিমেষ-নয়নে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। একজনের স্কন্ধের উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া আর একজন, তাহার মস্তকের উপর দিয়া আর একজন, পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া আরও পাঁচজন, জনতা ঠেলাঠেলি করিয়া আরও কতজন সকৌতুকে সন্ন্যাসী দর্শনে কৌতূহলী হইল; কেহ কেহ কাণাকাণি করিল, এই বটে সেই; কেহ কেহ মাথা নাড়িয়া মৃদুস্বরে আর একজনের কর্ণে কহিল, "আমার বোধ হয় ভুল; সন্ন্যাসীর কথাই ঠিক। আকারে কতকটা মিল আছে বটে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ ঠিক নয়। ইহাদের পঙ্কজকুমার বেঁটে ছিল, এই সন্ন্যাসী দীর্ঘাকার; ইহাদের পঙ্কজকুমার রোগা ছিল, এই সন্ন্যাসী দিব্য মোটা-সোটা, ইহাদের পঙ্কজকুমারের নাকটা একটু চেপ্‌টা ছিল,

এ সন্ন্যাসীর নাক যেন সরল বাঁশী।" চক্ষু ফিরাইয়া আর একটী স্ত্রীলোক বলিল, "ঠিক ঠিক ঠিক! এ সন্ন্যাসী সে নয়। ইহাদের পঙ্কজকুমারের একটা চক্ষু একটু ছোট ছিল, চাউনিও একটু টেরা, এ সন্ন্যাসীর দুটী চক্ষুই সমান টানা, এ কখনই পঙ্কজকুমার নয়।"

দশজনের মুখে দশরকম কথা। যাহারা পরেশনাথের অনুকূল পক্ষ, তাহারা সকলেই বলিতে লাগিল, "হাঁ হাঁ হাঁ," সন্ন্যাসী ক্রমাগতই বলিতে লাগিল "না না না"; সন্ন্যাসীর পক্ষ লোকেরাও প্রতিধ্বনি করিতে লাগিল, "না না না।"

পরেশনাথের পক্ষ হইল বেশী লোক, সন্ন্যাসীর পক্ষ হইল অল্প। ইংরাজী কথা আছে, Mejority must be granted," যে পক্ষে অধিক লোক, সেই পক্ষই Mejority। শেষকালে বহুলোকের মতেই সাব্যস্ত হইল, এই সন্ন্যাসীই পরেশনাথের অনুদ্দিষ্ট পুত্র পঙ্কজকুমার।

তখনও বাদানুবাদ থামিল না। চূড়ান্ত মীমাংসা কি প্রকারে হয়, তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত গ্রামের একজন প্রধান লোক মধ্যবর্ত্তী হইয়া গম্ভীর-স্বরে কহিলেন, "তোমরা এক কাজ কর। ছাইমাখা সন্ন্যাসী, ঠিক চিনতে ভুল হয়, ইহাকে স্নান করাইয়া দাও, ছাই-মাটী ধুইয়া যাউক, শরীরের বর্ণ প্রকাশ হউক, তাহা হইলেই নিঃসন্দেহ হওয়া যাইবে।"

তাহাই হইল। জয়াবতী স্বয়ং কলসী কলসী জল ঢালিয়া সন্ন্যাসীকে স্নান করাইলেন। স্বাভাবিক বর্ণ প্রকাশ পাইল, মুখখানি পরিষ্কার হইল, সকলে তাহা দেখিলেন। দ্বাদশ বৎসরের কথা,—পঙ্কজকুমারের বর্ণ কিরূপ ছিল, দ্বাদশ বৎসর-বয়ঃক্রমে মুখের আকৃতি কিরূপ ছিল, যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে ঠিক তাহা স্মরণ করিতে পারিলেন না, কিন্তু জননী বলিলেন, "ঠিক এই, অঙ্গের দাগটী—তিলটী পর্য্যন্ত ঠিক আছে।"

আর কাহারও কোন কথা থাকিল না, যাঁহারা সন্দেহ করিতেছিলেন, তাঁহারাও নিস্তব্ধ হইলেন, সন্ন্যাসীরও আর প্রতিবাদ চলিল না। যদিও দুই একবার মাথানাড়া রহিল, 'না না' শব্দ মুখে উচ্চারিত হইল, কিন্তু কেহই তাহা গ্রাহ্য করিলেন না, কেহই আর তাহার কোন কথাই শুনিলেন না। সেই স্থানেই নাপিত ডাকাইয়া সন্ন্যাসীর জটা মুড়াইয়া দেওয়া হইল, গোঁফ-দাড়ী

মুড়াইয়া দেওয়া হইল, নূতন বস্ত্র পরিধান করান হইল, অপরিচিত সন্ন্যাসীর নাম হইল পঙ্কজকুমার।

যাঁহারা দেখিতে আসিয়াছিলেন, নানা কথা বলাবলি করিতে করিতে তাঁহারা চলিয়া গেলেন, তাহার পর একটী শুভদিন দেখিয়া শাস্ত্রের বিধানানুসারে যজ্ঞ করিয়া উপবীতত্যাগী পঙ্কজকুমারের গলদেশে নূতন যজ্ঞসূত্র পরাইয়া দেওয়া হইল, পঙ্কজকুমার সংসারে প্রবেশ করিলেন। নিত্য নিত্য উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী-ভক্ষণ, উত্তম শয্যায় শয়ন, নূতন নূতন পুস্তক অধ্যয়ন ইত্যাদি বিলাসে ও আমোদে পঙ্কজকুমারের চিত্ত আর এক প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইল।

দুই বৎসর গত হইল। জয়াবতী একদিন স্বামীকে কহিলেন, "সংসারের সাধ-আহ্লাদ আমার অনেক বাকী আছে, মা দুর্গার কৃপায় হারানিধি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি, একটী ভাল ঘর দেখিয়া, একটী সুন্দরী কন্যা দেখিয়া, পঙ্কুর বিবাহ দাও।"

কর্ত্তার মত হইল। অনেক সন্ধান করিয়া গ্রামের দশক্রোশদূরবর্ত্তী একখানি গণ্ডগ্রামে একজন লাহিড়া ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত পঙ্কুর বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইল।

পঙ্কুর বিবাহ। প্রতিবাসিনী কন্যারা উপস্থিত হইয়া মঙ্গলাচরণ করিলেন, কয়েকদিন ব্যাপিয়া উৎসব হইল, অনেক স্ত্রী-পুরুষ ভোজন করিল, শুভদিনে শুভক্ষণে পঙ্কজকুমারের বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের পর আর এক বৎসর অতিক্রান্ত। রূপান্তরিত—নামান্তরিত সন্ন্যাসীর পরিণীত জীবনে এক বৎসর ভোগ। নূতন বৈশাখমাস আগত। একদিন অপরাহ্ণে পরেশনাথ চক্রবর্ত্তী সদরের বারান্দায় বসিয়া গ্রামের তিনজন ভট্টাচার্য্যের সহিত পাশা খেলিতেছেন, এমন সময় সেই স্থানে একটী যুবাপুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইল, সঙ্গে একজন প্রাচীন ব্রাহ্মণ। পরেশনাথের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া সেই ব্রাহ্মণ ঐ যুবাকে দেখাইয়া দিলেন, যুবা তৎক্ষণাৎ পরেশনাথের পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। পরেশনাথ তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিলেন। যে ব্রাহ্মণটী ঐ যুবার সঙ্গে আসিয়াছিলেন, পরেশনাথকে তিনি কহিলেন, "ভাল করিয়া দেখ দেখি, ইহাকে চিনিতে পার কি না?"

ভাল করিয়া দেখিয়া পরেশনাথ বিস্ময়াপন্ন হইলেন। খেলা বন্ধ হইয়া গেল। শশব্যস্ত দণ্ডায়মান হইয়া পরেশনাথ মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, "তাই ত, এই ত আমার সেই পঙ্কজকুমার!"

যাঁহারা খেলিতেছিলেন, দর্শন করিয়া তাঁহারাও সচকিতে বলিয়া উঠিলেন, "সত্যই ত, সত্যই ত! এই ত সেই পঙ্কজকুমার।"

"পঙ্কু আসিয়াছে, পঙ্কু আসিয়াছে!" সদরবাড়ীতে এইরূপ একটা গোলমাল উঠিল। জয়াবতী ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন। পুত্রকে চিনিতে জননীর অধিকক্ষণ বিলম্ব হয় না, নবাগত পঙ্কুকে দেখিয়া সস্নেহে তাহার হস্তধারণ পূর্ব্বক স্নেহবতী জননী অজস্র আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন, বাষ্পবেগে কণ্ঠরোধ হওয়াতে মুখে কথা ফুটিল না। যে পঙ্কু তাঁহাদের বাড়ীতে ছিল, গোলমাল শুনিয়া ভিতর হইতে সেই পঙ্কুও বাহির হইয়া আসিল; নূতন লোকের পরিচয় শুনিয়, জোরে জোরে মাথা ঘূরাইয়া সে পুনঃ পুনঃ উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "আমিই ত পঙ্কু, এ আবার কে? এ আবার কোথাকার পঙ্কু? এ লোকটা জুয়াচোর!"

কে যেন কোথা হইতে জয়াবতীর কর্ণে কি কথা বলিয়া দিল, অকস্মাৎ কি যেন তাঁহার স্মরণ হইল, তিনি তখন উভয় পঙ্কুর কর্ণের উপরিভাগের চুলগুলি সরাইয় কি পরীক্ষা করিলেন। তাঁহার বদন গম্ভীর হইল, বক্ষঃস্থল দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিল, সজল-বিস্ফারিত-নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন। যে পঙ্কুটী নূতন আসিয়াছে, তাহার বামকর্ণের ঊর্দ্ধভাগে অর্দ্ধ-ডিম্বাকার একটী রক্তবর্ণ জড়ুল-চিহ্ন। সেই চিহ্ন দর্শন করিয়াই জননী গদগদস্বরে বলিলেন, "এইটীই আমার পঙ্কজকুমার। এই চিহ্ন আমার ঠিক মনে আছে।"

যে তিনজন ভট্টাচার্য্য ইত্যগ্রে পাশা খেলিতেছিলেন, কটিদেশে নামাবলী জড়াইয়া তাঁহাদের মধ্যে একজন এক প্রকার অদ্ভুত চীৎকার করিতে করিতে লম্ফে লম্ফে বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। অল্পক্ষণমধ্যে প্রায় বিশ পঁচিশ জন লোক পরেশনাথের বারান্দায় আসিয়া জমা হইল। আসল পঙ্কু আর জাল পঙ্কু মহা কৌতুক। চিহ্ন দর্শনে জননী আপন পুত্র চিনিয়াছেন, আর কোন বিরোধ রহিল না, তথাপি জাল পঙ্কু আস্ফালন করিয়া বিরোধ বাধাইতে ছাড়িল না।

পূর্ব্বের সন্ন্যাসীকে দেখিয়া যাহারা পূর্ব্বে বলিয়াছিল, পঙ্কু খর্ব্বাকার, সন্ন্যাসী দীর্ঘাকার, তাহারা এই সময় বিরোধ মিটাইবার উত্তম অবসর পাইল; উভয় পঙ্কুকে পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া সকলকে দেখাইল, আসল পঙ্কু অপেক্ষা নকল পঙ্কু মাথায় প্রায় এক হস্ত উচ্চ। নকল পঙ্কু পরাস্ত হইয়া অধোবদনে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

দলের মধ্য হইতে একজন বলবান্ ব্রাহ্মণ অগ্রবর্ত্তী হইয়া জাল পঙ্কুর হস্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক সগর্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুই? কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছস্? কি কারণে সন্ন্যাসী হইয়াছিলি? কি কারণে গৃহস্থের গৃহে রাজভোগ সেবা করিতেছিস্? সত্যকথা বল, মিথ্যা বলিলে এখনি তোকে আমরা পুলিশে চালান করিয়া দিব। জালীয়াতীর উত্তম পুরস্কার লাভ হইবে। জুয়াচোর, বদ্মাস্, ভক্তবিটেল্, বহুরূপি! সত্য বল্, কে তুই?"

জাল পঙ্কুর চক্ষে জল আসিল না, গাত্র কম্পিত হইল না, একটুও ভয় পাইল না; মাথা তুলিয়া, সতেজ-নয়নে চাহিয়া, চোট্পাট্ জবাব করিল, "কেন? আমি ত প্রথমেই সত্যকথা বলিয়াছিলাম, ইহারা আমার কথায় বিশ্বাস করে নাই। আমি বলিয়াছিলাম, এ দেশে আমার বাস নয়, আমি তোমাদের পুত্র নই, আমার নামও পঙ্কু নয়, বহুদিন হইতে আমি উদাসীন। ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, এ সব কথা সত্য কি না? আমার কোন কথা না শুনিয়া ইহারা জোর করিয়া আমাকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, সন্ন্যাস নষ্ট করিয়া জোর করিয়া আমাকে গৃহে রাখিয়াছে। আমাকে তোমরা এখন যদি পুলিশে দিতে চাও, স্বচ্ছন্দে দাও, পুলিশে আমি সকল কথাই প্রকাশ করিব, হাটের মাঝখানে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিব। আমি কোন্ জাতি, তাহাও ইহারা জিজ্ঞাসা করে নাই, আপনাদের ইচ্ছাতেই আমার পৈতা।"

যিনি তাহার হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন, ম্রিয়মাণ হইয়া, হস্ত ছাড়িয়া দিয়া, একটু নরম হইয়া তিনি তখন বলিলেন, "চুপ্ চুপ্ চুপ্! ও সব কথা আর তুলিও না, যাও বাপু, তোমার যদি কোথাও যাইবার স্থান থাকে, সেই স্থানে চলিয়া যাও; আবার যদি সন্ন্যাসী হইতে ইচ্ছা হয়, সন্ন্যাসী হও;

যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, এ দেশে আর থাকিও না; যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে, এ সব কথা অর কাহারও নিকটে গল্প করিও না; গল্প করিলে তোমার মঙ্গল হইবে না। যাও,—চলিয়া যাও।"

লোকটীকে এই সকল কথা বলিয়া বক্তা কিয়ৎক্ষণ চিন্তাকুল-চিত্তে নীরব হইয়া রহিলেন, তাহার পর জয়াবতী দেবীকে বাটীর মধ্যে পাঠাইয়া দিয়া, পরেশনাথকে লইয়া, পাঁচজন ভদ্রলোকের সহিত একটী নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ করিলেন। কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই তিনি বলিলেন, "বিষম সমস্যা। লোকটাকে যদি চটাইয়া দেওয়া যায়, জাতি লইয়া মহা গণ্ডগোল বাধিবে। নিজেই বলিতেছে, কোন্ জাতি, তাহা ঠিক নাই। এরূপ অবস্থায় উহাকে কিছু টাকা দিয়া ভাল কথা বলিয়া বিদায় করাই সুপরামর্শ। পরেশনাথ যদি জাতি হারাইয়া থাকেন, আমরাও হারাইয়াছি। কেবল তাহাই নহে, ঐ লোকের বিবাহ দিয়া যে ভদ্রলোকের কন্যাকে ঘরে আনা হইয়াছে, সেই ভদ্রলোকটীরও জাতি নষ্ট হইয়াছে। গোলমাল করা ভাল নয়, অদ্যই ইহার একটা বিহিত করা কর্ত্তব্য।"

লোকটাকে টাকা দিয়া বিদায় করিবার পরামর্শে পরেশনাথ সম্মত হইলেন। যুক্তি স্থির হইলে পরামর্শ-কর্ত্তারা বাহিরে আসিলেন। যিনি প্রথমে পুলিশের কথা তুলিয়া তাহাকে ভয় দেখাইয়াছিলেন, তিনি মনে মনে আর একটা যুক্তি স্থির করিলেন। যখন পুলিশের কথা হয়, জাল পঙ্কু তখন মুখের কথায় কোন ভয়ের লক্ষণ দেখায় নাই সত্য, কিন্তু তাহার মুখের ভাব কিছু বিকৃত হইয়াছিল; ইহাতেই বোধ হয়, মনে ভয়, মুখে সাহস। কথার কৌশলে তাহাকে তাহার যথার্থ ভয়ের কারণ বুঝাইয়া দিতে পারিলে কাজ হইতে পারে। ইহা স্থির করিয়া লোকটীকে নিকটে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "যাও বাপু, যথা ইচ্ছা তথায় তুমি চলিয়া যাও, আমরা তোমাকে পঞ্চাশ টাকা সম্বল দিতেছি, গোলমাল না করিয়া অদ্যই তুমি চলিয়া যাও, এ অঞ্চলে আর বিলম্ব করিও না। কেন জান? এ অঞ্চলে থাকিলে তোমার বিপদ্ ঘটিবে। তুমি সন্ন্যাসী হইয়াছিলে, কি প্রকার সন্ন্যাস, তাহা তুমিই জান। এ দেশে এখন অনেক লোক অনেক কারণে সন্ন্যাসী হয়। সামান্য সামান্য কারণের কথা আমি বলিতেছি না, সন্ত

বৈরাগ্যের কথাও আমি তুলিতেছি না, ইহার ভিতর ভয়ঙ্কর কারণ আছে। খুন করা, জাল করা, ডকাতী করা, গৃহ দাহ করা, স্ত্রী বাহির করা ইত্যাদি অনেক অপরাধে পুলিশে গ্রেপ্তার হইবার ভয়ে অনেক লোক সন্ন্যাসী সাজিয়া থাকে। তুমি যে সেই রকমের কোন গুরু অপরাধে পুলিশকে ফাঁকি দিবার মৎলবে সন্ন্যাসী হও নাই, পুলিশ হয় ত এমন বিশ্বাস করিতে নারাজ হইবে। অধিকন্তু আমার স্মরণ হইতেছে, আমি একবার কিছু দিন পূর্ব্বে একখানি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেখিয়াছিলাম; একজন পলাতক খুনী আসামীর অনুসন্ধানের ইস্তাহার। বড় বড় অপরাধে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যে সকল ইস্তাহার প্রচার হয়, তাহাতে আসামীর হুলিয়া লেখা থাকে, তাহা হয় ত তুমি জান; চেহারাকে পুলিশের ভাষায় আর আদালতের ভাষায় হুলিয়া বলে, তাহাও হয় ত তুমি শুনিয়াছ। যে ইস্তাহারের কথা আমি বলিতেছি, সেই ইস্তাহারে আসামীর যেরূপ হুলিয়ার বর্ণনা আমি পাঠ করিয়াছিলাম, যখন তোমার জটা-দাড়ী ছিল, তখন মনে হয় নাই, কিন্তু তোমার এখনকার চেহারার সহিত সেই হুলিয়ার অনেকটা মিলন বুঝিতেছি। তুমি আর এ অঞ্চলে থাকিও না; চেহারা গোপন করিয়া যত শীঘ্র দূরদেশে পলায়ন করিতে পার, ততই মঙ্গল।"

কি কারণে বলা যায় না, এইবার লোকটার মনে যেন কিছু ভয়ের সঞ্চার হইল। সে বলিল, "সংসারে থাকিতে আমার বাসনা ছিল না, ইহারাই জোর করিয়া আমাকে বাধ্য করিয়াছিল। আচ্ছা, টাকা দিতে চাহিতেছ, দাও, কিন্তু আমার আর একটী কথা আছে। আমি বিবাহ করিয়াছি, আমার স্ত্রী এখানে থাকিবে, আমি চলিয়া যাইব, এমন হইতে পারে না; আমার স্ত্রীকে আমার সঙ্গে দাও।"

লোকেরা সকলেই হাসিয়া উঠিলেন; হাস্যধ্বনি নিবৃত্ত হইবার পর একজন গম্ভীরবদনে বলিলেন, 'তুমি ত দেখিতেছি খুব চমৎকার সন্ন্যাসী! একবার সন্ন্যাসী হইয়াছিলে, এখন গৃহী হইয়াছ, পুলিশের ভয়ে আবার সন্ন্যাসী হইবে, সংসারের লোভে পড়িয়া এ অবস্থাতেও মেয়েমানুষ সঙ্গে লইতে তোমার অভিলাষ! চলিয়া যাও, চলিয়া যাও, স্ত্রী পাইবে না, টাকা লইয়া চলিয়া যাও। স্ত্রী?—স্ত্রী কাহার? স্ত্রী তোমার নয়।—তোমার সহিত তাহার বিবাহ হয়

নাই। পরেশনাথ চক্রবর্ত্তীর পিতা-পিতামহের নামোচ্চারণে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পরেশনাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র পঙ্কজকুমার চক্রবর্ত্তীর সহিত শিশিরকুমারীর বিবাহ হইয়াছে; তুমি পরেশনাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র নও, তুমি পঙ্কজকুমার চক্রবর্ত্তী নও, স্ত্রী তুমি পাইবে না। যদি হাঙ্গামা বাধাইতে চাও, আইনানুসারে ফৌজদারী আদালতের সাহায্য চাহিতে হইবে, তাহা হইলেই আগা-গোড়া টান পড়িবে, গ্রামের লোকেরাও তোমাকে অল্পে ছাড়িবে না। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়া অল্পে অল্পে বিদায় পাও; ও সব কথা আর মুখেও আনিও না।"

জাল পঙ্কু আর আপত্তি করিতে পারিল না, পঞ্চাশটী টাকা লইয়া সেই দিন সন্ধ্যার সময় অপ্রকাশ্য পথ ধরিয়া গ্রামের বাহির হইয়া গেল; পূর্ব্বের সন্ন্যাসীবেশের কৌপীন বহির্ব্বাস নষ্ট করে নাই, সেগুলিও সঙ্গে লইল।

জাল পঙ্কু দূর হইয়া গেল, আসল পঙ্কু ঘরে রহিল। জাল পঙ্কুকে তাড়াইবার পূর্ব্বে আপনাদের জাতির কথা তুলিয়া যাঁহারা বলিয়াছিলেন, বিষম সমস্যা, তাঁহাদের তখন ভুল হইয়াছিল। সেটা বাস্তবিক বিষম সমস্যা ছিল না, এইবারই বিষম সমস্যা। শিশিরকুমারী কাহার হইবে?

পরেশনাথ চক্রবর্ত্তীর বংশের নাম-গোত্রাদি উল্লেখে পঙ্কজকুমারের সহিত বিবাহ হইতেছে, ইহাই নিশ্চয় জানিয়া শ্রীপুরগ্রামের রমানাথ লাহিড়ী একজন অজ্ঞাত পুরুষের হস্তে আপন কুমারী শিশিরকুমারীকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন, সেই অজ্ঞাত পুরুষ জাল সাব্যস্ত হইয়া দূরীভূত হইল, পরেশনাথের প্রকৃত পুত্র প্রকৃত পঙ্কজকুমার চক্রবর্ত্তী সেই শিশিরকুমারীর বিধিসঙ্গত স্বামী হইতে পারিবে কি না, শিশিরকুমারী দেবী ঐ পঙ্কজকুমারকে পতি বলিয়া গ্রহণ করিলে অধর্ম্মভাগিনী হইবে কি না, গ্রামের মধ্যে এই তর্ক উঠিল।

শাস্ত্রীয় সমস্যা। গ্রামে যাঁহারা দশকর্ম্মান্বিত ভট্টাচার্য্য ছিলেন, তাঁহাদের নিকটে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করা হইল। কেহ বলিলেন, হইতে পারে, কেহ বলিলেন, পারে না। তাদৃশ গুরুতর বিষয়ে কেবল মুখের কথায় কাজ হয় না, ব্যবস্থাপত্র লিখাইয়া লইতে হয়, গ্রাম্য ভট্টাচার্য্যেরা পয়সা-প্রত্যাশী হইলেও তাদৃশ ব্যবস্থাপত্রে কেহ স্বাক্ষর করিতে সাহস করিলেন না। বঙ্গের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানে যাঁহারা রীতিমত স্মৃতি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, স্মৃতিরত্ন, স্মৃতিভূষণ, স্মার্ত্তবাগীশ ও স্মার্ত্তশিরোমণি প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ উপাধি-ভূষিত, তাঁহাদের নিকটেও ব্যবস্থার কথা উত্থাপন করা হইয়াছিল, সকলে একবাক্যে ব্যবস্থা দিতে পারেন নাই। যদিও আজকাল অর্থলোভী ব্যবস্থাপকগণের মধ্যে অনেকে অশাস্ত্রীয় অর্থ পাইলে অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা রচনা করিয়া দিতে পারেন, কোন কোন বিষয়ে কেহ কেহ তাহা দিয়াও থাকেন, কিন্তু পরেশনাথ তদ্রূপ কোন ব্যবস্থা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন কি না, জানা যায় নাই। যাঁহারা বলিয়াছিলেন, হইতে পারে না, তাঁহাদের মতেই পরেশনাথকে সম্মত হইতে হইয়াছিল। আসল পঙ্কজকুমার শ্রীমতী শিশিরকুমারী দেবীকে ধর্ম্মপত্নী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই।

একজন ভণ্ড সন্ন্যাসী একটী কুলকন্যার জীবন চিরদিনের মত বিফল করিয়া দিয়াছিল। পরেশনাথ চক্রবর্ত্তী অপর স্থানে সম্বন্ধ করিয়া একটী অপরা কন্যার সহিত নিজপুত্র পঙ্কজকুমারের বিবাহ দিয়াছিলেন।

শিশিরকুমারীর কি হইল? জাল পঙ্কুর পলায়নের পর তিন চারি বৎসর শিশিরকুমারী পরেশনাথের বাড়ীতেই ছিল, পিত্রালয়েও যায় নাই, পরেশনাথের গৃহেও বধূরূপে পরিগৃহীতা হয় নাই, যৌবন-প্রাপ্ত হইয়া শিশিরকুমারী একরাত্রে কোথায় পলায়ন করিয়াছিল, কেহই তাহার সন্ধান পান নাই। অভাগিনী মনের দুঃখে আত্মঘাতিনী হইয়াছে, এই কথাই গ্রামের কতকগুলি লোকের মুখে রাষ্ট্র হইয়াছিল।

দেশে দেশে পথে পথে অধুনা যত সন্ন্যাসী বেড়ায়, তাহাদের দলে অধিকাংশই ভণ্ড সন্ন্যাসী, এ কথার উপর বিসংবাদ নাই। সত্য-সন্ন্যাসী ক-জন পাওয়া যায়, তাঁহারা কেহ লোকালয়ে প্রবেশ করেন কি না, তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। যদিও কখন কখন দুই একজন প্রকৃত সাধু কোন লোকালয়ে দর্শন দেন, লোকে তাঁহাদিগকে চিনিতেই পারে না। সন্ন্যাসধর্ম্মের কলঙ্ক, ভণ্ড সন্ন্যাসীই অধিক। তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ আপনাদিগকে পরমহংস বলিয়া পরিচয় দেয়, প্রকৃত পরমহংসের নিন্দাবাদ করে। কি কি লক্ষণে পরমহংস চিনিতে পারা যায়, আশ্রমধর্ম্মে তাহার সবিশেষ বর্ণন আছে।

বাবু ভবরত্ন চৌধুরী সন্ন্যাসধর্ম্মের আলোচনায় আনন্দ অনুভব করিতেন, সাধু-সন্ন্যাসী দর্শন করিলে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন, ভণ্ড সন্ন্যাসীর উৎপাত দর্শন

করিয়া অন্তরে তিনি অতিশয় বেদনা অনুভব করিলেন। পরেশনাথ চক্রবর্ত্তীর গল্পটী তিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রাণে আঘাত লাগিয়াছিল। যখন শ্রবণ করেন, তখন তিনি কলিকাতায় ছিলেন। কলিকাতায় আজকাল ধর্ম্মভাবের অত্যন্ত অভাব, তথাপি ধার্ম্মিক লোকের বিদ্যমানতা আছে। ইতিহাসে শ্রবণ করা যায়, ভণ্ডামার পরিচয় পাওয়া যায়, এই কারণেই মধ্যে মধ্যে তিনি কলিকাতায় আসিতেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কলিকাতায় অবস্থিতি-সময়ে কলিকাতার অনেক বড়লোকের সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল। সত্য বড়লোক কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন। বড়লোক ব্যতীত আরও ভিন্ন ভিন্ন অনেক সম্প্রদায়ের অনেক লোকের সহিত তাঁহার জানা-শুনা ও আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। এক বৎসর ফাল্গুনমাসের শেষে একবার তিনি কলিকাতায় আইসেন, পূর্ব্বে যে বাড়ীতে তিনি বাস করিতেন, সেই বাড়ীর একটী মহল তাঁহার নিজের থাকিত; যখন তিনি থাকিতেন না, তখন সে মহলে চাবী দেওয়া থাকিত, যখন আসিতেন, তখন সেই মহলেই অবস্থান করিয়া সমাগত বন্ধুবান্ধবগণের সহিত বিবিধ প্রসঙ্গে বাক্যালাপ করিতেন। এবারেও সেইরূপ হইতেছিল। একদিন সন্ধ্যার পর তিনি বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, নগরবাসী ও প্রদেশবাসী আট দশজন ভদ্রলোক নিকটে বসিয়া গল্প করিতেছেন, গল্পের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের কথা উঠিল। ধর্ম্ম-প্রসঙ্গই ভবরত্নের প্রাণের সঙ্গে মিলিত; প্রাচীন উপকথার মধ্যেও তিনি ধর্ম্ম-তত্ত্বের সার সংগ্রহ করিতেন। একটী প্রসঙ্গের সঙ্গে সন্ন্যাসীর কথা পড়িল পরমহংসের কথা উঠিল, অবতারের কথা পড়িল। যাঁহার যে প্রকার মনোভাব, যাঁহার যে প্রকার অভিপ্রায়, সঙ্ক্ষেপে সঙ্ক্ষেপে তিনি সেই প্রকার মন্তব্য দিলেন; সকল প্রকার মন্তব্য ভবরত্নের মনে ধরিল না, তিনি নিরুত্তর হইয়া আপন মনে কি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাত্রি দশটা বাজিল। বিদায় লইয়া, নমস্কার করিয়া সমাগত লোকেরা সকলেই উঠিয়া গেলেন, কেবল একটী লোক রহিলেন। বাবু ভবরত্ন অপেক্ষা সেই লোকটীর বয়স অল্প; আকার-অবয়বে বোধ হয় প্রায় দশ বৎসরের ছোট বড়। লোকটীর নাম অযোধ্যানাথ তর্কালঙ্কার। সংস্কৃত, ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি; স্বধর্ম্মের প্রতিও তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ; তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া ভবরত্ন বাবু সর্ব্বদাই

প্রীতি অনুভব করেন। ইতিপূর্ব্বে যে সকল কথা হইতেছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া ভবরত্ন কহিলেন, "লোকে বলে, সর্ব্বপ্রকারে এ দেশের উন্নতি হইতেছে, ধর্ম্মেরও উন্নতি হইতেছে। আমি দেখিতেছি, এখানকার ধর্ম্মভাব ক্রমশই বিকার-প্রাপ্ত। অনেক লোক সন্ন্যাসী সাজিয়া পথে পথে বেড়ায়, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার পরমহংস বলিয়া পরিচয় দেয়; মুখে বলে, ধর্ম্মমন্দিরের সমুচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছে; কেহ কেহ বলে, ধর্ম্মশৈলের শিখরদেশ স্পর্শ করিয়াছে। বস্তুতঃ তাহারা যে কি প্রকার ধর্ম্ম-সঞ্চয় করে, তাহাদের ধর্ম্মের অনুষ্ঠান যে কিরূপ, তাহা কিছুই বুঝা যায় না। কতকগুলি লোকের মুখে শুনা যায়, ধর্ম্মের ভাণও ভাল, সেটা যে কি কথা, তাহার অর্থ তাহারা বুঝাইয়া দিতে পারে না। যাহারা ভাণ করে, তাহারা ভণ্ড, শব্দের অর্থ-বোধ যাঁহাদের আছে, তাঁহারা সকলেই ইহা জানেন। এখন বিবেচনা কর, ভণ্ডামী যদি ধর্ম্মের একটী উত্তমাঙ্গ হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মের অধোগতির লক্ষণ কিরূপ হইবে? আচারত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী হয়, বক্তৃতা করিতে পারিলেই পরমহংস হয়, ইহা সামান্য বিড়ম্বনা নহে। তুমি ত সর্ব্বক্ষণ ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা কর, যথাশক্তি ধর্ম্ম-পন্থায় বিচরণ কর, বল দেখি, এখনকার সন্ন্যাসী ও পরমহংসেরা চায় কি?"

অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া অযোধ্যানাথ কহিলেন, "তাহারা চায় লোকের মুখে খোসনাম; তাহারা চায় ক্রিয়া-কর্ম্ম-বিবর্জ্জন, তাহারা চায় লোকের কাছে ভক্তি; তাহারা চায় লোকে তাহাদিগকে দেবতা বলিয়া পূজা করুক, তাহারা নিজে যাহা যাহা করে, তৎপ্রতি কেহ দৃষ্টি না রাখুক। ঐ দলের আর একটা অনর্থকর সংস্কার আছে, গেরুয়া পরিয়া গাঁজা খাওয়া অভ্যাস না করিলে ধর্ম্মের সেবক হওয়া যায় না; এই সংস্কারের বশীভূত হইয়া তাহাদের অনেকেই হরদম্ গাঁজা খায়, গাঁজার নেশায় চক্ষু আরক্ত করিয়া বাহ্য-চৈতন্যহারায়, তাহাতেই তাহাদের মুক্ত-পথ পরিষ্কৃত হয়। তাহারা মনে করে, সন্ন্যাসধর্ম্ম গাছের ফল, পরমহংসভাব গাছের ফল, কানন ভ্রমণ করিয়া পাড়িয়া লইলেই সর্ব্ব-সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।"

অল্প হাস্য করিয়া ভবরত্ন বলিলেন, "ঠিক কথা। যাহারা আপনাদিগকে পরমহংস বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাদের মধ্যে কয়েকজনকে আমি দেখিয়াছি, কথা

কহিয়াও প্রকৃতি বুঝিয়াছি, প্রায় সকলেই ষড়্‌রিপুর দাস; আত্মমতের বিরুদ্ধ কথা শুনিলেই তাহারা মহা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠে, কামারপুর সেবা করিতেও লজ্জা বোধ করে না; লোভের নিকটে ফাঁদ পাতিলে তাহাদিগকে অক্লেশে ধরা যায়; মোহ তাহাদের পদে পদে; মদমাৎসর্য্য মুখে মুখে।"

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া, তৎক্ষণাৎ আবার ভবরত্নের মুখের দিকে চাহিয়া তর্কালঙ্কার বলিলেন, "আপনার সম্মুখে সকল কথা প্রকাশ করিতে আমার লজ্জা আইসে, আমি একটা দৃষ্টান্ত জানি,—অত্যন্ত লজ্জাকর দৃষ্টান্ত!"

গম্ভীরবদনে ভবরত্ন কহিলেন, "ধর্ম্মের কথা পড়িয়াছে, এ প্রসঙ্গে জানা-শুনা সত্যকথনে লজ্জাকে একটু অন্তরে রাখা দোষাবহ হইবে না; আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, যাহা তুমি জান, লজ্জাত্যাগ করিয়া অকপটে তাহা প্রকাশ কর।"

মাথা হেঁট করিয়া অযোধ্যানাথ কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন, তাহার পর মুখ তুলিয়া ধীরস্বরে বলিলেন, "আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, তৎসমস্তই সত্য; ভণ্ডদল নিশ্চয়ই ষড়্‌রিপুর দাস। তাহারা প্রায় সকল প্রকার কার্য্যই করে; তবে কি না, কতকগুলি প্রকাশ্য, কতকগুলি গোপন। যে দৃষ্টান্তের কথা আমি বলিতেছি, তাহা একটা গুপ্ত-ক্রিয়ার অন্তর্গত। এই কলিকাতা-নগরীমধ্যেই তাহা ঘটিয়াছিল। অধিক দিনের কথা নহে, প্রায় ছয় সাত মাস হইল, আমার একজন জ্ঞাতির মাতৃশ্রাদ্ধের কীর্ত্তনের বায়না করিবার নিমিত্ত একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি চোরবাগানে গিয়াছিলাম। এক বাড়ীতে একটী কীর্ত্তনী ছিল, একজন দালাল সেই বাড়ী আমাকে দেখাইয়া দেয়, আমি প্রবেশ করি। কীর্ত্তনীটী নূতন; নিজে তখন বাড়ী করিতে পারে নাই, যে বাড়ীতে ছিল, সে বাড়ীতে ভিন্ন ভিন্ন গৃহে আরও পাঁচ জন বিলাসিনী থাকিত। আমি যখন উপস্থিত হইলাম, কীর্ত্তনী তখন ঘরে ছিল না, রামকৃষ্ণপুরে কীর্ত্তন করিতে গিয়াছিল, সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিবার কথা, একটী পরিচারিকার মুখে এই সংবাদ আমি পাইলাম। সুতরাং আমাকে অপেক্ষা করিতে হইল। রাত্রি আটটা বাজিল, কীর্ত্তনী আসিল না। আরও এক ঘণ্টা। পাশের অন্যান্য ঘরে তবলা-বেহালার সঙ্গে গীত উঠিতেছে, ঘন ঘন করতালি বাজিতেছে, সঙ্গীতের ধ্বনি ছাপাইয়া হাস্য-রোলের সহিত হল্লা চীৎকারধ্বনি দ্বাদশের উপর

চড়িতেছে, মধ্যে মধ্যে বিরাম পড়িতেছে। আমি উঠিয়া আসিতে পারিলে বাঁচি, ঘৃণা বিরক্তির সহিত ক্ষণে ক্ষণে এইরূপ মনে করিতেছি, গুড়ুম করিয়া কেল্লার তোপ পড়িয়া গেল; রাত্রি সাড়ে নয়টা। কীর্ত্তনী আসিল।"

হাস্য করিয়া ভবরত্ন কহিলেন, "কুৎসিত নিকেতনের কুৎসিত চীৎকারে তুমি বিরক্ত হইতেছিলে, তোমার আড়ম্বর শুনিয়া আমারও বিরক্তি আসিতেছে। ঐ সকল কুৎসিত কাণ্ডের মধ্যে পরমহংসের দৃষ্টান্ত কোথায়?"

কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া তর্কালঙ্কার কহিলেন, "পরমহংস না আসিলে পরমহংসের দৃষ্টান্ত কিরূপে আসিবে? এইবার সময় হইয়াছে। কীর্ত্তনীর সহিত আমি কথা কহিতেছি, এমন সময় সিঁড়িতে মানুষের পদশব্দ হইল। সিঁড়ির ঠিক পার্শ্বেই ঐ কীর্ত্তনীর ঘর, ঘরের সম্মুখেই দুই হাত চওড়া বারান্দা। যে ঘরে আমি বসিয়াছিলাম, সেই ঘরে একটী দীপাধারে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, বারান্দা অন্ধকার। বারান্দায় একজন লোক আসিয়া দাঁড়াইল, অর্দ্ধ-উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, 'শিবানি!'—অপরদিকের একটী গৃহ হইতে প্রশ্ন আসিল, 'কে'?—যে লোক শিবানী বলিয়া ডাকিয়াছিল, সেই লোক আহ্লাদে উচ্চস্বরে উত্তর করিল, 'পরমহংস।'

মন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিদ্রপথে হুঙ্কার করিলে মন্দিরমধ্যে যেমন গুরুগম্ভীর প্রতিধ্বনি হয়, সেই 'পরমহংস' শব্দ সেইরূপে পার্শ্বস্থ গৃহে গৃহে প্রতিধ্বনিত হইল; উত্তরদাতার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়াছিল, সুতরাং প্রতিধ্বনিও কাঁপিল।

ইতিপূর্ব্বে যে ঘরে বহুলোকের হাস্য-কোলাহলে সহসা গীত-বাদ্য চলিতেছিল, তখন আমি বুঝিলাম, সেই ঘরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম শিবানী। শিবানী যাহা, তাহা আপনি বুঝিতে পারিতেছেন, তাহার ঘর হইতে একদল লোক হল্লা করিয়া বাহির হইয়া, একজোড়া খোল বাজাইতে বাজাইতে রামায়ণ-গানের সুরে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'রাম এলো, রাম এলো, পোড়ে গেল সাড়া, দাম্ গুড়াগুড়্ বাদ্য বাজে নাচে চণ্ডালপাড়া।' বারান্দায় একটা আলোক দীপ্তি পাইল, লোকেরা সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়া আগত লোকটীকে আপনাদের ঘরের মধ্যে

লইয়া গেল, পুনর্ব্বার সেই ঘরে পূর্ব্বরূপ মজ্‌লীস বসিল, সকলের মুখেই 'পরমহংস' 'পরমহংস' রব।

কীর্ত্তনীর সঙ্গে আমার যে কথা হইতেছিল, তাহা বন্ধ রাখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'পরমহংস কে? এ জায়গায় পরমহংস আসিয়া কি করে? বারাঙ্গনাগৃহে পরমহংসের এত সমাদর কি জন্য?'

কীর্ত্তনী উত্তর করিল, 'একটা নয়, পরমহংসের পাল। আর একটু বসুন, দেখিবেন, পালে পালে পরমহংস আসিয়া জুটিবে; উত্তম সমাদর পাইবে। পরমহংস কি, আমি তাহা বুঝি না, দেখিতে পাই, পরমহংসেরা মনুষ্য, সন্ন্যাসীর মত জটা রাখে, ভস্ম মাখে, গেরুয়া পরে, গাঁজা খায়, মদ খায়, খিচুড়ি খায়, নাচে, গায়, লাফায়, আরও কত কি করে, যদি দেখিতে চান, দেখিবেন।'

আমি অবাক্ হইলাম। শিবানীর গৃহে নৃত্যগীত চলিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে পরমহংসের নামে শোভাস্তরী পড়িল, ঘন ঘন স্ফটিকপাত্রের ঠনাঠন্ ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল, গঞ্জিকার ধূমরাশিতে সম্মুখের বারান্দা আচ্ছন্ন হইয়া গেল, দুর্গন্ধে তিষ্ঠান ভার হইল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে আটজন বালক আসিল। তাহারা বারান্দার ধূমরাশি ভেদ করিয়া, তালে তালে পা ফেলিয়া চলিয়া গেল। তাহাদের চেহারা ভালরূপ দেখা গেল না, কিন্তু তাহাদের সকলেরই মাথা নেড়া, কেবল ঐ পর্য্যন্ত আমি বুঝিতে পারিলাম।

বালকেরা শিবানীর গৃহে প্রবেশ করিল, নূতন প্রকার আনন্দধ্বনি সমুত্থিত হইল, একটু পরেই নূপুর ও ঘুঙ্গুরধ্বনি সহকারে নৃত্য আরম্ভ হইল। আমি অনুমান করিয়া লইলাম, ঐ বালকেরাই নৃত্য করিতেছে। অনুমান আর অধিকক্ষণ রাখিতে হইল না, বালকের মিশ্রকণ্ঠে সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি বাতাসের সঙ্গে উড়িল; করতাল ও শোভাস্তরী বাদ্যের একসঙ্গে বিমিশ্রিত।

কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিব, এইরূপ মনে করিতেছিলাম, জিজ্ঞাসা করিতে হইল না, অযাচিত হইয়াই কীর্ত্তনী কহিল, 'উহারা পরমহংসের চেলা—না-না, উহারা পরমহংসের বাচ্চা; শিশুগণের পাঠ্যপুস্তকে হংসশাবক;—উহাদের মাথাগুলি ফেরীওয়ালার মাথার হংসডিম্ব। যে মজ্‌লীসে উহারা আসিয়াছে, সে মজ্‌লীসের লোকেরা ঐগুলিকে ক্ষুদ্র হংস বলিয়া আদর করে, ওগুলিকেও

গাঁজা দেয়, মদ দেয়, খিচুড়ি দেয়, রাত্রিকালে শয়নের জন্য উত্তম উত্তম শয্যাও দেয়। বড়হংস ছোট হংস সকলেই সমস্ত রজনী এইখানে থাকে, ভোরে উঠিয়া চলিয়া যায়। হংসেরা সাঁতার দিতে ভালবাসে। ঐ হংসেরা যতক্ষণ শয়ন না করে, ততক্ষণ প্রেম-সরোবরে সাঁতার খেলে; এখানে প্রেম-সরোবর কোথায় পায়, আপনি হয় তো এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, আমি সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না।'

কীর্ত্তনী যাহা বলিতে পারিল না, আমি তাহা বুঝিলাম। প্রকৃত পরমহংসেরা জগদ্দুর্ল্লভ বিমল প্রেম-সরোবরে সাঁতার দেন, এ সকল পরমহংস (ওরফে পাতিহংস) দুর্গন্ধময় ডোবাকেই প্রেম-সরোবর মনে করে, সুতরাং সেই ঘোলা জলে ভাসিয়া ভাসিয়া কর্দ্দমাক্ত হয়।

কিয়ৎক্ষণ কীর্ত্তনীর মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া আর একটী কথা আমি জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতেছিলাম, ঠিক আমার মনের কথা চুমিয়া লইয়া কীর্ত্তনী বলিল, 'সর্ব্বদা উহাদের হংসবেশ থাকে না। কখন ঐরূপ গেরুয়া বসন, কখন দিব্য চওড়া চওড়া কালাপেড়ে ধোপদাস্ত মিহি মিহি ধুতী, কখন বা যাত্রার জুড়ী কিম্বা আদালতের উকীলের মত চোগা-চাপ্‌কান, কখন বা কেহ কেহ সাহেবী ধরণে হ্যাট-কোট পেণ্টুলন পরিধান করে। কখন্ যে উহাদের কিরূপ ভঙ্গী, কখন্ যে কিরূপ বেশ, কি যে উহাদের মৎলব, আমি স্ত্রীলোক, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না।'

কীর্ত্তনীর কথাগুলি আমি বিশেষ মনোযোগ দিয়া শুনিলাম। কলিকাতা সহরে যে কয়েকটী পরমহংস আমি দেখিয়াছি, তাহাদের সকলগুলি না হউক্, কতকগুলি ঐরূপ প্রেম-সরোবরে সাঁতার দেয়, এক এক লক্ষণে তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি; কীর্ত্তনীর কথার সঙ্গে আমার মনের ভাবগুলি ঠিক মিলিল।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া অযোধ্যানাথ নিস্তব্ধ হইলেন। বাবু ভবরত্ন চৌধুরী এতক্ষণ একটীও কথা কহেন নাই, মনস্থির করিয়া পরমহংসকাহিনী শ্রবণ করিতেছিলেন, তর্কালঙ্কারের কথা সমাপ্ত হইবার পর একটী নিশ্বাস-ত্যাগ করিয়া তিনি কহিলেন, "আমিও ঐরূপ মনে করি। ঝড় উঠিলে সাগরে যেমন তরঙ্গ হয়, বিনা ঝড়ে আজকাল বঙ্গের মানবসাগরে

সেইরূপ এক একটা তরঙ্গ উঠিতেছে। সন্ন্যাসী হওয়া, স্বামী হওয়া, পরমহংস হওয়া এক এক বিভীষণ তরঙ্গ। কে যে কি কারণে সন্ন্যাসী হয়, কে যে কোন্ সন্ন্যাসীকে স্বামী উপাধি দেন, কে যে কি লক্ষণে কোন্ জ্ঞানে পরমহংস উপাধি গ্রহণ করেন, জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা কেহই সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না। যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী লোক, বারাণসীধামে তাঁহাদের মুখে আমি শুনিয়াছি, যাঁহারা প্রাণ-বায়ুকে সহস্রদলপদ্মে নিরোধ করিতে পারেন, তাঁহারাই পরমহংস হইবার অধিকারী। শ্বাস-প্রশ্বাস মানবের জীবন। যাহা উর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করা হয়, তাহার নাম হ', যাহা নিম্নদিকে নির্গত করা হয়, তাহার নাম স, এই 'হংস' যাঁহাদের মস্তকে বিচরণ করে অর্থাৎ নিম্নদিকে অতি অল্পই অনুভূত হয়, তাঁহারাই মহাযোগী। শ্বাসপ্রশ্বাসের ঐরূপ গতিক্রিয়াকে তন্ত্রমতে পরমহংসী এবং ভাগবতমতে পরমহংস বলা যায়। যাঁহারা প্রকৃত পরমহংস, তাঁহারা নির্ব্বিকার; সংসারের কোন বস্তুর সহিত যাঁহাদের কোন বন্ধন নাই, কোন বস্তুতে যাঁহাদের স্পৃহা নাই, তাঁহারা জীবন্মুক্ত; প্রকৃত পরমহংসেরা জীবন্মুক্ত হইয়া সহস্রারে নিত্যানন্দের সহিত নিত্যানন্দে বিহার করেন। সকল কথা ঠিক আমি তোমাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিলাম না, কিন্তু সাধুপুরুষের মুখে ঐ ভাবের অনেক কথা আমি শ্রবণ করিয়াছি। তুমি যেরূপ বেশ্যার গৃহে পরমহংসের দুর্দ্দশার কথা কীর্ত্তন করিলে, তাদৃশ পরমহংসও যে দুই একটী আমার চক্ষে পড়ে নাই, তাহা তুমি মনে করিও না; দেখিয়াছি, কিন্তু এখন আর দেখিতে বাসনা নাই; এখন তাহাদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই তৎক্ষণাৎ স্থানত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবার প্রবৃত্তি জন্মে; স্থানত্যাগের সুবিধা না থাকিলে কর্ণে অঙ্গুলিপ্রদান করিবার ইচ্ছা হয়।"

তর্কালঙ্কার কহিলেন, "আজ্ঞে হাঁ। পরমহংস দুর্লভ; সহজে যথায় তথায় পরমহংস-দর্শন হয় না। বঙ্গদেশে পরমহংস ছিলেন, পূর্ব্বে এমন কথা আমি শুনি নাই, একবার একটী পরমহংসের প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা অতি অদ্ভুত; তাঁহার কার্য্যও অদ্ভুত। কাশীধামের স্বর্গীয় তৈলঙ্গস্বামীর সহিত তাঁহার কার্য্যাবলীর অনেকটা সাদৃশ্য ছিল। বাস্তবিক পরমহংসেরা মহাপুরুষ, তাঁহারা লোকাতীত ক্ষমতা-সম্পন্ন; পরমাত্মার সহিত

তাঁহাদের আত্মার নিত্য-সংযোগ। স্থানে স্থানে বক্তৃতা করিয়া তাঁহারা হংসত্বের পরিচয় দেন না। এখন কেহ কেহ বলেন, শাস্ত্রপাঠ করিয়া পরমহংস হইতে হয়, এমন কোন প্রমাণ নাই; আপনা হইতেই পরং জ্ঞান জন্মে, আপনা হইতেই যোগসিদ্ধিলাভ হয়। অনেকাংশে এ কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু আদৌ শাস্ত্রজ্ঞানে প্রয়োজন নাই, ইহা স্বীকার করিতে পারা যায় না। শাস্ত্রপাঠে জ্ঞানোদয় হইলে ধর্ম্মপন্থা নির্ণয় করিবার শক্তি জন্মিয়া থাকে; সেই জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। এখন যাঁহারা পরমহংস সাজেন, তাঁহাদের অনেকেই আশানুরূপ শাস্ত্রজ্ঞান-পরিশূন্য। পরমহংসের বক্তৃতা, এ কথা শুনিলেই ত মনোমধ্যে বিস্ময়ের আবির্ভাব হয়। একবার বর্দ্ধমানের এক দেবালয়ে আমি একজন পরমহংসের বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম; অনেকগুলি শ্রোতা উপস্থিত হইয়াছিল। পরমহংস বলিতেছিলেন, 'বেদব্যাসরচিত রঘুবংশে কংসধ্বংসের বর্ণনা আছে, কুবলয় হস্তীর দন্তযুগল সুবর্ণময়, সেই দন্ত হইতে কৃষ্ণমূর্ত্তি বহির্গত হইয়া কংসকে নিপাত করিয়াছিল। এই প্রমাণে সিদ্ধ হয়, সজীব নির্জ্জীব উভয় পদার্থে কৃষ্ণ বাস করেন।'—সেই বক্তার পৌরাণিকজ্ঞান কতদূর, ঐ বক্তৃতাতেই তাহা প্রকাশ পাইল। রঘুবংশ-কাব্য বেদব্যাস-প্রণীত এবং গজদন্ত হইতে শ্রীকৃষ্ণের উৎপত্তি, ইহাই পরমহংসের বক্তৃতার সার। এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন পরমহংস অধুনা অনেক দৃষ্ট হয়।"

হাস্যকর প্রসঙ্গ হইলেও হাস্য না করিয়া গম্ভীরবদনে ভবরত্ন কহিলেন, "নানাপ্রকার উপধর্ম্মের সৃষ্টি হওয়াতেই এই সকল জঞ্জাল সমুৎপন্ন হইতেছে। আমাদের দেশে এখন স্বধর্ম্মের রক্ষক নাই, পালক নাই, চালক নাই, সেই কারণেই দিন দিন ধর্ম্মের গৌরব কমিয়া আসিতেছে; যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাকেই আপন আবিষ্কৃত ধর্ম্ম বলিয়া, স্বেচ্ছাচার চালাইবার চেষ্টা পাইতেছে; মূলবস্তুতে ভেদজ্ঞান জন্মিতেছে; স্বেচ্ছাচারের প্রবলতার সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী ও পরমহংসের সংখ্যা বাড়িতেছে। বঙ্গভাষার দুর্দ্দশা উপলক্ষ্য করিয়া হুতোম-পেঁচা বলিয়াছিলেন, 'বঙ্গভাষা এখন বেওয়ারিস্ লুচির ময়দা; বালকেরা সেই ময়দা লইয়া ইচ্ছামত পুতুল গড়িয়া খেলা করিতেছে।'—এখনকার ধর্ম্মের নামেও ঐ কথাটী ঠিক খাটে। বঙ্গের সন্তানেরা ধর্ম্মকে লইয়া নানা রঙ্গে খেলা করিতেছেন। সেই সকল রঙ্গ হইতে এক এক অবতারের

আবির্ভাব ; অবতারেরাও সনাতন নিত্য ধর্ম্মকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া নানাপ্রকার মতভেদ বাড়াইয়া ঘোরতর ধর্ম্মবিপ্লব ঘটাইতেছেন।"

কি যেন পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া, তর্কালঙ্কার কহিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, এখন যাঁহারা অবতারবহন, তাঁহারাই ধর্ম্ম-সম্বন্ধে মতভেদ বৃদ্ধি করিবার গুরু। কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতার বৈদ্যকুলোদ্ভব কেশবচন্দ্র সেন এক অবতার হইয়াছিলেন, তাঁহার চেলারা তাঁহার পূজা করিত, আরতি করিত, ভোগ দিত, পদধূলি লেহন করিত, দেবতাকে যেমন করিয়া ভক্তি করিতে হয়, ঠিক সেইরূপ ভক্তি দেখাইত। কেশবচন্দ্রের যখন ঐরূপ প্রাদুর্ভাব, সেই সময় বেদ-বেদান্তপরায়ণ দয়ানন্দ সরস্বতী কলিকাতায় আসিয়া বরাহনগরস্থ এক উদ্যানে কিছুদিন বাস করেন; তিনজন শিষ্য সমভিব্যাহারে বাবু কেশব-চন্দ্র একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান; ব্রহ্মানন্দ উপাধি ধারণ করিয়া অবধি কেশবচন্দ্র এ দেশের ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিতেন না, কিন্তু দয়ানন্দ সরস্বতীকে তিনি প্রণাম করিয়াছিলেন। বিশেষ কোন কথা উত্থাপিত হইবার অগ্রে কেশবচন্দ্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, সরস্বতী ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কোন্ ধর্ম্মের প্রতি আপনার বিশ্বাস ?'—দয়ানন্দ সরস্বতী সেই প্রশ্নে কিছু-মাত্র উত্তরদান করেন না। দুই তিনবার পুনঃ পুনঃ সেই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া, কোন উত্তর না পাইয়া, শেষকালে কেশববাবু বলেন, 'কেন প্রভু! আপনি বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, আমার প্রশ্নে আপনি নিরুত্তর থাকিতেছেন কেন ?' সেইবার দয়ানন্দ উত্তর করেন, 'তোমার প্রশ্ন ঠিক হয় নাই; প্রশ্ন না হইলে কি উত্তর দিব ?' যেন কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া কেশববাবু বলেন, 'প্রশ্ন ঠিক হয় নাই কে ? প্রশ্নে আমার কি দোষ হইয়াছে ? আপনি ধার্ম্মিক, আপনাকে আমি ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, ইহা অঠিক হইবার কারণ কি ?'—দয়ানন্দ বলেন, 'ধর্ম্মের বহুবচন নাই। তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করি-তেছ, কোন্ ধর্ম্মে আমার বিশ্বাস ? বহু না থাকিলে, এটা ওটা, সেটা, কিরূপে স্থির করা যায় ? আমি এই আম্রকাননে বাস করিতেছি, তুমি যদি জিজ্ঞাসা করিতে, এই কাননের বৃক্ষরাজির মধ্যে কোন্ বৃক্ষের আম্র মিষ্ট, তাহা হইলে আমি উত্তর দিতে পারিতাম; কিন্তু ধর্ম্ম বহু নাই, ধর্ম্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্।'—তত পণ্ডিতের বাক্যেও কেশববাবুর স্পৃহা নিবৃত্ত হইল না, তিনি পুনরায়

জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি আপনার কিরূপ বিশ্বাস ? প্রতিপ্রশ্ন করিয়া দয়ানন্দ বলিলেন, 'ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কাহাকে বলে ?' কেশববাবু উত্তর করিলেন, 'যে ধর্ম্মে ব্রহ্মের উপাসনা করা হয়।'—দয়ানন্দ প্রশ্ন করিলেন, 'ব্রহ্ম কে' ?—কেশববাবু বলিলেন, 'যিনি জগতের পিতা, জগতের কর্ত্তা, জগদীশ্বর, সর্ব্বমঙ্গলম, পরমাত্মা, তিনিই ব্রহ্ম।' -দয়ানন্দ কহিলেন, 'তুমি ত তাঁহার অনেকগুলি নাম জান, তোমার অপেক্ষা আরও অনেক বেশী নাম আমি জানি; তবে তাঁহাকে কেবল এক ব্রহ্মনামে কি বলিয়া পরিচয় দিতে পারি ? তাঁহার উপাসনাকে কেবল ব্রাহ্ম ধর্ম্মই বা কেমন করিয়া বলি ? তাঁহার নাম নাই। তুমি যাঁহাকে ব্রহ্ম বল, আর কেহ তাঁহাকে শিব বলে, কেহ বা বিষ্ণু বলে, কেহ বা আরও অন্য অন্য নাম বলে। তোমার মতে যাহার নাম ব্রাহ্মধর্ম্ম, অপরের মতে তাহার নাম শৈব ধর্ম্ম, বৈষ্ণব ধর্ম্ম ইত্যাদি কেন হইতে পারে না ? ব্রহ্ম মঙ্গলময়, শিব মঙ্গলময়, বিষ্ণুও মঙ্গলময়, ঈশ্বরের অপরাপর কল্পিত নামগুলিও মঙ্গল-ময়। তবে এক মঙ্গলময়ের উপাসনাপদ্ধতিকে ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা সঙ্গত হয় কিসে ? ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন নাম, উপাসকের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়, উপাসনার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিই ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ, মতভেদের কারণ, হিংসা-দ্বেষাদির কারণ, ভেদাভেদের কারণ, ইহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। তোমার নাম কি বাপু ?'

কেশবচন্দ্র তখন উত্তর করিলেন, 'শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।'—সবিস্ময়ে কেশব-বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া সরস্বতী কহিলেন, 'ওঃ! তোমার নাম কেশবচন্দ্র সেন ? তোমার নাম আমি শুনিয়াছি; মনে মনে ভাবিতাম, প্রবীণ ব্যক্তি তাহা তুমি নও, তুমি বালক; ধর্ম্মতত্ত্বের সার বুঝিতে তোমার এখনও অনেক বিলম্ব; যাও বাপু, বিদ্য লয়ে যাও, আর কিছুদিন অধ্যয়ন কর।'

অপ্রতিভ হইয়া সশিষ্য কেশববাবু আপন আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।"

এই দৃষ্টান্ত শ্রবণ করাইয়া অযোধ্যানাথ তর্কালঙ্কার পুনর্ব্বার ভবরঞ্জনবাবুকে কহিলেন, "দয়ানন্দ সরস্বতীর বাক্যগুলি শ্রবণ করিলে আমাদের দেশের ধর্ম্মভাব পরিস্ফুটরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। একমাত্র পরাৎপর ব্রহ্মের উপাসনা অখণ্ডই মূল-ধর্ম্ম, তৎপক্ষে দ্বৈধমত নাই; কিন্তু সেই ধর্ম্মের একটী বিশেষ নাম দিয়া স্বেচ্ছা-চারে প্রশ্রয়দান করিতে গেলেই উপধর্ম্মের গন্ধ আসিয়া পড়ে। ইংরাজী

প্রণালীতে সপ্তাহে একদিন কয়েক ঘণ্টা কাল সভা করিয়া নয়ন মুদিয়া ধ্যান করিলে কিম্বা উপাসনা করিলে কিম্বা বক্তৃতা করিলে ধর্ম্মপালন করা হয় না, ইহা যাঁহারা বুঝিতে না পারেন, ধর্ম্মতত্ত্ব লইয়া তাঁহাদের সহিত বিচার করা নিষ্ফল। অগ্রে সাকার উপাসনা করিয়া ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধে উঠিতে যাঁহারা চেষ্টা করেন, তাঁহারা ধর্ম্মফলের ভাগী হইতে পারেন না, কুট-তর্ক তুলিয়া যাঁহারা এমন কথা বলেন, তাঁহাদের মতের সহিত অনেক বিজ্ঞলোকের মতের বিরোধ হয়। শ্যামসুন্দর দুর্গাপূজা করেন, ব্রজসুন্দর নিরাকারের উপাসনা করেন, এই কারণে উভয়ের ঐক্য থাকিবে না, একসঙ্গে আহার-ব্যবহার চলিবে না, আচার-ব্যবহারের বৈলক্ষণ্য ঘটিবে, ইহা বড় দোষের কথা। এইরূপ হইলেই ভিন্ন ভিন্ন মতের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় মস্তক উত্তোলন করে, তাহার ফলে সমাজের বল-ক্ষয় হইয়া যায়। বঙ্গদেশে যতগুলি উপধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ফলাফল পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই এই বাক্য সপ্রমাণ হইবে। চৈতন্য-দেব হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহার উপদেশে যাঁহারা হরিপরায়ণ হইয়া উঠেন, প্রথমে তাঁহারা দলাদলির পক্ষপাতী হন নাই; তাহার পর ক্রমে ক্রমে সেই পবিত্র ধর্ম্ম বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে; এখন যাঁহারা বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের ব্যবহার দর্শনে চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম কিরূপ ছিল, তাহা বুঝিয়া উঠিতেই পারা যায় না। নিমাই অল্পবয়সে সংসারী হইয়া অল্পবয়সেই সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; সকলেই সন্ন্যাসী হও, শিষ্যগণকে তিনি এমন উপদেশ দেন নাই; তথাপি অনেকে আপন আপন ইচ্ছানুসারে সন্ন্যাসী সাজিয়াছিল। সেই দৃষ্টান্ত উপলক্ষ্য করিয়া এখনকার ইংরাজী-শিক্ষিত পণ্ডিতাভিমানী দুই একজন বঙ্গীয় যুবক মুখ বক্র করিয়া কহেন, 'নবদ্বীপের চৈতন্য বঙ্গদেশ নষ্ট করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার উপদেশে বঙ্গের লক্ষ লক্ষ লোক ডোর-কৌপীন ধারণ করিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে।'

চৈতন্যচরিত পাঠ করিয়া চৈতন্যদেবকে যাঁহারা উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন, তাঁহারা ঐ প্রকার প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিতে কদাচ প্রবৃত্ত হন না।

এখনকার বৈষ্ণবেরা এক প্রকার অদ্ভুত পদার্থ হইয়া উঠিয়াছে। অধি-কাংশ বৈষ্ণব যেরূপ আচরণ করে, তাহা দর্শন করিলে তাহাদের পূর্ব্ব-

পুরুষগণকে চৈতন্যদেবের শিষ্য বলিয়া সম্মান দিতে কেহই কুণ্ঠিত হন না, কিন্তু বর্ত্তমান বংশধরগণকে সে বংশের অঙ্গার বলিতেও অনেকে ইচ্ছা করেন। আজকাল শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব একটা প্রবাদবাক্যের মধ্যেই হইয়া উঠিয়াছে; পাঁচালীওয়ালা দাশরথি রায় তাঁহার পাঁচালীর খণ্ডে খণ্ডে শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব রচনা করিয়া লোক হাসাইয়া গিয়াছেন। যাঁহারা শক্তির উপাসক, তাঁহারা শাক্ত, যাঁহারা বিষ্ণুর উপাসক, তাঁহারা বৈষ্ণব। শক্তি ছাড়া বিষ্ণু নহেন, বিষ্ণু ছাড়া শক্তি নহেন; এই যে সার তত্ত্ব, এখনকার বৈষ্ণব তাহা ভুলিয়া গিয়াছে।"

এই শেষ কথা বলিয়া অযোধ্যানাথ তর্কালঙ্কার ঈষৎ হাস্য করিয়া ভবরত্ন-বাবুকে কহিলেন, "এখনকার শাক্ত-বৈষ্ণবে কেমন ভাব, একটী গল্প বলিয়া আপনাকে তাহা বুঝাইব। এক বৎসর এক বাড়ীতে দুর্গাপূজা হইতেছিল, একজন তিলকধারী বৃদ্ধ বৈষ্ণব দুর্গাপ্রতিমা-দর্শনার্থ পূজার দালানে উঠিয়া, প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, দুই তিনবার বামে দক্ষিণে মস্তকসঞ্চালন করিল; প্রতিমাকে প্রণাম না করিয়া সহাস্য-বদনে মুক্তকণ্ঠে কহিল, 'বাঃ! বৌ-ঠাক্-রুন্ বেশ সাজিয়াছে!'—বাড়ীর কর্ত্তা অতি নিকটেই ছিলেন, বৈষ্ণবের ঐ বাক্য তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। বৈষ্ণব যখন চলিয়া যাইবার জন্য দালানের সিঁড়িতে নামিল, ভৃত্য দ্বারা কর্ত্তা তাহাকে ডাকাইলেন; বৈষ্ণব নিকটস্থ হইলে সগৌরবে তাহাকে বলিলেন, 'বাবাজী! আপনি যান্ কোথা? পূজা-বাড়ীতে পূজা দেখিতে আসিলে কিঞ্চিৎ প্রসাদ ভক্ষণ না করিয়া যাইতে নাই। আপনি বসুন, কিঞ্চিৎ জলযোগ করিতে হইবে।'—বাবাজী বলিল, 'এ স্থানে প্রসাদভক্ষণ আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ।' কর্ত্তা কহিলেন, 'যাহা নিষিদ্ধ, তাহা ভিন্ন অন্য প্রকার প্রসাদ আছে; আপনি বসুন।'

বাবাজীর পদপ্রক্ষালনের নিমিত্ত জল প্রদান করা হইল, দরদালানে বৃহৎ একখানি আসন পাতিয়া দেওয়া হইল, অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া পদপ্রক্ষালনান্তে বাবাজী সেই আসনে বসিল। কর্ত্তা একবার বাড়ীর ভিতর গেলেন, তৎক্ষণাৎ আবার ফিরিয়া আসিলেন। পরক্ষণে এক প্রশস্ত রজতপাত্রে বিবিধ মিষ্টান্ন আনীত হইয়া বাবাজীর আসনসমক্ষে রক্ষিত হইল; বামদিকে সুবাসিত বারিপূর্ণ রজতপাত্র; জলপাত্রের নিকটে কয়েক খণ্ড শ্বেতবর্ণ পদার্থ-

পূর্ণ একখানি ক্ষুদ্র রজতপাত্র। কর্ত্তা তখন বাবাজীকে কহিলেন, ‘বামদিকের ঐ ক্ষুদ্র পাত্রে যাহা আছে, অগ্রে তাহা ভক্ষণ করুন্।’—বাবাজী জিজ্ঞাসা করিল, ‘উহা কি ?’—কর্ত্তা কহিলেন, ‘মানকচু’।—বিস্ময়ান্বিত হইয়া বাবাজী বলিল, ‘কাঁচা মানকচু কি মানুষে খায় ?’—কর্ত্তা বলিলেন, সেকল মানুষে খায় না, কিন্তু আপনাকে খাইতে হইবে। আপনি ইতিপূর্ব্বে প্রতিমা দর্শন করিয়া বলিতেছিলেন, বৌ-ঠাকুরুন্ বেশ সাজিয়াছে। দুর্গা আপনার বৌ-ঠাকুরুন্ কি সম্পর্কে ?’ বাবাজী উত্তর করিল, ‘মহাদেব বৈষ্ণব, আমিও বৈষ্ণব ; মহাদেব জ্যেষ্ঠ, আমি কনিষ্ঠ; সেই সম্পর্কে মহাদেবের পরিবার আমার বৌ-ঠাকুরুন্।’—কর্ত্তা বলিলেন ‘হাঁ, বুঝিলাম। সেইজন্যই বলিতেছি, ঐ ক্ষুদ্র পাত্রের শ্বেত খণ্ডগুলি অগ্রে আপনাকে ভক্ষণ করিতে হইবে।’—বাবাজী কিছুতেই রাজী হইল না, কর্ত্তা তখন ঘোড়ার চাবুক আনাইলেন, বাবাজীর মাথার উপর সেই চাবুক নাচাইয়া নাচাইয়া সক্রোধে কহিলেন, ‘খা শালা, খা, ঐ মানকচু তোকে খেতেই হবে। শিব তোমার দাদা, দুর্গা তোমার বৌ-ঠাকুরুন্! সমুদ্রমন্থনে শিব কালকূট-বিষ-ভক্ষণে নীলকণ্ঠ হইয়া আছেন, তুমি শালা তাঁর ভাই, তুমি খানকতক মানকচু খাইতে পারিবে না ? খা শালা, খা, না খেলে এই চাবুক তোমার বৈষ্ণবগিরী বাহির করিবে।’—চাবুকের ভয়ে বাবাজী তখন কর্ত্তার কাছে ক্ষমা চাহিল, কর্ত্তার আদেশে ভগবতীকে প্রণাম করিল, মানকচু খাইতে হইল না, মিষ্টান্নভক্ষণ, শেষকালে ভগবতীর ভোগের পর ছাগমাংস পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিতে হইয়াছিল।”

ভবরত্ন হাস্য করিলেন। তর্কালঙ্কার কহিলেন, “কেবল শাক্ত-বৈষ্ণবের কথা বলিয়া নহে, ধর্ম্মের নামে দিন দিন এ দেশে যতই দলবৃদ্ধি হইতেছে, ততই পরস্পর ভেদাভেদ, হিংসা-দ্বেষ, অহঙ্কার ও দলাদলি বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে। যে দেশে ঐক্য নাই, ধর্ম্মকে খেলিবার সামগ্রী মনে করিয়া সে দেশে ভিন্ন ভিন্ন দলে আরও অনৈক্য বৃদ্ধি করা, কদাচ মঙ্গলের নিদর্শন নয়। শৃগালের ঐক্য আছে, বায়সের ঐক্য আছে, বানরের ঐক্য আছে, মেষপালের ঐক্য আছে, বাঙ্গালী মনুষ্যের ঐক্য নাই, ইহা কত দূর লজ্জা ও অবনতির হেতুভূত, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অনুভব করিতে পারিতেছেন। সমাজসংস্কারক আখ্যাধারী পাণ্ডারা এই মূলবিষয়ে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, যাহাতে

স্বদেশের মঙ্গল হইবে না, সেই সকল বিষয়ের প্রচলনের নিমিত্ত ঊর্দ্ধবাহু হইয়া চীৎকার করিতেছেন, ইহাই অসামান্য আশ্চর্য্যের বিষয়। বিলাতী অনুকরণে বঙ্গসমাজের গঠন যাঁহাদের বাঞ্ছনীয়, তাঁহারা সমাজের অধঃপতন আহ্বান করিতেছেন, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না।”

অধোমুখে কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিয়া, ভবরত্ন কহিলেন, “বিধির বিপাকে জীবনের প্রথমকালে আমাকে বিদেশে বিদেশে পর্য্যটন করিতে হইয়াছিল, বঙ্গ-সমাজের তদানীন্তন অবস্থা আমি পরিজ্ঞাত হইতে পারি নাই; এখন যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে তোমার বাক্যগুলি যে অখণ্ডনীয় সত্য, তাহা আমি বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। নব নব বেশ পরিগ্রহ করিয়া, নব নব বাক্যের তরঙ্গ ছুটাইয়া, যাঁহারা বঙ্গ-সংসারসাগরে কর্ণধার হইবার আড়ম্বর দেখাইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বেচ্ছানুসারে এক এক অবতার হইয়া উঠিতেছেন। মানুষের অবতার যে কি তামাসা, তাহার মর্ম্মভেদ করিতে আমি অক্ষম।

“পরিত্রাণায় সাধূনাং, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥”

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান্ অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্ত্রে যে দশাবতারের কথার উল্লেখ আছে, সেগুলি ভগবানের অবতার ; ভগবান্ সকল অবতারে নরদেহ পরিগ্রহ করেন নাই, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ এই চারিটী প্রথম অবতার ; এখনকার অবতাররূপী মানুষেরা যদি আপনাদিগকে ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস রাখেন, তাহা হইলে মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদি রূপ ধারণ করিতে না পারেন কেন, এই একটী জিজ্ঞাস্যের বিষয় আছে। জিজ্ঞাসার অগ্রে একটী রহস্য স্মরণ হইল। মনুষ্য অবতারেরা ভগবানের অন্যান্য অবতারের অনুকরণ অপেক্ষা কৃষ্ণাবতারের অনুকরণ করিতেই বড় ব্যগ্র, কৃষ্ণ হইতেই তাঁহারা ভালবাসেন। আমি শুনিয়াছি, কলিকাতায় এক বাবুর বাড়ীর একটী গুরু আপনাকে কৃষ্ণাবতার বলিয়া পরিচয় দিতেন, শিষ্যের অন্তঃপুরে রাসবিহার, যমুনাবিহার, কুঞ্জবিহার, কদম্ববিহার ও বস্ত্রহরণ প্রভৃতি লীলা খেলা করিতেন। বাবু অগ্রে তাহা জানিতে পারেন নাই, শেষকালে জানিতে পারিয়া ঠাকুরের

লীলা দেখিতে তাঁহার ইচ্ছা হয়। ঠাকুর একদিন অপরাহ্ণ অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া, সদরফটক পার হইয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিতেছিলেন, বাবু সেই সময় বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া ফটকের মুখে তাঁহাকে দেখিলেন; দেখিয়াই হাস্য করিয়া বলিলেন, 'ঠাকুর, লীলা দর্শনে আমার বড় সাধ, অন্তঃপুরে ছোট ছোট লীলা-খেলা হয়, আমি দুই একটী বড় লীলা দেখিতে ইচ্ছা করি। সব যদি হয়, তবে কালিয়দমন আর গোবর্দ্ধনধারণটা বাকী থাকে কেন?' ঠাকুরকে এই কথা বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ দ্বারপালগণকে আজ্ঞা দিলেন, 'ঠাকুরকে গোবর্দ্ধন ধারণ করাও।'—ফটকের ধারে বৃহৎ একখণ্ড পাষাণ পতিত ছিল, ঠাকুরকে ভূতলে শয়ন করাইয়া দ্বারপালেরা সেই পাষাণখণ্ড তাঁহার বক্ষে চাপাইবার উপক্রম করিল! ঠাকুর তখন প্রাণভয়ে করযোড়ে বাবুর নিকটে অপরাধস্বীকার করিয়া অব্যাহতিলাভ করিলেন। বাবু কহিলেন, 'আজ অবধি এখানে তোমার লীলা-খেলা সমাপ্ত, আর তুমি আমার বাড়ীতে প্রবেশ করিও না।'—অবতারের অবতারত্ব ঘুচিল, কাঁপিতে কাঁপিতে প্রাণ লইয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। এ দৃষ্টান্তটী অতি সুন্দর। এখনকার অবতারেরা শ্রীকৃষ্ণের ছোট ছোট লীলা করিতে পটু আছেন কি না, জানা যায় না, কিন্তু বড় বড় লীলা করিতে এককালেই অসমর্থ। এ কথা যদি ঠিক হইল, তবে এখনকায় মনুষ্যরূপী অবতারেরা কোন্ কোন্ গুণে কোন্ কোন্ লীলা-খেলা করিয়া অবতার নামে পরিচয় দেন? কেহ ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া অবতার হন, কেহ ছাই-মাটী মাখিয়া অবতার হন, কেহ বা সাকার-নিরাকারকে সূর্য্যকিরণে ও বহ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া খিচুড়ি পাকাইয়া অবতার হন, কেহ বা প্রকাশ্য রাজবর্ত্মের পার্শ্বে ধড়া-চূড়া পরিয়া বংশীধারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণ সাজিয়া মুদিতনেত্রে অবতার হন, উহাই তাঁহাদের লীলা-খেলা। ঐ সকল অবতারকে গোবর্দ্ধনধারণ করাইতে পারিলে কিম্বা কালিদহে ঝাঁপ দেওয়াইয়া কালিয়-নাগের মস্তকে নাচাইতে পারিলে যথার্থ পুরস্কার দেওয়া হয়। তুমি হয় ত জিজ্ঞাসা করিতে পার, অবতারের আবার পুরস্কার কি?—এ কথার উত্তর—অবতারের পুরস্কারের নাম ষোড়শোপচারে পূজা।"

দেশের জন্য আক্ষেপ করিয়া ঐ দুই জন ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ শেষকালে অবতারের পুরস্কারপ্রসঙ্গে মর্ম্মভেদী হাস্য করিলেন। রাত্রি তখন দুই প্রহর অতীত হইয়াছিল, অযোধ্যানাথ স্বগৃহে গমন করিলেন, বাবু ভবরত্ন আপন শয়নগৃহে বিশ্রাম করিতে গেলেন।

ভবরত্নের সহিত অযোধ্যানাথের কথোপকথনে বঙ্গ-সমাজের অনেকটা নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ পাইল। ধর্ম্মের ভেদাভেদ, ধর্ম্মের দলাদলি এবং ধর্ম্মের নামে হিংসাবিদ্বেষ দর্শন করিয়া পরিব্রাজক ব্রহ্মচারী পরমানন্দ ঠাকুর স্বপ্রণীত আনন্দলহর নামক সঙ্গীতগ্রন্থে একটী সুন্দর গীত উপহার দিয়াছেন। সেই তত্ত্বগীতটী এই স্থলে উদ্ধৃত না করিয়া আমরা ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। গীতটী এইঃ—

ঝিঁঝিট মিশ্র—একতালা।

ধর্ম্ম ধর্ম্ম সবাই করে,
বলি ধর্ম্মের ধার ক-জন ধারে।
ধারে যারা তাদের আবার ক-জন সে মুক্তি তরে,
মান অভিমান তুচ্ছ করি সকলি সয় অকাতরে,
ক-জন বা সে স্বার্থ ছেড়ে জগজ্জনার উপকারে,
বিলায় জ্ঞান-ভক্তি প্রেম থাকি সদা সদাচারে॥
ক-জন বা আর শাস্ত্র বুঝে চূর্ণ করি সংস্কারে,
সবাই সম দেখতে শিখে দেখায়ও তা ব্যবহারে।
দেখি যে সব ধর্ম্মের ঢেউ উঠছে ভবে ঘরে ঘরে,
সে নয় ধর্ম্ম উপধর্ম্মে দিচ্ছে ধর্ম্ম ছারেখারে।
কেউ বা ছেড়ে বন্ধুস্বজন ধর্ম্ম আশে বনে চরে,
কেউ বা ছেড়ে সত্য দয়া ধর্ম্ম দেখে গাছ-পাথরে।
কেউ বা মেতে ধনে মানে ফুলে উঠে অহঙ্কারে,
কেউ ভাবি তা সংসারেতে ঢুকে বে ঘোর কারাগারে।
কেউ দেখ বা কঠোরতায় উপবাসে সময় হরে,
কেউ বা দেখি তীর্থে তীর্থে মিথ্যাচারে ঘুরে মরে।

কেউ বা গাঁজা সিদ্ধি খেয়ে বেড়ায় সদা ভূতাকারে,
কেউ বা দেখি বাক্যনবীশ হাঁটু জল ত হরে দয়ে।
এ ধর্ম্ম না ওটী ধর্ম্ম এ ধর্ম্মভূত গছে যারে,
সবার যে এক আত্মধর্ম্ম কভু না সে বুঝ্‌তে পারে।
ধর্ম্ম নহে নানাবিধ নানা হয় যা অবিচারে,
সে অবিচার ঘটায় ভবে লোভে প'ড়ে স্বার্থপরে।
ধর্ম্মটা হয় সহজ ধন সবার আছে মূলাধারে,
সে মূলাধারে দৃষ্টি পলে ধর্ম্ম নিজের মাথায় ধরে।
ধরম কথায় ধর হাম্ দিচ্চে বলে যারে তারে,
মাছ ধরে যে না ছোঁয় পানি সে আনন্দে তাহে তরে।

আধুনিক অবতার-সম্বন্ধেও ঐ ব্রহ্মচারী ঠাকুর একটী চমৎকার গীত রচনা করিয়াছেন। পাঠকবর্গের কৌতূহলপরিতৃপ্তির উদ্দেশে সেটীও এই স্থলে উদ্ধৃত হইলঃ—

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—পোস্তা।

শ্যামা এ কি বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার।
দেখি কলিকালে পালে পালে হাজার হাজার অবতার।
যত ভণ্ড নেড়া-নেড়ীর দল, অকাল কুষ্মাণ্ড সকল,
করে বকাণ্ড প্রকাণ্ড আশা পেতে ধর্ম্ম ছল;
শেষে এম্‌নি কাণ্ড বাধায় ষণ্ড লণ্ড-ভণ্ড দেশাচার।
কারো থাকে না কুল, হয় প্রেমাকুল, পেয়ে গোকুল একাকার।
কারও বিদ্যের এত চোট, কথা বল্‌তে কাঁপে ঠোঁট,
তবু সংটী সাজি হন স্বামীজী বলেন দে গো ভোট;
কভু উচ্চ করি পুচ্ছ ধরি তুচ্ছ করে জাত-বিচার।
সার্ ফাদার্ মাদার চায় সে সবার পূজ্য বলে নমস্কার।
কেউ বা এমনি গুণধাম, ডুবায় রামকৃষ্ণ নাম,
ধরে জ্ঞানানন্দ প্রেমানন্দ কত নাম বেনাম;
কেউ বা কৃপা-সিন্ধু জগবন্ধু রাধাকৃষ্ণ একাকার।
কেউ হয়ে হংস দেয় গো হংস কংস-বংশ ছারেখার॥

কারো প্রেমের এম্‌নি ঢেউ, কোথা বাদ পড়ে না কেউ,
ভেসে এমন পাছে লাগে যেমন বাঘের পাছে ফেউ;
কেহ তন্ত্র পড়ে মন্ত্র ঝেড়ে যন্ত্র নেড়ে পগার পার।
কেউ বা তাগে বাগে ভোগে রাগে হয় গুরুজী কর্ম্মকার॥
ভূমিশূন্য সবাই ভূপ হলে আমি বাদ পড়ি কি বলে;
দেগে দে মা নামি শ্যামা জয়ধ্বজা তুলে;
আর কয় আনন্দ এও না মন্দ যুটলে সদা প্রেমাচার।
আর কয় আনন্দ এও আনন্দ হই যদি মা লেক্‌চারার,
তবে দেশ-বিদেশে নানা ভাষে কর্‌বো ভারত-সমুদ্ধার॥

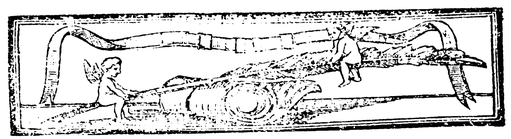

ত্রয়োদশ তরঙ্গ।

নারী-সংসার।

নারীগণ সংসারের লক্ষ্মী, সর্ব্বশাস্ত্রে এই বাক্য স্বীকৃত হয়। ভারতকামিনী-গণ স্মরণাতীত কালাবধি সংসারের সকল মঙ্গলকর বিষয়ে আপনাদের মহিমা দেখাইয়া আসিতেছেন। বঙ্গ-কামিনীগণ সংসারের সকল বিষয়ের কর্ত্রী, এই কারণে তাঁহাদের নাম গৃহিণী। বিদেশে যে সকল লোক আমাদের সংসারের আভ্যন্তরীণ তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত, তাঁহারা বলেন, বঙ্গবাসী হিন্দুগণ আপনাদের নারীগণকে সংসারের দাসী করিয়া রাখেন, বিস্তর লাঞ্ছনা করেন, সংসারের কোন কার্য্যে স্বাধীনতা দেন না, এই সকল কারণে বঙ্গ-সংসারেব উন্নতি হইতে পারে না।

ঐ প্রকার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভুল। গৃহসংসারে নারীগণ যাহা করেন, তাহাই হয়। সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহে বুদ্ধিমতী গৃহিণীরা সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনা, গৃহের কর্ত্তারা গৃহিণীগণের কোন প্রকার অবিবেচনার কার্য্য না দেখিলে তাঁহাদের কৃত কার্য্যের উপর কোন কথাই কহেন না। কি ধর্ম্মসম্বন্ধে, কি নিত্যকার্য্য-সম্বন্ধে, কি নৈমিত্তিক লোক-লৌকিকতা-সম্বন্ধে গৃহিণীরা যাহা ভাল বিবেচনা করেন, অবস্থা বুঝিয়া সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, স্বচ্ছন্দে তাহাই তাঁহারা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের স্বাধীনতা না থাকিলে কখনই সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক হিন্দু-সংসার চলিত না। তবে হাঁ, ভদ্র ভদ্র হিন্দু-পরিবারের রমণীগণ প্রকাশ্যরূপে হাটে বাজারে গতিবিধি করেন না, অবাধে পরপুরুষের সহিত বাক্যালাপ করেন না, স্বেচ্ছাচারের দাসী হইয়া সংসারের অকুশল উৎপাদন করেন না,

এইগুলিতে তাঁহাদিগকে পুরুষের অধীন হইয়া চলিতে হয়। হিন্দু-সংসার ইহাকে মঙ্গল বলিয়া বিবেচনা করেন। এইটুকু আছে বলিয়াই বর্ত্তমান বিপ্লবসময়ে হিন্দু-ধর্ম্ম এখনও হিন্দু-অন্তঃপুরে অনেক পরিমাণে অটলভাবে রহিয়াছে। আজকাল যেরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, অন্তঃপুরের সে শান্তি আর অধিক দিন অব্যাহত থাকিবে না। বৈদেশিক রাজার অধিকারে রাজধানীমধ্যে বৈদেশিক লোকের আধিক্য হইতেছে, তাহা-দের সহিত সংমিশ্রণে এ দেশের অদূরদর্শী পুরুষেরা পদে পদে বিভ্রান্ত হইতে-ছেন। বিলাতের বিবিরা সকল বিষয়ে স্বাধীনতা লয়, পুরুষের উপর প্রভুত্ব করে, একাকিনী ঘোড়া চড়িয়া বেড়ায়, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আপনাদের নারীগণকে সেইরূপ ব্যবহারে শিক্ষিতা করা অনেক পুরুষের সাধ। তাঁহাদের সে সাধ পূর্ণ হইলে পরিণাম কিরূপ দাঁড়াইবে, নূতন উল্লাসের কুজ্ঝটিকা-ঘোরে তাহা তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না।

ইংরাজ আমাদের মঙ্গল করিতেছেন, দিন দিন আরও অধিক মঙ্গল সাধিত হয়, ইহাই তাঁহাদের কামনা। ইংরাজী বিদ্যালয়ে এ দেশের পুরুষেরা বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন, ইংরাজী সমাজের আচার-ব্যবহার-বিজ্ঞাপক পুস্তকাদি পাঠে নূতন প্রকার জ্ঞানলাভ করিতেছেন, ইংরাজী পাদরী সাহেবের মুখে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতেছেন, সাহেব-লোকের সহিত বিবি-লোকের কি প্রকার সম্বন্ধ, কি প্রকার ব্যবহার, তাহাও দর্শন করিতেছেন, মনের ভিতর যুদ্ধ হই-তেছে। আমাদের এটা ভাল কিম্বা সাহেবের ওটা ভাল, এই বিচার লই-য়াই তর্ক-যুদ্ধ। বাহ্য দর্শনে ও বাহ্য শোভায় ইংরাজী দৃষ্টান্ত সুন্দর, অতএব সৌন্দর্য্যের দিকেই চিত্ত ধাবিত হওয়া সম্ভব। ইংরাজী ধর্ম্মের সহিত আমাদের ধর্ম্মের মিলন নাই, ধর্ম্মভাব বিচলিত হইবার ইহা একটী প্রধান হেতু। পাদরী সাহেবেরা এবং তাঁহাদের প্রিয়ংবদ "ক্যাটাকিষ্ট" অনুচরেরা যথায় তথায় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তরলমতি হিন্দুস্থানের ধর্ম্মবিশ্বাস টলাইবার চেষ্টা করিতেছেন, চেষ্টা কোন কোন স্থলে সফল হইতেছে, শোনাদলে যাহাদের দৃঢ়তা অল্প, তাহাদের ধর্ম্মভাব শিথিল হইয়া আসিতেছে; দুর্জ্জয় ঝটিকাঘাতেও হিন্দুধর্ম্ম কাঁপে না, তথাপি যেন ঐ সকল বক্তৃতার বাতাসে হিন্দুধর্ম্ম কাঁপিতেছে। অনেক পুরুষের মন সন্দেহ-

দোলায় দোদুল্যমান; ধর্ম্মভাব অটল রাখিতেছিল হিন্দু-অন্তঃপুরের কামিনীরা, তাহাতেও আঘাত লাগিতেছে।

সমস্ত পৃথিবীকে খৃষ্টান করা খৃষ্টান-জাতির সঙ্কল্প; ধর্ম্মবর্জ্জিত দেশে তাঁহাদের সে সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হওয়া অসম্ভব বোধ হইবে না, কিন্তু এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতক্ষেত্রে সাধারণতঃ খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচার বড় শক্ত কথা; সাহেব তাহা বুঝিতে-ছেন; কতকগুলি পুরুষের মন টলাইয়া তাঁহারা দেখিলেন, ইচ্ছামত ফল ফলিল না, স্ত্রীলোকেরা অকপটে ধর্ম্মপালন করে; স্ত্রীলোকের মন টল:-ইতে না পারিলে, তাহাদের অকপট বিশ্বাসে আঘাত করিতে না পারিলে ইষ্টসিদ্ধি হইবে না, খৃষ্ট-সেবকেরা তাহা বুঝিলেন; বিদ্যাশিক্ষা দিবার অছিলা করিয়া স্থানে স্থানে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, অশিক্ষিতা হিন্দুবালিকার বিদ্যাশিক্ষা হইতে আরম্ভ হইল। মিশনারী বিদ্যালয়;—শিক্ষয়িত্রী মিশনরী বিবি, সেই বিবির সঙ্গিনী কৃষ্ণবর্ণা খৃষ্টপরায়ণা এতদ্দেশীয়া ইতর-কামিনীগণ। হিন্দু-বালিকারা মিশনরী বিদ্যালয়সমূহে খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে লাগিল, মথিলিখিত সুসমাচার, লুক্-লিখিত সুসমাচার এবং যোহন-লিখিত সুসমাচার ইত্যাদি মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিল, প্রভু যিশুর মহিমা-বিঘোষক গীত গাহিতে শিখিল, বঙ্গের নারীসংসার নষ্ট হইবার সূত্রপাত হইল।

মিশনরী সাহেবেরা দেখিলেন, সে উপায়েও সম্পূর্ণরূপে অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া উঠিল না, অথচ খৃষ্ট ধর্ম্মের দিকে হিন্দু-নারীগণের মতি ফিরা-ইতে না পারিলে আশা পূর্ণ হয় না, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহারা এক নূতন উপায়ের আবিষ্কার করিলেন। সে উপায়ের নাম "জানানা মিশন"। সুবুদ্ধি-প্রসূতা আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া। জানানা মিশনের কুমারী বিবিরা ভাল ভাল হিন্দু-গৃহস্থের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া যুবতী কুলবধূ ও কুলকন্যাগণকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন, কেবল পুস্তকপাঠ করাইয়া আশা মিটিল না, মৌখিক উপদেশে খৃষ্ট-মহিমা বুঝাইয়া দেওয়া, হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত দেবদেবীগণের নিন্দা করা এবং গৃহস্থের মনোরঞ্জনার্থ ছাত্রীগণকে কিছু কিছু সূচিকার্য্য শিক্ষা দেওয়া তাঁহাদের কার্য্য হইল। জানানা-কামিনীগণের পরমানন্দ;—জানানামধ্যে বিবিগণের ও সহচরী-গণের মহা সমাদর। কার্য্য চলিতে লাগিল। দেখাদেখি কার্য্য করা অনেক

লোকের স্বভাব। অমুক অমুক বাড়ীতে বিবি আসিয়া যুবতী পড়াইতেছে, আমাদের বাড়ীতে কেন আসিবে না, এই তর্কে মীমাংসা করিয়া ক্রমে ক্রমে অনেকেই আপন আপন অন্তঃপুরে মিশনরী কামিনীগণকে আমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন, জানানা মিশন গুলজার হইয়া উঠিল। আজকাল সহরের প্রায় ঘরে ঘরে জানানা মিশনের কুমারীগণের অবাধ প্রবেশাধিকার। ফল কিরূপ হইতেছে, বাহির হইতে সকলে তাহা দেখিতেছেন না, ভিতরে ভিতরে সুকোমল কমলদলে কীট প্রবেশ করিতেছে। গৃহস্থের কুলবধূরা প্রমোদিনী হইয়া উঠিতেছেন। বিবি কখন্ আসিবেন, গুরু-মা কখন্ আসিবেন, অনেকগুলি প্রমোদিনী কামিনী আপন আপন কক্ষ-বাতায়নে বসিয়া চঞ্চল-নয়নে সেই পথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। বিবি আসিলে প্রথমে পুস্তক-পাঠ, তাহার পর কার্পেট্-বয়ন, তাহার পর উপদেশশ্রবণ, তাহার পর হাস্য-কৌতুকের সঙ্গে রহস্যালাপ। তাহার পর হারমোনিয়ম্ পড়ে, সুন্দর সুন্দর অধরে বংশীধ্বনি হয়, সঙ্গে সঙ্গে সুমধুর কণ্ঠস্বরে যিশু-মহিমা গীত হইতে থাকে। অন্তঃপুরে ঘরে ঘরে এই প্রকার শিক্ষা। যাঁহারা এই শিক্ষা পান, গৃহকর্ম্মে তাঁহাদের আর মন থাকে না, রামায়ণ-মহাভারত ভাল লাগে না, গুরুজনের প্রতি মর্য্যাদা দেখাইতে তাঁহারা ভুলিয়া যান। যাঁহারা নিত্য শিবপূজা করিতেন, ব্রত লইতেন, পর্ব্বোৎসবে লক্ষ্মীপূজা, মনসা-পূজা, ষষ্ঠী-পূজা প্রভৃতিতে আনন্দ অনুভব করিতেন, নারায়ণের গৃহমার্জ্জনা করিয়া, ভক্তিভাবে পূজার আয়োজন করিয়া দিতেন, তুলসীবৃক্ষে জল দিতেন, তাঁহারা এখন ক্রমে ক্রমে সে সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিতেছেন; কেবল পরিত্যাগ করিয়াই চুপ করিয়া থাকিতেছেন না, ঠাকুর-দেবতার নামে ঘৃণা করিয়া মুখ বাঁকাইতে শিখিতেছেন। প্রতিমা-পূজার নামে একটী হিন্দুকুল-মহিলা তাঁহার শাশুড়ীকে বলিয়াছিলেন, "প্রতিমা-পূজায় কি ফল? উহা কেবল পুতুলমাত্র। যে পুতুল আমরা আপনারা গড়িয়া আপনারা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারি, সে পুতুল কি আমাদিগকে মুক্তিদান করিতে পারে?"

জানানা মিশনের এই প্রকার ফল। বিবির মুখে শুনিয়া হিন্দুকুলকন্যারা ঐরূপ পবিত্র জ্ঞানলাভ করিতেছে। জানানা মিশনের শিক্ষার এই প্রকার ফল। ইহা অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর ফল একটু পরেই আমরা দেখাইব।

এই কলিকাতা সহরের উত্তরবিভাগের একটী পল্লীতে সুধারাম চট্টোপাধ্যায়ের বাস। সুধারামের পাঁচ পুত্র, তিন কন্যা, তিন জামাই, তিন বধূ। পুত্রগণ সকলেই ইংরাজীতে পণ্ডিত, হিন্দুধর্ম্মে অবিশ্বাসী, কেবল কনিষ্ঠ পুত্রটী স্বধর্ম্মে ভক্তিমান্। বৃদ্ধ সুধারাম স্বয়ং স্বধর্ম্মপরায়ণ। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রের বিবাহ হইয়াছিল, বধূ তিনটী যুবতী, জ্যেষ্ঠা বধূটী পুত্রবতী। সুধারামের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম সয়ারাম, মধ্যম নরহরি, তৃতীয় বামদেব। তাঁহারা তিন জনে পরামর্শ করিয়া মাতা-পিতার অমতে, জানানা মিশনের একটী বিবি আনিয়া বধূ তিনটীকে শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুধারামের তিনটী কন্যার মধ্যে একটী কন্যা তখন পিত্রালয়ে ছিল, সেটীও ভ্রাতৃবধূগণের সহিত মিলিত হইয়া বিবির নিকটে শিক্ষালাভ করিতে লাগিল।

বিবির কর্ত্তব্যকার্য্য বিবি করেন, কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইতেছে, তাহা দর্শন করিবার নিমিত্ত বড়বাবু মধ্যে মধ্যে শিক্ষাস্থলে যান, বিবির সহিত তাঁহার অনেকপ্রকার কথাবার্ত্তা হয়, ইংরাজী ভাষায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিহাসও চলে, বিবি তাহাতে ক্ষুণ্ণ হন না। একদিন বড়বাবু যে সময় উপস্থিত হইলেন, সে সময় যন্ত্রযোগে গান হইতেছিল। প্রথম গানটী বড়-বাবুকে বড় ভাল লাগিল না। গান সমাপ্ত হইলে বিবিকে তিনি কহিলেন, "ঐ প্রকারের গীত শিক্ষা করিয়া আমাদের স্ত্রীলোকের কোন উপকার হইবে না; যাহাতে উপকার হয় অথচ উপদেশ থাকে, সেইরূপ গীত আপনি শিখাইবেন।"

বিবি কহিলেন, "যে সুরে যে ভাবে গীত বাঁধা আছে, তাহাই আমি শিখাই; উপদেশের গীত আমার পুস্তকে লেখা নাই। আপনারা যাহাকে ভজন বলেন, আমাদের গীতগুলি সেই ভাবে বিরচিত।"

বাবু কহিলেন, "আমাদের ভজনের গীত আমাদের কর্ণে যেরূপ মিষ্ট লাগে, আপনাদের ভজন সেরূপ মিষ্ট হয় না। কোন দেবতার নামে আমার বিশ্বাস কি অবিশ্বাস, ভক্তি কি অভক্তি, আমার মন্তব্যের সেরূপ অর্থ আপনি বুঝিয়া লইবেন না। আমার কথার তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা আপনাদের গীত বাঁধিয়া দেন, সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁহাদের অধিকার আছে, গীত শুনিয়া তাহা আমার বোধ হয় না;

বিশেষতঃ ধর্ম্মের ভাবে তাঁহাদের উদারতা অতি অল্পই প্রকাশ পায়; গীতের পদে পদে আত্মবিশ্বাসের অনুরূপ এক কথাই বারংবার; ঐরূপ শুনা, পড়ন, চর্ব্বিত-চর্ব্বণ, বোধ করি, কাহারও কর্ণে তৃপ্তিকর বোধ হয় না। যদি আপনি বলেন, তাহা হইলে আমি দুটী চারিটী গীত লিখিয়া দিই, তাহাই আপনি যন্ত্রের সঙ্গে মিলাইয়া কামিনীগণকে শিক্ষা দিবেন। আমার বিরচিত সঙ্গীতে প্রভু যিশুর মহিমাও থাকিবে, অথচ রাগ-রাগিণীও অঙ্গহীন হইবে না।"

বাবুর ঐ কথায় বিবির প্রাণে কোনরূপ আঘাত লাগিল কি না, তাহা বুঝা গেল না, কিন্তু কথার সূত্র ছাড়িয়া দিয়া বিবি জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু যিশু-খৃষ্টের নামে আপনার কি আন্তরিক বিশ্বাস আছে?" বাবু উত্তর করিলেন, "সাধুপুরুষের নামে বিশ্বাস না রাখা মূর্খের কার্য্য।"

বাবুতে বিবিতে যতক্ষণ কথা হইল, তিনটী বধূ আর বাবুর ভগ্নীটী ততক্ষণ বাবুর মুখপানে অনিমেষে চাহিয়া রহিলেন, বিবির মুখের দিকে চাহিলেন না। এইখানে আমাদের সামাজিক ব্যবহারের একটী ক্ষুদ্র তর্ক। হিন্দু-ব্যবহারানুসারে শ্বশুর, ভাসুর, মামা-শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের সম্মুখে আমাদের কুলবধূরা অনাবৃত-বদনে থাকেন না, যে তিনটী বধূ সেখানে উপস্থিত, তন্মধ্যে বড়বধূ ভিন্ন অপর দুটী বধূর ভাসুর ঐ বড়বাবু; ভাসুরের সম্মুখে ঐ দুটী বধূ গীত গাহিলেন, সপ্রতিভ-নয়নে ভাসুরের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, লজ্জায় জলাঞ্জলি দিলেন, অবগুণ্ঠনের মান রাখিলেন না, ইহা বড় চমৎকার। নূতন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অবগুণ্ঠনের ব্যবহার উঠিয়া যাইতেছে, সহরের অনেক গৃহেই এইরূপ দেখা যায়। এই একটী নূতন পরিবর্ত্তন। আর একটী পরিবর্ত্তন কিঞ্চিৎ মৃদুগতিতে হিন্দু-পরিবারমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। হিন্দু-রমণী গুরুজনের নাম ধরেন না, বঙ্গসমাজে বহুদিবসাবধি এই ব্যবহার প্রচলিত; অধুনা সেই ব্যবহার অল্পে অল্পে তিরোহিত হইতেছে। শ্বশুর, ভাসুর, মামাশ্বশুর প্রভৃতি নামের সহিত স্ত্রীলোকের সম্বন্ধ অল্প, কিন্তু আজকাল অনেক যুবতী কামিনী স্বামীর নাম ধরিয়া ডাকে, জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয়, "সাহেব-বিবির ব্যবহারে ঐরূপ চলে, আমাদের বেলায় কি দোষ? পতির নাম ধরিয়া ডাকিলে স্নেহ প্রগাঢ় হয়, প্রীতিভাব উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পায়; এই জন্যই সভ্যসমাজে

পতির নাম ধরিয়া ডাকিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; আমাদের দেশ হইতে পূর্ব্বের সেই অসভ্য রীতিটা উঠিয়া যাওয়াই ভাল।"

উত্তরও চমৎকার, ব্যবহারও চমৎকার! দুলাল দুলালীকে আদর করিবার সময়, সোহাগ করিবার সময়—কচি কচি নাম ধরিয়া ডাকা বড় সুখকর; সেই দৃষ্টান্তে স্বামীকে নাম ধরিয়া আদর করা ও সোহাগ করা অনেক অন্তঃপুরে আরম্ভ হইয়াছে। যে সমাজে এখন কেহ কাহারও কথার বাধ্য হইতে চাহে না, হিতকথা বুঝে না, ভাল কথা বলিলে বিপরীত ভাবিয়া লয়, সে সমাজের অধঃপতন আসন্ন। সাহেবেরা দয়া করিয়া, আমাদের নারীগণকে শিক্ষাদান করিয়া সভ্যশ্রেণীতে তুলিবার উপক্রম করিয়াছেন, নারীগণ সেই উপকার স্মরণ করিয়া সাংসারিক পুরাতন ব্যবহার পরিবর্জ্জন করিতেছে। যাঁহারা ইহাকে মঙ্গল ভাবিতে চাহেন, ভাবুন, আমরা দেখিতেছি ভয়ঙ্কর অমঙ্গল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আমাদের নারী-সংসার বিনষ্ট হইয়া যাইবে, নারীগণ আর বশীভূত থাকিতে চাহিবে না, সংসারের ধর্ম্মকর্ম্ম সমস্তই বিপর্য্যস্ত হইবে। আমাদের ভবিষ্যপুরাণে অনেক কথা আছে, পুরাণের কথা পুরাণেই থাকুক, এখনকার নবীন ব্যবহারশাস্ত্রে যাহা দর্শন করা যাইতেছে, তাহাতে আর ভবিষ্যৎগণনার বড় একটা অবসর থাকিতেছে না। বর্ত্তমানেই নারী-সংসারে অনেক বিপর্য্যয় পরিলক্ষিত হইতেছে। যাঁহারা এই বিপর্য্যয়ের উৎসাহদাতা, পরিণামে নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে অনুতাপ করিতে হইবে, ইহা আমরা এখন হইতেই বলিয়া রাখিতেছি।

সুধারাম চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সয়ারাম চট্টোপাধ্যায় আপন অন্তঃপুরের নারীবৈঠকে মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, অন্তঃপুরচারিণীগণকে শিখাইবার নিমিত্ত তিনি স্বয়ং যিশুভক্তির গীত রচনা করিয়া দিবেন; ধর্ম্মাত্মা মহানুভব প্রভু যিশু আমাদের মাথায় থাকুন, তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি থাকুক, তাঁহাকে লইয়া কথা হইতেছে না, কথা হইতেছে হিন্দু-অন্তঃপুরের ব্যবহার লইয়া। হিন্দু-সংসারের একজন অভিভাবক যিশু-গীত রচনা করিয়া বিবির হস্তে দিবেন, বিবি সে কথায় কোন উত্তর দিলেন না, বাবু হয় ত প্রাণে ব্যথা পাইলেন, যে উদ্দেশে জানানা-মিশনের বিবিরা হিন্দু-জানানায় সুকৌশলে ধর্ম্মপ্রচার করিতে যান, সয়ারামের অঙ্গীকারে সে উদ্দেশ্য পাছে বিফল হইয়া যায়, এই ভাবিয়াই

ঐ মিশনরী কুমারী চুপ করিয়া রহিলেন, সে দিনের সঙ্গীত ভঙ্গ হইল, বিবি চলিয়া গেলেন, সয়ারাম দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সুধারামের কনিষ্ঠা কন্যার নাম উমাকালী। সয়ারামের মুখপানে চাহিয়া উমাকালী বলিল, "দাদা! আমাদের এই বিবিটী বড় ভাল। উনি আমাদের সকলকে স্বর্গে লইয়া যাইবার আশা দেন। ইনি বলেন, যিশু-খৃষ্টের হস্তে স্বর্গের দ্বারের চাবী আছে, যিশুতে বিশ্বাস রাখিলে যিশু আমাদের অন্তকালে আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া স্বর্গদ্বারের চাবী খুলিয়া দিবেন, আমরা স্বর্গধামে প্রবেশ করিব, স্বর্গীয় পিতার স্বর্গীয় সিংহাসনের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইব, পিতার নিকটে যিশু আমাদের পরিচয় দিয়া দিবেন, আমরা মুক্তি পাইব! দাদা! এ সব কথা কি সত্য?"

দাদা উত্তর করিলেন, "পাঠ কর, পাঠ কর! ধর্ম্মকথা বুঝিতে অনেক সময় লাগে। বিবি যাহা বলেন, শুনিয়া শুনিয়া যাও, কোন কথার উত্তর দিও না। বিবি যদি তোমাকে—"

বড়বাবুর শেষ কথার ঐখানে বাধা দিয়া বড়বধূ একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমি বিবিকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব। পুস্তকে দেখিয়াছি, যিশু-খৃষ্ট আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার বয়ঃক্রম দুই সহস্র বৎসর পূর্ণ হইত না, পৃথিবীর বয়ঃক্রম অনেক, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গের দ্বারের চাবী কাহার হস্তে ছিল? আমার মনে হয়, পূর্ব্বে পূর্ব্বে স্বর্গের দ্বারে চাবী দেওয়া থাকিত না, দ্বার অবারিত, অনাবৃত থাকিত, যাহার ইচ্ছা হইত, সেই তখন স্বর্গে গিয়া স্বর্গীয় পিতার দর্শনলাভ করিতে পারিত। যিশুর জন্মের পর অথবা যিশুর মৃত্যুর পর অবধি ঐরূপ বাঁধাবাঁধি হইয়াছে, স্বর্গের দ্বারে চাবী পড়িয়াছে।"

অন্তরে হাস্য আনয়ন করিয়া, বাহিরে সকোপ ভ্রূভঙ্গী দেখাইয়া, অল্প তর্জ্জনস্বরে সয়ারাম বলিলেন, "জ্যাঠামী পরিত্যাগ কর, জ্যাঠামী রাখিয়া দাও, ধর্ম্মের নামে জ্যাঠামী শোভা পায় না। দিনবন্ধু মিত্র বলিয়া গিয়াছেন, 'পুরুষ জ্যাঠা সওয়া যায়, মেয়ে জ্যাঠা বড় বালাই।' লেখাপড়া শিখিতেছ, শিখিয়া লও, বিবি যাহা বলেন, শুনিয়া যাও, জ্যাঠামী দেখাইয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিও না। বিবি তোমাকে—"

হঠাৎ সেই ঘরে পূর্ব্বদিকের দ্বারের পার্শ্বে খুট খুট করিয়া কি শব্দ হইল, কথা বলিতে বলিতে সয়ারাম থামিয়া গেলেন। কে সেখানে কি শব্দ করিল, দেখিবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠিয়া, সেই দিকে গিয়া তিনি দেখিলেন, ফর্সা কাপড়-পরা কে একজন শীঘ্র শীঘ্র ছুটিয়া পলাইতেছে। ঘরের পার্শ্বে একটা ঘর, সেই ঘরের পরেই একটা বারান্দা, যে লোক পলাইতেছিল, দেখিতে দেখিতে সেই লোক বারান্দার দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। সয়ারাম তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। সুধারামের চতুর্থ পুত্রের নাম নিধিরাম, বয়স ঊনবিংশতি বর্ষ; পঞ্চম পুত্রের নাম মৃত্যুঞ্জয়, বয়স সপ্তদশ বর্ষ; এই দুইটী বালকের বিবাহ হয় নাই। তাহারা উভয়েই এক স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা করিতেছে। পূর্ব্বে প্রকাশ করা হইয়াছে, সুধারামের কনিষ্ঠ পুত্রটী হিন্দু-অন্তঃপুরে মিশনরী বিবির প্রবেশের রীতির উপর বড় চটা, নিজ বাড়ীতে সেইরূপ বিবি আসিয়া যুবতী কামিনীগণকে পড়ায়, গান শিখায়, যিশু-খৃষ্ট ভজায়, বয়স অল্প হইলেও মৃত্যুঞ্জয় সেটা সহ্য করিতে পারিত না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা যাহাতে উৎসাহ দেন, প্রকাশ্যরূপে তাহার উপর কথা কহিতে মৃত্যুঞ্জয়ের সাহস হইত না, কিন্তু মনে মনে গুমরিয়া গুমরিয়া পিতার নিকটে সে এক একবার মনের কথা প্রকাশ করিত। সুধারাম চট্টোপাধ্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠ বৃদ্ধলোক, কনিষ্ঠ পুত্রের কথায় তিনি কেবল নিশ্বাস ফেলিতেন, প্রতীকার করিতে পারিতেন না। কালের ছেলে, মাতা পিতার বাধ্য নয়, বিশেষতঃ আপনাদের পত্নীগণকে ইংরাজীতে পণ্ডিতা করিবার জন্য যাহারা বিবির নিকটে সমর্পণ করিয়াছে, তাহারা উপযুক্ত সন্তান, নিষেধ করিলে তাহারা শুনিবে না, লাভে হইতে বৃদ্ধবয়সে পুত্রের নিকটে অপমানিত হইতে হইবে, এই জন্য তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন, অসহ্য হইলেও মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেন না। শিক্ষাগৃহের দ্বারের পার্শ্বে খুট খুট শব্দ শুনিয়া সয়ারাম যখন দেখিতে যান, চিনিতে না পারিলেও যাহাকে অল্প অল্প দেখিতে পান, সে অপর আর কেহই নহে, তাঁহারই কনিষ্ঠ সহোদর মৃত্যুঞ্জয়।

মৃত্যুঞ্জয় কখন্ আসিয়া গুপ্তভাবে দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল, ঘরের লোকেরা তাহা জানিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ বিবিটী যখন প্রবেশ করেন, তাহার অব্যবহিত পরেই মৃত্যুঞ্জয় অন্যদিক্ দিয়া আসিয়া ঐ গুপ্ত স্থানে

আশ্রয় লইয়াছিল। বিবি যাহা যাহা পড়াইলেন, যাহা যাহা উপদেশ দিলেন, যেরূপ সঙ্গীত হইল, দাদা আসিয়া যাহা যাহা বলিলেন, গোপনে থাকিয়া মৃত্যুঞ্জয় তৎসমস্তই শুনিয়াছিল। বিবি চলিয়া যাইবার পর উমাকালী দাদাকে যে যে কথা জিজ্ঞাসা করিল, বড়বধূ যে যে কথা তুলিলেন, দাদা যে কথার উত্তর দিতেছিলেন, একমনে কাণ পাতিয়া মৃত্যুঞ্জয় তাহাও শুনিতেছিল; আর শুনিতে না পারিয়া যখন চলিয়া যাইবার উপক্রম করে, সেই সময় কপাটের গায়ে করস্পর্শ হওয়াতে খুট খুট শব্দ হয়; দাদা আসিয়া তাহাকে দেখিতে পাইবেন, সেই ভয়ে শীঘ্র শীঘ্র সরিয়া যাইতেছিল, গৃহটা প্রায় পার হইয়াই গিয়াছিল, সেই কারণেই সয়ারাম তাহাকে চিনিতে পারেন নাই।

যে ঘরে মৃত্যুঞ্জয় প্রচ্ছন্ন ছিল, সে ঘরের দ্বার-গবাক্ষ বন্ধ, তাহার উপর কৃষ্ণবর্ণ বনাতের পর্দ্দা ফেলা, দিবাভাগেও অন্ধকার; সহোদর ভ্রাতাকে চিনিতে না পারিবার উহাও এক প্রধান কারণ; কেবল কাপড় পড়া একটী নরকলেবরের ছায়ামাত্র সয়ারামের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। স্পষ্ট চিনিতে না পারিলেও সয়ারাম অনুমানে বুঝিয়াছিলেন মৃত্যুঞ্জয়। কেন না, ঐরূপ স্ত্রীশিক্ষার প্রতি মৃত্যুঞ্জয়ের বিরাগ; কিরূপ শিক্ষা হয়, কিরূপ কথা হয়, কিরূপ গীত হয়, গোপনে দাঁড়াইয়া তাহা শ্রবণ করা সে বাড়ীর মধ্যে কেবল মৃত্যুঞ্জয়েই সম্ভবে। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াও সয়ারামের নিশ্চিত বিশ্বাস দাঁড়াইল মৃত্যুঞ্জয়। সেই তুচ্ছ কারণে মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতি সয়ারামের কোপ। জ্যেষ্ঠ সহোদরের কোপে পড়িতে হয়, মৃত্যুঞ্জয় তেমন কুকার্য্য কিছুই করে নাই, তথাপি সয়ারামের কোপ। সেই দিন রাত্রিকালে মৃত্যুঞ্জয়কে নির্জ্জনে ডাকিয়া সয়ারাম সগর্জ্জনে বলিলেন, "তুই ছোঁড়া তখন লুকিয়ে লুকিয়ে সেখানে কি শুন্‌ছিলি? মেয়েমানুষের কাছে মেয়েমানুষেরা লেখা-পড়া শিক্ষা করে, সেখানে লুকাচুরি কি আছে? কর্ত্তা বুঝি তোকে ঐ রকম লুকাচুরি শিক্ষা দিয়াছেন, তাই বুঝি তুই কর্ত্তার মনোরঞ্জনের জন্য ঐ কাজ করেছিস্? কর্ত্তা আর কতদিন? দিনকতক পরে তোকে আমার খর্পরে পড়্‌তে হবে, তা তুই জানিস্? খবরদার! ফের যদি সেই জায়গায় তোকে আমি দেখি, নিস্তার থাক্‌বে না। তোরও থাক্‌বে না, কর্ত্তারও থাক্‌বে না।"

"কর্ত্তা কিছুই জানেন না, গান শুনিতে আমি ভালবাসি, সেইজন্য—" অতি মৃদুস্বরে এই কটী কথা বলিতে বলিতে মাথা হেঁট করিয়া মৃত্যুঞ্জয় সে স্থান হইতে সরিয়া গেল, কিন্তু সয়ারামের রাগ পড়িল না। রাগের মাথায় তিনি বলিয়াছেন, "কর্ত্তারও নিস্তার থাকবে না।"—রাগের মাথায় কেন, সহজ মাথাতেও কেহ কেহ আজকাল ঐরূপ উক্তি করিয়া থাকে। অনেক পরিবারের মধ্যে পিতা-পুত্র সম্বন্ধে ঐ প্রকার ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। পিতা যদি চাকরী করেন কিম্বা পেন্‌শন্ পান, তাহা হইলে পুত্র বরং ইচ্ছা করে, পিতা কিছুদিন বাঁচিয়া থাকুন; পিতার যদি জমীদারী কিম্বা প্রচুর নগদ টাকা থাকে, তাহা হইলে উপযুক্ত পুত্র শীঘ্র শীঘ্র পিতার মৃত্যুকামনা করেন। পিতা মরিলেই পুত্র জমীদার হইবেন, নগদ টাকার অধিকারী হইবেন, এইরূপ আশা পুত্রের হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ জাগরূক থাকে। সয়ারামের হৃদয়েও সেই আশা জাগিত। তাঁহার পিতা একজন জমীদার; জমীদারী ছাড়া তাঁহার ৫০।৬০ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ আছে। পিতার মৃত্যু হইলেই সেইগুলি তাঁহাদের হস্তে আসিবে, আপন অংশ বণ্টন করিয়া লইয়া সয়ারাম ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারিবেন, এই জন্যই শীঘ্র শীঘ্র পিতাকে লোকান্তরে পাঠাইতে তিনি ইচ্ছা করেন। কনিষ্ঠ পুত্রকে পিতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন, সে কারণেও তাঁহার ঈর্ষা। এ সকল কথা এখানকার নয়, সময়ান্তরে প্রকাশ পাইবে।

সাতমাস কাল বিবি আসিয়া বধূতিনটীকে আর কন্যাটীকে শিক্ষা দিলেন; ছাত্রীরা যাহার যেমন বুদ্ধি, সে তদনুরূপ শিক্ষা করিল। একদিন বৈকালে একটীর বদলে দুটী বিবি উপস্থিত। যিনি প্রথমাবধি আসিতেছিলেন, তাঁহার নাম মিস্ লভিং, যিনি নূতন আসিলেন, তাঁহার নাম মিস্ ডার্লিং। নূতন বিবিটী পুরাতন বিবি অপেক্ষা বয়সে কিছু ছোট। তাঁহারা উভয়েই ছাত্রীদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। শিক্ষাদান চলিতেছে, এমন সময় বড়বাবু আসিলেন। ইতস্ততঃ চাহিয়া চাহিয়া তিনি দেখিলেন, দুটী বিবি। তিনি বড়বিবিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটী কে?" বিবি উত্তর করিলেন, "সম্পর্কে এটী আমার ভগ্নী হয়, সঙ্গীতবিদ্যায় আমার অপেক্ষা ইহার পটুতা অধিক, তন্নিমিত্তই ইহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। হিন্দুসুরে গীত গাওয়া

ইহার অভ্যাস। আপনি গীত রচনা করিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন, তাহাই দিবেন, ইহার দ্বারা সেই সকল গীতের উত্তমরূপ আলাপ হইতে পারিবে।"

ছোট বিবির মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া সয়ারাম সম্মতি জানাইলেন, সেই রাত্রেই তিনি পাঁচটী গীত রচনা করিয়া রাখিলেন, পরদিন মিস্ ডার্লিঙের হস্তে সেইগুলি প্রদান করিলেন; ডার্লিং কেমন গাহিতে পারেন, কেমন শিখাইতে পারেন, মহলা লইলেন; মহলা লইয়া খুসী হইলেন। তদবধি দস্তুরমত কার্য্য চলিতে লাগিল। আর পাঁচমাসে অতিক্রান্ত, বৎসর পূর্ণ।

বড়বধূর নাম পদ্মাবতী, দ্বিতীয়া ক্ষীরোদকুমারী, তৃতীয়া নরেশনন্দিনী। তিনটী বধূই সুন্দরী; তন্মধ্যে নরেশনন্দিনী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রূপবতী;—স্বর্ণহারে হীরকের ধুকধুকি। উমাকালীও সুন্দরী বটে, কিন্তু তাঁহার মুখখানি সর্ব্বক্ষণ ম্লান। সুধারাম চট্টোপাধ্যায় কুলীন ব্রাহ্মণ; তিনটী কন্যাকেই তিনি কুলীন পাত্রে সম্প্রদান করিয়াছেন; জ্যেষ্ঠ ও দ্বিতীয় জামাতা কিছু কিছু লেখা-পড়া জানে, ২০।২৫ টাকা বেতনে কলিকাতার সদাগরী আফিসে চাকরী করে, তাহারা পরিবার লইয়া পল্লীগ্রামের বাটীতে রাখিয়াছে, বৎসরে একবার করিয়া পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেয়; কনিষ্ঠ জামাতা মূর্খ, দেশে তাহার তাদৃশ সম্পত্তিও নাই, সুতরাং পরিবার লইয়া যাইতে পারে না, দুই একবার শ্বশুরালয়ে আসিয়া, দুই একদিন থাকিয়া, দুটী একটী টাকা লইয়া বিদায় হয়; শ্বশুর-শাশুড়ী ও শ্যালকেরা তাহাকে দেখিতে পারেন না, যত্নও করেন না; সেই কারণে উমাকালী মনে মনে বড় কষ্ট পায়; সেই কারণেই পিত্রালয়বাসিনী, সেই কারণেই সর্ব্বদা ম্লানমুখী।

অন্তঃপুর-শিক্ষার যেরূপ পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিতে যেরূপ ফল হয়, সেই পদ্ধতির শিক্ষার সুধারামের অন্তঃপুরে সেইরূপ ফল ফলিতে লাগিল। শিক্ষা আরম্ভ হইবার অগ্রে বধূরা শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করিত, গৃহকার্য্য করিত, স্বামীগণের বশীভূত হইয়া থাকিত, বিবির কাছে একবৎসর শিক্ষা লাভ করিয়া তাহারা আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিল;—সমস্তই উল্‌টাইয়া গেল। নরেশনন্দিনী ছোট বিবিটীর প্রতি অতিশয় অনুরক্তা;—নরেশনন্দিনী গান ভালবাসে, ছোট বিবিটীও বেশ গায়, কেবল সেইজন্যই অনুরক্তি, এমন বিবেচনা করিতে হইবে না;—তাদৃশ অনুরাগের আর একটী গুহ্য কারণ আছে। যতক্ষণ ফল প্রসূত না হয়,

ততক্ষণ পর্য্যন্ত পুষ্পের আদর; পুষ্প দেখিয়াই লোকে আনন্দ অনুভব করে, আঘ্রাণ গ্রহণ করে, নির্গন্ধ কুৎসিত পুষ্প হইলে ঘৃণা করিয়া থাকে। নরেশ-নন্দিনীর অনুরাগ-পুষ্পে কিরূপ ফল ফলে, তাহা দর্শনের প্রতীক্ষা করা উচিত। উমাকালীও মিস্ ডার্লিংএর প্রতি মনে মনে অনুরাগিণী। স্ত্রীলোকের প্রতি স্ত্রীলোকের অনুরাগের অর্থ স্বতন্ত্র, ভাবও স্বতন্ত্র, অতএব উমাকালীর ভ্রাতৃ-জায়ারা সে অনুরাগ লক্ষণে কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাব মনে আনয়ন করেন না; করেন না বটে, কিন্তু নরেশনন্দিনীর ভাবভঙ্গী যেন একটু কেমন কেমন বোধ হয়।

যাহার যেরূপ ভাগ্য-লিপি, তাহার ভাগ্যে সেইরূপ ফল ফলে, ভাগ্যবাদীরা চিরদিন এই বাক্যে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। সুধারাম চট্টোপাধ্যায় ভাগ্য-বান্ পুরুষ, বিষয়-সংসারে প্রবেশ করিয়া অবধি তিনি কখনও অসৌভাগ্যের কবলে পতিত হন নাই, পাঁচটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহা অবশ্য সৌভাগ্যের ফল, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনটী পুত্র তাঁহার মতের বিরোধী হইয়াছে, কথার অবাধ্য হইয়াছে, কার্য্যে স্বেচ্ছাচার দেখাইতেছে, বৃদ্ধ সুধারাম তজ্জন্য মনস্তাপে দগ্ধ হন। নিত্য মনস্তাপ বিষম রোগ; সংসারের শান্তিভঙ্গ হওয়াতে নিত্য মনস্তাপে দগ্ধ হইয়া বৃদ্ধ সুধারাম দারুণ গুল্ম-রোগে শয্যাগত হইলেন; চিকিৎসা অনেক প্রকার হইল, কিন্তু কিছুতেই উপকার হইল না। যে তিনটী পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত, তাঁহারা পিতার রুগ্ন-শয্যার নিকটে একদিন এক মুহূর্ত্তও উপস্থিত হইলেন না, ঔষধপথ্যের ব্যবস্থার নিমিত্ত কোন চেষ্টাও করিলেন না; একমাস শয্যাগত থাকিয়া পঞ্চ পুত্রের নিদারুণ যন্ত্রণায় অরক্ষিতের ন্যায় নিজ শয়ন-গৃহেই প্রাণপরিত্যাগ করিলেন।

হিন্দুশাস্ত্রমতে উপরতের শ্রাদ্ধশান্তি করিতে হয়, একাদশ দিবসে শ্রাদ্ধ হইল, কিন্তু সুধারাম যেরূপ বিত্তশালী ও সম্ভ্রমশালী মহৎলোক, শ্রাদ্ধে তদনুরূপ কোন সমারোহ হইল না। তাঁহার কার্য্য ফুরাইয়া গেল। জ্যেষ্ঠ পুত্র সয়ারাম,—সয়ারাম মনে করিলেন, সংসারের একটা কণ্টক ঘুচিল। পিতার মৃত্যুর পর অবধি মাতার প্রতি এবং কনিষ্ঠ মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতি তাঁহার অযত্ন বাড়িতে লাগিল।

সয়ারাম এখন সংসারের কর্ত্তা; সংসারের সকল বিষয়েই তিনি ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া দিলেন। নিধিরাম ও মৃত্যুঞ্জয় কলেজে পড়িতেছিল, জ্যেষ্ঠের ব্যয়সঙ্কোচের খাতিরে তাহাদের পড়া বন্ধ হইল।

ছেলেদের পড়া বন্ধ হইল, কিন্তু মেয়েদের শিক্ষায় সয়ারামের উৎসাহ বাড়িল। নানা প্রকার পুস্তক এবং বিবিধ বাদ্যযন্ত্র ক্রয় করিয়া দেওয়া হইল। সপ্তাহে একদিন করিয়া শিক্ষয়িত্রী বিবি দুটীকে নিশা-ভোজের নিমন্ত্রণ করা হয়, ইংরাজী হোটেলের খাদ্যসামগ্রীর সহিত ভাইনম্ রুবলম্, ভাইনম্ জেলিকম্ এবং সুমিষ্ট ক্লারেট্ প্রভৃতি গুপ্তভাবে আইসে। স্বেচ্ছাচার-বিরোধী বৃদ্ধ কর্ত্তা সংসার হইতে বিদায় হইয়া গিয়াছে, তবে আর কাহার ভয়ে গুপ্তভাব, তাহা জানা যায় না; ভয়েই হউক অথবা অন্য কারণেই হউক, ঐ সকল জিনিস প্রকাশ্যরূপে আসিত না। বিবিদের নাম করিয়া যাহা যাহা আসিত, তিনটী বাবু আর তিনটী বধূ তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইতেন। মনে স্ফূর্ত্তি ছিল না বলিয়া উমা-কালী সে সকল জিনিস স্পর্শ করিত না। যে যে রাত্রে ভোজ হইত, সেই সেই রাত্রে সর্ব্বকণ্ঠমিলিত সঙ্গীতধ্বনি সমবেত বাদ্যযন্ত্রধ্বনিকে ছাপাইয়া উঠিত; আধখানা বাড়ী পর্য্যন্ত কাঁপিত।

মহাগুরুনিপাতের পূর্ণ বর্ষকাল ব্যাপিয়া স্ত্রী-পুত্রের কালাশৌচ থাকে; অর্দ্ধবর্ষ পূর্ণ হইবার পর একদিন প্রকাশ পাইল, তিনটী বধূ আর উমাকালী একদিন উষাকালে একজন দাসী সঙ্গে করিয়া গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল, বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত আর ফিরিয়া আসিল না। পাঁচ জনে একসঙ্গে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছে, এমন কখনও সম্ভব হইতে পারে না, সুতরাং অন্বেষণ করা হইল, সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত সে অন্বেষণে কোন ফল হইল না। সন্ধ্যার পর তাহারা ঘরে ফিরিয়া আসিল। সমস্ত দিন তাহারা কোথায় ছিল? যাহারা অদৃশ্য হইয়া-ছিল, তাহারা নিজে নিজে প্রকাশ না করিলে সে গূঢ় প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? গঙ্গার প্রতি যাহাদের ভক্তি ছিল না, তাহারা গঙ্গা-স্নানে কেন গিয়াছিল? পুরুষ হইলে হয় ত উত্তর পাওয়া যাইত, স্বাস্থ্যরক্ষার অনুরোধে; হিন্দু স্ত্রীলোকের মুখে সে উত্তর শোভা পায় না; সুতরাং প্রশ্ন কেবল প্রশ্নেই পর্য্যবসিত। অষ্টাহ-কাল ঐ রহস্য অপ্রকাশিত ছিল, তাহার পর সেই সঙ্গিনী দাসীর মুখে সয়ারাম একটা নিগূঢ় কথা শুনিলেন, শুনিয়া তাঁহার আহ্লাদ জন্মিল না, দোষভাবও মনে আসিল না, তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। যাহা তিনি শুনিলেন, মনে মনে চাপিয়া রাখিলেন, কাহারও কাছে প্রকাশ করিলেন না; প্রকাশ করিতে দাসীকেও নিষেধ করিয়া দিলেন।

আরও তিন মাস। বিবিরা নিত্য নিত্য আইসেন, নিত্য নিত্য নূতন নূতন পাঠের আলোচনা হয়, নূতন নূতন গাত হয়, নূতন নূতন কার্পেটের পুতুল প্রস্তুত হয়, নূতন নূতন খানা হয়; সূক্ষ্মকথা ধরিয়া বিচার করিতে হইলে বলা যাইতে পারে, শিক্ষার অংশ অপেক্ষা আমোদের অংশই অধিক।

তিনটী বধূ আপনাদের পাঠ-গৃহে এক একখানি পুস্তক হস্তে লইয়া বসিয়া আছেন, উমাকালী হারমোনিয়ম বাজাইতেছেন, বিবিরা সেখানে উপস্থিত নাই। সহাস্য-বদনে সয়ারাম আসিয়া দর্শন দিলেন। হারমোনিয়ম থামিল, যাঁহাদের হস্তে পুস্তক ছিল, পুস্তক মুড়িয়া রাখিয়া তাঁহারা পলকশূন্য-নয়নে বড়বাবুর মুখের দিকে চাহিলেন। কি তাঁহাদের মনে আছে, কি যেন তাঁহারা বলিবেন, অনুমানে এইরূপ বুঝিয়া, নিকটস্থ একখানি আসনে বড়বাবু বসিলেন। তাঁহারও চক্ষু বধূগুলির চক্ষের দিকে স্থির।

দুটী বধূর মুখপানে এক একবার দৃষ্টিপাত করিয়া, বড়বাবুর মুখের দিকে মুখ ফিরাইয়া, বড়বধূ কহিলেন, "তুমি যদি রাগ না কর, তাহা হইলে আজ আমি তোমাকে একটী কথা বলি।"—কৌতুকে উৎফুল্ল হইয়া, সকলের দিকে চাহিয়া, সকৌতুকে বড়বাবু কহিলেন, "বুঝিতেছি, যেন তোমার নিজের কথা নহে, যাঁহারা এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের উকীল হইয়া কোন কথা তুমি বলিতে চাও। তোমার কথাগুলি আমাকে বড় মিষ্ট লাগে, মিষ্টকথায় কেহ কখনও রাগ করে না, আমি রাগ করিব না, যাহা বলিতে তোমার ইচ্ছা হয়, স্বচ্ছন্দে বল।"

হাস্য করিয়া পদ্মাবতী বলিলেন, "ওকালতী আমি শিক্ষা করি নাই, উকীল হইয়া কাহারও কথা আমি বলিব না, আমার নিজের কথাও বলিব না, গুটীকতক ধর্ম্মকথা বলিব। বিবি বলেন, তাঁহাদের ধর্ম্মে ঐহিক সুখ নাই, পারত্রিক মঙ্গলের কামনাতেই তাঁহারা প্রভু যিশু-খৃষ্টের আরাধনা করেন। যিশু-খৃষ্ট জন্মগ্রহণ করিয়া স্বয়ং ঐহিক সুখাভিলাষে সংসারের কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই; কেবল ভক্তমণ্ডলীর উপকারের নিমিত্ত পবিত্র উপদেশ-দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন; পাপীলোকের পরিত্রাণের জন্য তিনি আপনার রক্ত দান করিয়াছেন। তাদৃশ ধর্ম্মাত্মা ইহসংসারে অতি বিরল। তাঁহার গুণে বশীভূত হইয়া, তাঁহার স্বর্গীয় পিতা তাঁহার হস্তে স্বর্গের

চাবী রাখিয়া দিয়াছেন; তাঁহার তুল্য তাঁহার পিতার বিশ্বাসভাজন আর কেহই নাই। আমরা যদি প্রভু যিশুর আরাধনা করিতে—"

সুধাবৃষ্টি হইতে হইতে কি বৃষ্টি হইবে, ভাব বুঝিতে পারিয়া বড়বাবু কহিলেন, "আর বলিতে হইবে না, তোমার বক্তব্যের মর্ম্ম আমি বুঝিয়াছি। তোমাদের বিবি তোমাকে সকল কথা ঠিক করিয়া বলেন নাই। যিশু-খৃষ্ট সন্ন্যাসী ছিলেন, জগৎ ইহা অস্বীকার করেন না, কিন্তু যাঁহারা যিশুখৃষ্ট-ভক্ত, তাঁহারা ঐহিক সুখের অভিলাষী নহেন, এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত বিরল যে সকল ইংরাজ আমাদের দেশে শুভাগমন করিয়াছেন, সচরাচর দেখা যায়, তাঁহাদের অধিকাংশই ঐশ্বর্য্য-ভোগে একান্ত আসক্ত। প্রভু যিশু যাহা করিতেন, যেরূপ উপদেশ দিতেন, এখনকার ভক্তমণ্ডলী সেরূপ কার্য্য করেন না, করিতে পারেন না, উপদেশমতে চলিতেও তাঁহাদের সাধ্য নাই। অপরকে এক কথা বলিয়া নিজে তদনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইতে না পারিলে শুষ্ক উপদেশে কোন ফল হয় না। বিবি তোমাকে 'হ—য—ব—র—ল' বুঝাইয়াছেন।"

ঊর্দ্ধমুখী হইয়া উমাকালী বড়-দাদার ঐ সকল কথা শুনিতেছিল, বড়বা একটু থামিবামাত্র সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "হ—য—ব—র—ল কি দাদা?"

গম্ভীরবদনে বড়বাবু বলিলেন, "বঙ্গীয় বর্ণমালার পঞ্চবর্গ সমাপ্ত হইলে, য র ল ব শ ষ স হ, এই আট অন্ত্যবর্ণ লিখিবার রীতি আছে; সেই রীতিই বিশুদ্ধ এবং সর্ব্বত্র প্রচলিত; সেইরূপ না লিখিয়া কতক উলট-পালট করাবু কতক পরিত্যাগ করা যাহাদের অভ্যাস, তাহারা বিধিলঙ্ঘন করে; বিধি-লঙ্ঘনের ফলকেই 'হ-য-ব-র-ল' বলে।"

উমাকালী বলিল, "বুঝিতে পারিলাম না।"—বড়বাবু বুঝাইয়া দিলেন,—"অন্তঃস্থ য হইতে হ পর্য্যন্ত আটটী অক্ষর; হ-য-ব-র-ল তে পাঁচটী অক্ষর আছে, তাহাও উলট-পালট। অগ্রে হ, তাহার পর য, তাহার পর ব, তাহার পর ঠিক ঠিক র, আর ল;—শ ষ স, এই তিনটী বর্ণ ইহার মধ্যে বিলুপ্ত। বুঝিবার অত্যন্ত গোলমাল। কেহ কোন বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলেই দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, হ-য-ব-র-ল। তোমাদের বিবি তোমার বেদিদিকে যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহাও ঐরূপ হ-য-ব-র-ল।"

একটু মুখ ভারী করিয়া পদ্মাবতী কহিলেন, "আমি তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, তাহার উত্তর হইল কৈ? বিবি আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইতে পারেন নাই, সেইজন্য বিবির নিন্দা করা তোমার উচিত হইতে পারে, আমার উচিত হয় না। আমার আসল কথার উত্তর কর। আমরা যদি প্রভু যিশুর আরাধনা করিতে—"

পুনরায় বাধা দিয়া বড়বাবু কহিলেন, "হাঁ হাঁ, সে কথা আমার মনে আছে। আরাধনা করা ভাল, কিন্তু ইহলোকের সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল পরলোকের সুখের মুখ চাহিয়া থাকা এ দেশের সন্ন্যাসিগণেরই শোভা পায়, খৃষ্টধর্ম্মে আধুনিক খৃষ্টানগণের সেটা কেবল মুখের কথা মাত্র। যিশু-খৃষ্ট সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারভোগের কোন বিষয়েই লিপ্ত হইতে—"

সয়ারামের কথা সমাপ্ত হইবার অগ্রেই বিবি দুটী দর্শন দিলেন। গৃহ-প্রবেশের পূর্ব্বে বাহির হইতে তাঁহারা যিশুখৃষ্টের নাম শুনিয়াছিলেন; প্রবেশ করিয়াই বড়বাবুর দিকে চাহিয়া বড় বিবি কহিলেন, "প্রভু-সম্বন্ধে আপনাদের কি কথা হইতেছিল?"

পূর্ব্বাঙ্গ গোপন রাখিয়া বড়বাবু ত্বরিত-স্বরে উত্তর করিলেন, "প্রভুর বৈরাগ্যযোগের কথা। মনুষ্যকে বৈরাগ্যযোগ শিক্ষা দিবার প্রয়াসে প্রভু যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, মনুষ্য তাহা পালন করিতে পারিতেছে না, সেই কথাই আমি বুঝাইতেছিলাম।"

মিস্ লভিং ঐ উত্তরটী ভাল করিয়া বুঝিলেন কি না বুঝিলেন, তিনিই জানেন, কিন্তু তাঁহার মুখখান কিছু গম্ভীর হইল; কিঞ্চিৎ কুমস্বরে তিনি প্রশ্ন করিলেন, "বিশ্বাসী মনুষ্যেরা প্রভুর উপদেশ পালন করিতে পারিতেছে না, কি লক্ষণে আপনি তাহা বুঝাইলেন?"

সয়ারামের হৃদয়ে কিঞ্চিৎ ভয়ের সঞ্চার হইল; তৎক্ষণাৎ সে ভয়টুকু অন্তরে রাখিয়া নির্ভয়ে তিনি উত্তর করিলেন, "লক্ষণ অনেক আছে, তন্মধ্যে একটী লক্ষণ আমি বুঝাইব। প্রভু যিশু আপন শিষ্যগণকে সমদর্শিতা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, ইদানীং আমরা এখানে এমন অনেকগুলি ভক্ত দেখিতে পাই, তাঁহারা এ দেশের লোককে কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া শৃগাল-কুক্কুরের ন্যায় ঘৃণা করেন, বিনা উত্তেজনায় এ দেশের লোককে তাঁহারা নির্ঘাত প্রহার করেন।"

বিবি একটু শুষ্ক হাস্য করিলেন। সে প্রসঙ্গে আর কোন কথা উঠিল না। কি যেন চিন্তা করিতে করিতে সয়ারাম একটু পরে সে গৃহ হইতে বাহির হইলেন, বিবিরা কর্ত্তব্যকার্য্যে মনোযোগ দিলেন।

এই ঘটনার পর একমাস অতীত হইল। পূর্ব্বে যেমন একবার গঙ্গাস্নানের অছিলায় বিবির ছাত্রীরা নিশাশেষে বাটী হইতে বাহির হইয়াছিল, পুনর্ব্বার সেইরূপ ঘটনা। সেবারে আর দাসী সঙ্গে রহিল না, কেবল সেই চারিটী কুলবালা। দিনমান গেল, রাত্রি আসিল, কুলবালারা ফিরিল না; রাত্রি গেল, পুনরায় প্রভাত হইল, কুলবালারা ঘরে আসিল না; অপরাহ্ণ আসিল, বিবিদের আসিবার সময় হইল, বিবিরা আসিলেন না। সয়ারাম উদ্বিগ্ন হইলেন। মিস্ লভিং যে বাড়ীতে থাকিতেন, সে বাড়ীখানি সয়ারামের জানা ছিল; সেইদিন সন্ধ্যার পর বাড়ীর কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি একাকী সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। অভাবনীয় দৃশ্য! বিবির বাড়ীতে গিয়া সয়ারাম যাহা দেখিলেন, নিম্নভাগে তাহা বিবৃত হইতেছে।

বিবির বসিবার ঘরখানি নিতান্ত অপ্রশস্ত ছিল না, সচরাচর মিশবিবিদের ঘরগুলি যে ভাবে সজ্জিত থাকে, ঐ ঘরখানিও কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষে সেই ভাবে সুসজ্জিত। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সয়ারাম দেখিলেন, তাঁহার বাড়ীর তিনটী কুলবধূ আর তাঁহার ভগ্নীটী চারিখানি বেত্রাসনে বসিয়া রহিয়াছে, গুটীকতক বিবি আর তিনটী সাহেব মণ্ডলাকারে তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন; হাস্য-কৌতুকে বাক্যালাপ চলিতেছে।

দৃশ্যদর্শনে সয়ারামের নয়ন নিমেষশূন্য, চরণ গতিশূন্য, অঙ্গ স্পন্দনশূন্য এবং রসনা বাক্যশূন্য। নারীমণ্ডলীর মধ্যে যে তিনটী সাহেব ছিলেন, তাঁহাদের একজনের মস্তকে পক্ক কেশ, একজন প্রায় পঞ্চবিংশতি-বর্ষীয়, তৃতীয়জন বালক, তাহার বয়ঃক্রম ষোড়শ কিম্বা সপ্তদশ বর্ষের অধিক বোধ হইল না; মুখখানি কোমলাঙ্গী স্ত্রীলোকের ন্যায় পূর্ণায়ত, দিব্য লাবণ্যযুক্ত, ওষ্ঠোপরি গোঁফের রেখা পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না। সেই বালক অন্যদিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু স্বরে হাসিতেছিল। সেই বালকের অনতিদূরেই নরেশনন্দিনী,—নরেশনন্দিনীর বামপার্শ্বে উমাকালী।

সয়ারামকে দর্শন করিয়া সকলেই এককালে নির্ব্বাকে তাঁহার মুখপানে চাহিলেন, সকলের চক্ষুই সয়ারামের চক্ষে সমসূত্রে নিক্ষিপ্ত। যাঁহার মস্তকে পক্ক

কেশ, ক্ষণেক পরে মৌনভঙ্গ করিয়া, সেই সাহেবটী ইংরাজী ভাষায় সয়ারামকে বসিতে বলিলেন। কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিতে চাহিতে পার্শ্বের একখানি শূন্য আসনে সয়ারাম উপবেশন করিলেন। উপবেশনের অগ্রে মণ্ডলীর দিকে চাহিয়া, ললাটে করস্পর্শ করিতে ভুলিলেন না, সেই প্রক্রিয়াতেই সাহেব-বিবিগণকে সেলাম করা হইল।

আসনে উপবিষ্ট হইয়া সয়ারাম একে একে সমবেত মণ্ডলীর সুন্দর সুন্দর বদনগুলি অভিনিবেশপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলেন, সকল মুখ চিনিতে পারিলেন না, আপনার পরিবারের চারিখানি মুখ অবশ্যই চিনিলেন, যে দুটী বিবি তাঁহার বাড়ীতে পড়াইতে যাইতেন, তাঁহাদের একজনের—মিস্ লভিঙের মুখখানিও চিনিলেন, ছোট বিবিটীকে দেখিতে পাইলেন না। মুখে কথা নাই, অনিমেষে চাহিয়া প্রায় দশ মিনিট কাল তিনি চুপ্‌টী করিয়া বসিয়া আছেন, পূর্ব্বকথিত বৃদ্ধ সাহেবটী ধীর, বিনম্র, মিষ্ট বচনে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; সংক্ষেপে তদ্রূপ বিনম্রবচনে সয়ারাম সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন। প্রশ্নোত্তর উভয়েরই ইংরাজী ভাষায় নিষ্পন্ন হইল, ইহা বলা বাহুল্য।

সাহেব কহিলেন, "যাঁহাদের অন্বেষণে আপনি আসিয়াছেন, তাঁহারা এইখানেই উপস্থিত, তাঁহাদিগকে আপনি জিজ্ঞাসা করুন, কি অভিপ্রায়ে তাঁহারা এখানে আসিয়াছেন; আপনার সঙ্গে ইহাঁরা যদি যাইতে চাহেন, লইয়া যাইতে পারেন।"

সাহেবের অনুমতিগ্রহণ পূর্ব্বক আসনখানি সম্মুখদিকে একটু সরাইয়া লইয়া, পদ্মাবতীকে সম্বোধন করিয়া সয়ারাম কহিলেন, "গৃহত্যাগ করিয়া কি কারণে তোমরা এখানে আসিয়া রহিয়াছ? গৃহে চল।"

পদ্মা।—সে গৃহে আর আমি যাইব না; ইহাই এখন আমার গৃহ।

সয়া।—আমাকে তবে কি পরিত্যাগ করিবে?

পদ্ম।—তুমি যদি আমার হও, যে পথে আমি আসিয়াছি, যে ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে আমি প্রস্তুত হইয়াছি, সেই পথে তুমি আইস, সেই ধর্ম্ম তুমি গ্রহণ কর, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না।

সয়া।—তোমার পুত্র?

পদ্মা।—আমার পুত্র আমাকে যদি তুমি দিতে ইচ্ছা কর, দিতে পার; যদি ইচ্ছা না হয়, তুমি যদি নিজে এ পথে না আইস, পুত্র তুমি রাখিয়া দিও।

সয়া।—যাহাকে তুমি প্রসব করিয়াছ, এক কথায় তাহার মায়া কাটাইবে?

পদ্মা।—মায়া কি? সংসারের মায়া সমস্তই মিথ্যা। আমি আর মায়ার বশীভূত হইব না। পরিত্রাণের পথে মায়া বিষম কণ্টক; আমি এখন পরিত্রাণের পথে অগ্রসর হইব।

সয়া।—তোমরা চারিজনে আসিয়াছ, চারিজনেরই কি একরূপ অভিপ্রায়?

পদ্মা।—আমার কথা আমি বলিলাম, অপরের কথা আমি বলিতে পারিব না, তুমি জিজ্ঞাসা কর।

সয়া।—সে জিজ্ঞাসায় আমার পূর্ণ অধিকার নাই। পুনরায় আমি আসিব। এখন তোমার প্রতি আমার আর একটী প্রশ্ন।—তোমার শাশুড়ী গৃহে রহিয়াছেন, তাঁহার সেবা-ভক্তির জন্য তোমার কি গৃহে যাওয়া উচিত কার্য্য নহে?

পদ্মা।—উচিত কার্য্য হইলেও হিদেন-পরিবারে আমি মিশিতে যাইব না। শাশুড়ী যদি আমার ধর্ম্মে দীক্ষিতা হন, তুমি যদি আমার ধর্ম্মে দীক্ষিত হও, আমার পুত্রকে আমার ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া দাও, তাহা হইলে—

সয়া।—তোমার ধর্ম্ম? তুমি কি তবে নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছ?

পদ্মা।—হই নাই, আগামী রবিবার আমার জল-সংস্কার হইবার দিন ধার্য্য হইয়াছে।

সয়া।—(চিন্তা করিয়া) আগামী রবিবার?—না, আমার অনুরোধে আর এক সপ্তাহ বিলম্ব কর। ইতিমধ্যে পুনরায় আমি আসিব।

পদ্মাবতী নিরুত্তর।

সাহেব-বিবিরা ঐ সব কথা শুনিতেছিলেন, পদ্মাবতীকে নিরুত্তর দেখিয়া তাঁহারা বোধ হয় সন্তুষ্ট হইলেন, তাঁহাদের সকলেরই বদন প্রফুল্ল হইল। সয়ারাম এতক্ষণ পত্নীর সহিত কথা কহিতে কহিতে মনোমধ্যে আর একটী বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, পদ্মাবতীর মুখে শেষকথার কোন উত্তর না পাইয়া, মিস্ লভিঙের মুখের দিকে চাহিয়া, সন্দিগ্ধ-চিত্তে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার সঙ্গে সেই যে ছোট বিবিটী আমাদের বাড়ীতে যাইতেন, যাঁহার নাম মিস্ ডার্লিং, তাঁহাকে এখানে উপস্থিত দেখিতেছি না কেন? তিনি কি এ বাড়ীতে থাকেন না?"

প্রশ্ন উচ্চারিত হইবামাত্র এককালে ছয়খানি মুখ অবনত হইল। সেই ছয় মুখের মধ্যে পঞ্চমুখের অধিকারিণী মিস্ লভিং, পদ্মাবতী, ক্ষীরোদকুমারী, নরেশনন্দিনী আর উমাকালী। একখানি মুখের অধিকারী নরেশনন্দিনীর পার্শ্বস্থা সেই পূর্ব্বোক্ত অল্পবয়স্ক বালক। ছয়মুখেই মৃদু মৃদু হাস্য।

সয়ারাম সবিস্ময়ে সেই ভাব দর্শন করিলেন, হাস্যের কারণ উপলব্ধি হইল না, তথাপি তাঁহার মনে নূতন প্রকার তর্ক উঠিল। সেই অবকাশে বদন উত্তোলন করিয়া মিস্ লভিং বলিলেন, "মিস্ ডার্লিং নামে কেহই নাই।"—হাসিয়া এইটুকু বলিয়া উক্ত বালকের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিলেন, "ঐ বালক আর সেই মিস্ ডার্লিং অভিন্ন, উভয়েই এক। হিন্দু-সঙ্গীতে ঐ বালক সুনিপুণ বলিয়া আমি উহাকে নারী সাজাইয়া ভগ্নী-পরিচয়ে আপনাদের বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলাম, কল্পিত মিস্ ডার্লিঙের প্রকৃত নাম জর্জ্জ রবিন্‌সন্।"

পুনরায় ছয়মুখ মৃদু মৃদু হাস্য। সয়ারামের বিস্মিত বদনে আরও অধিক বিস্ময়ের আবির্ভাব। সবিস্ময়ে তিনি মনে মনে ভাবিলেন, ইহাদের চাতুরীর নিকটে আমাকে পরাভূত হইতে হইল! এইটুকু চিন্তা করিয়াই আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পদ্মাবতীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "পদ্মা! তবে তুমি গৃহে যাইবে না? আচ্ছা, আমার শেষকথাটী রক্ষা কর। আগামী রবিবারের পর আর এক সপ্তাহ অপেক্ষা করিয়া যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিও। আজ আমি চলিলাম, সপ্তাহের মধ্যে আর একবার আসিয়া তোমাদের মনোভাব পরীক্ষা করিব।"

পদ্মাবতী কহিলেন, "উত্তম।"

যাঁহাকে যাঁহাকে সেলাম করিতে হয়, বিমর্ষ-বদনে তাঁহাদিগকে সেলাম দিয়া সয়ারাম সেদিন বিদায় হইলেন, বাড়ীতে পৌঁছিয়া নরহরিকে আর বামদেবকে সকল কথা বলিলেন, জননীকে কিছু জানিতে দিলেন না। পিতৃ-বিয়োগে তখনও সয়ারামের কালাশৌচ অন্ত হয় নাই, সেই অবস্থায় তাঁহাকে কি কার্য্য করিতে হইবে, তাহাই ভাবিয়া তিনি কিছু উন্মনা হইলেন। তিন দিন পরে চতুর্থ দিবসে সেই মিশনরী-গৃহে গমন করিবার দিনস্থির হইয়া রহিল। সয়ারামের পুত্রের নাম মিহিরকুমার, তাহার বয়ঃক্রম তখন পঞ্চবর্ষ পূর্ণ হয় নাই, সেই

শিশুটীকেও সঙ্গে লইয়া যাওয়া হইবে, ইহাও স্থির হইল। সয়ারাম যে দিন গিয়াছিলেন, সে দিন শুক্রবার, সেই দিন হইতে যে দিন চতুর্থ দিবস, সে দিন সোমবার।

রবিবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে একজন ডাক-হরকরা আসিয়া বামদেবের হস্তে একখানি চিঠি দিয়া গেল। সয়ারাম ও নরহরি তখন বাড়ীতে ছিলেন না, সয়ারামের নামে চিঠি, বামদেব সে চিঠি খুলিল না, বঙ্কিমবাবুপ্রণীত 'বিষবৃক্ষ' নামক উপন্যাস-পুস্তকের মধ্যে রাখিয়া দিল।

রাত্রি আটটার পর সয়ারাম বাটীতে আসিলে, বামদেব সেই পুস্তকখানি হস্তে লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল, পুস্তকের মধ্য হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া তাঁহার হস্তে দিল। ডাকের মোহরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সয়ারাম যেন একটু শিহরিলেন, কি যে তাঁহার মনে হইল, প্রকাশ পাইল না, কম্পিত-হস্তে খাম খুলিয়া চিঠির অক্ষরগুলির প্রতি তিনি একবারমাত্র নেত্রপাত করিয়াই কম্পিতস্বরে বামদেবকে কহিলেন, "দেখি দেখি, কি পুস্তক তোমার হস্তে?" বামদেব তাঁহার হস্তস্থিত পুস্তকখানি জ্যেষ্ঠের হস্তে প্রদান করিলেন।

দুঃখের সময় অবস্থাবিশেষে অনেক লোকের মুখে এক প্রকার হাসি আইসে, সে হাসিতে কিছুমাত্র রস থাকে না, সম্মুখের লোকে সে হাসি দেখিলে অন্তর অন্তরে ভয় পায়। বিষণ্ণবদনে সেইরূপ হাস্য করিয়া, মস্তক-সঞ্চালন পূর্ব্বক সয়ারাম আপন মনে বলিলেন, "ঠিক হইয়াছে! এরূপ পত্র এইরূপ পুস্তকের মধ্যেই স্থান পাওয়া উচিত বটে!"

বামদেব কিছুই বুঝিতে পারিল না, পত্রের অক্ষরের প্রতিও দৃষ্টি দেয় নাই, জ্যেষ্ঠের বিস্ময়সূচক আক্ষেপোক্তি শ্রবণ করিয়া বামদেব চমকিয়া উঠিল, চমকিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি দাদা! পত্র কোথাকার? পত্রে কি সংবাদ লেখা আছে?"

অন্যমনস্কভাবে হস্তবিস্তার করিয়া সয়ারাম সেই পত্রখানি বামদেবের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন, "দেখ, পড়।"

বামদেব পত্র পাঠ করিল। পত্রে লেখা ছিল :—

"আজ্ঞাকারী অবশ্যপশ্য শ্রীনফরচন্দ্র দেবশর্ম্মন্ নমস্কারা নিবেদনঞ্চাগে আমি মহাশয়কে একটা কুঘটনার খবর লিখিতেছি। আমার খুড়া মহাশয়ের মধ্যম পুত্র সন্ন্যাসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক রকম কুকার্য্য করিতেছিল, প্রায় একমাস বাড়ীতে

আসে নাই, আমাদের গাঁয়ের নেপাল পুরকুতের ছেলের সঙ্গে একদিন জামতাড়া ষ্টেসনের চাতালের উপর বেড়াইতেছিল। রেলগাড়ী আসিয়াছিল। মানুষেরা যখন হুড়াহুড়ি করিয়া গাড়ীতে উঠিতেছিল, হতভাগা সন্ন্যাসীচরণ সেই সময় একজন মানুষের পাকেট হইতে একখানা রুমাল-বাঁধা পয়সা কিম্বা টাকা তুলিয়া লয়। তাহার কপালক্রমে সেই রুমালখানা চাতালের নীচে রেলরাস্তার রেলের উপর পড়িয়া যায়। হতভাগা সেই সময় চাতালের উপর হইতে হেঁট হইয়া রুমালখানা কুড়াইয়া লইবার জন্য হাত নামাইয়া দিয়াছিল, সামলাইতে না পারিয়া হুম্‌ড়ি খাইয়া রেলের উপর পড়িয়া গিয়াছিল। তখন গাড়ী ছাড়িয়াছিল, গাড়ীর চাকায় সেই হতভাগা একেবারে চূর্ণ হইয়া ধূলি হইয়া গিয়াছে। নেপাল পুরকুতের ছেলের মুখে আজ তিন দিন হইল, আমরা এই খবর পাইয়াছি, মহাশয়দিগকে এই শোকের খবর জানাইবার জন্য আমি এই পত্রখানা লিখিলাম, ইতি সন ১৩০৯ সাল তারিখ ১১ই চৈত্র।"

পত্রখানা ভূতলে ফেলিয়া দিয়া বামদেব দুই হস্তে নয়ন আবরণ করিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সয়ারাম বলিলেন, "একরকম ভালই হইয়াছে। পত্রে কি আছে, তাহা না জানিয়াও তুমি ঐ পত্রখানা 'বিষবৃক্ষ' পুস্তকের ভিতর রাখিয়াছিলে, বিষফল বাহির হইয়াছে। পত্রখানা আমাকে দাও, ও পত্র আমি কাহাকেও দেখাইব না, মাকেও তুমি এ সংবাদ দিও না, কাহাকেও কিছু বলিও না। সংসারে আমাদের যে ঘটনা হইতেছে, তাহাতে যে কি ফল ফলিবে, কল্য তাহা আমরা জানিতে পারিব।"

পত্রখানা তুলিয়া বামদেব চক্ষু মুছিতে মুছিতে সয়ারামের হস্তে প্রদান করিল, সয়ারাম সেখানা আপন পকেটে রাখিয়া অন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন, কত কি ভাবিতে ভাবিতে বামদেব আর একখানি গৃহে গিয়া বসিল। পত্রপাঠ করিয়া বামদেব কাঁদিল কেন, বিষফল বাহির হইল, সয়ারাম এ কথাই বা বলিলেন কেন, এই স্থলে তাহা বুঝাইতে হইতেছে। পত্রখানা কোথাকার? কেই বা সেই সন্ন্যাসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়? সন্ন্যাসীচরণের অপমৃত্যুর সহিত এ সংসারের কি সম্পর্ক?—এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, পত্রখানা রামপুরের, সন্ন্যাসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বর্গীয় সুধারাম চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ জামাতা, উমাকালীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল; উমাকালী বিধবা হইল।

রাজা বল্লালসেন তাঁহার রাজত্বসময়ে বঙ্গের ব্রাহ্মণ-কায়স্থের থাক্ বদ্ধ করিয়াছিলেন, গুণবান্ পুরুষগণকে তিনি কুলীন উপাধি দিয়াছিলেন; অতঃপর সেই বিশুদ্ধ বল্লালী নিয়ম বঙ্গদেশে সুরক্ষিত হয় নাই। গুণবানেরা কুলীন হইবে, আচার, বিনয়, বিদ্য ইত্যাদি প্রধান প্রধান নবগুণ কুলীনের ভূষণ হইবে, ইহাই ছিল বল্লাল সেনের ব্যবস্থা; কুলীনের পুত্র হইলেই কুলীন হইবে, কুলীনপুত্রেরা পুরুষানুক্রমে কুলীন হইবে, বল্লালী কৌলীন্যের সে অর্থ নহে; কিন্তু বঙ্গের দুর্ভাগ্য-ক্রমে কাল সহকারে বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কুলীনের পুত্র সর্ব্বগুণ-বর্জ্জিত, সর্ব্বদোষাকর হইলেও তাঁহারা আপনা আপনি কুলীনের সম্ভ্রম লইয়া, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, গ্রামে গ্রামে বুক ফুলাইয়া বেড়াইত, কেহই প্রায় সরস্বতী-দেবীর কোন ধার ধারিত না, বিবাহ করা তাহাদের ব্যবসায়ের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল, বিবাহের দ্বারা তাহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহ হইত, গুণবিশিষ্ট কুলীনের মূর্খ বংশধরেরা কুলধ্বজ হইয়া বহুনারীর পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক জীবনান্তে একদিনে বহু নারীকে বিধবা করিত; শিক্ষা-প্রভাবে আজকাল সে দৌরাত্ম্য অনেক কমিয়া আসিয়াছে, তথাপি স্থানে স্থানে যাহা কিছু কিছু আছে, তাহাতেও সামান্য অনর্থ সংঘটিত হইতেছে না। কুলীনের মূর্খপুত্রেরা দুরাচার হয়, তাহাদের অকর্ত্তব্য কোন দুষ্কার্য্যই প্রায় থাকে না; যাঁহারা বঙ্গীয় কুল-সংসারের সমাচার রাখেন, তাঁহারাই এই বাক্যের সাক্ষী। এক দৃষ্টান্ত উপরিভাগে বর্ণিত হইল। সুধারাম চট্টোপাধ্যায়ের মূর্খ জামাতা গাঁটকাটা হইয়াছিল, কুলীনের পুত্র বলিয়া কেহ তাহাকে ক্ষমা করিত না, বাপ্পীয় শকটচক্রও তাহাকে ক্ষমা করিল না,—শকট-চক্রেই তাহার প্রাণান্ত হইল।

কৌলীন্যের বিচারের অবসর এখন নহে, বিধবা হইয়া উমাকালীর কি হইল, তাহাই জানিতে হইবে। রবিবারের রজনী প্রভাত হইয়া গেল, সোমবারের সূর্য্য পূর্ব্বাচলে দর্শন দিলেন। মিহিরকুমারকে সঙ্গে লইয়া সয়ারাম, নরহরি ও বামদেব সেই মিশনরী বিবির আলয়ে উপস্থিত হইলেন। শুক্রবার যে কয়েকটী সাহেব-বিবিকে সয়ারামবাবু একটী গৃহে সমবেত দেখিয়াছিলেন, সোমবারে আর সেগুলি একত্র ছিলেন না, মিস্ লভিং আর মিস্ রবিন্সন্ একটী কক্ষে বসিয়া চারিটী নব শীকারের সহিত হাসিয়া হাসিয়া বাক্যালাপ করিতেছিলেন, পুত্র ও ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত সেই গৃহেই সয়ারাম উপস্থিত।

মিস্ লভিং বিশেষ শিষ্টাচারে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। বসিবার অগ্রে লভিংকে সম্বোধন করিয়া সয়ারাম বলিলেন, "আপনি অনুগ্রহ করিয়া রবিন্‌সনের সহিত ক্ষণেকের জন্য যদি অন্য গৃহে সরিয়া যান, তাহা হইলে আমরা আপনাদের কর্ত্তব্যকার্য্য শেষ করিয়া লইতে পারি।" মিস্ লভিং তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন। মিহিরকুমার পদ্মাবতীকে দেখিয়া মা মা বলিয়া তাঁহার কোলের কাছে ছুটিয়া গেল, পদ্মাবতী তাহাকে ক্রোড়ে না লইয়া, তাহার মুখপানে না চাহিয়াই অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। তিনটী ভ্রাতা মহা বিস্ময়াপন্ন। অনন্তর সয়ারাম পদ্মাবতীকে, নরহরি ক্ষীরদাকে এবং বামদেব নরেশনন্দিনীকে তাঁহাদের মনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বধূরা সংসারত্যাগে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তদনুরূপ উত্তর দিলেন। উমাকালীকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিল না, তথাপি উমাকালী বলিল, "কেন আর তোমরা বৃথা কষ্ট পাও, আমরা আর ঘরে যাইব না। ঘরের নাম শুনিয়া আমার দক্ষিণচক্ষু নৃত্য করিতেছে, আমি যেন বুঝিতেছি, ঘরে গেলেই আমার অমঙ্গল ঘটিবে।"

ডাকের চিঠিখানি সয়ারামের পকেটেই ছিল, সাশ্রু-নয়নে উমাকালীর সিন্দূরশূন্য সীমন্ত দর্শন করিয়া মনে মনে তিনি বলিলেন, "অভাগিনী! তোমার ঘরের আশা ফুরাইয়া গিয়াছে! কেন তোমার দক্ষিণচক্ষু নাচিতেছে, তাহা তুমি জানিতে পারিতেছ না। কেহ তোমার সীমন্তের সিন্দূরবিন্দু মুছিয়া দেয় নাই, নিয়তিবশে তোমার অজ্ঞাতেই সেই সিন্দূরবিন্দু বিলীন হইয়া গিয়াছে! তোমাকে গৃহে না লইয়া গেলেই এক প্রকার মঙ্গল হয়। তোমারও মঙ্গল, আমাদেরও মঙ্গল।"

মনে মনে সয়ারামের এই কথা। উমাকালীর বাক্যে কোন উত্তর না দিয়া, পদ্মাবতীর মুখের দিকে চাহিয়া, স্তম্ভিতকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "পদ্মা! সত্যই কি নূতন প্রকার জল-সংস্কারে তোমাদের একান্ত অভিলাষ? গঙ্গাস্নানে তোমাদের কি জল-সংস্কার সিদ্ধ হয় নাই?"

মৃদু হাস্য করিয়া পদ্মাবতী কহিলেন, "তোমরা যাহাকে গঙ্গা বল, তাহার নাম গঙ্গা নহে। বিবির মুখে শুনিয়াছি, পুস্তকেও পড়িয়াছি, সেই নদীর নাম হুগলী। বিবি বলেন, হুগলীর জল পবিত্র হয় না। পৃথিবীর মধ্যে পবিত্র নদ জর্দ্দান্, সেই জর্দ্দনের জল মস্তকে ধারণ করিয়া আমরা শিশুমন্ত্রে

দীক্ষিত হইব। সেদিন তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি কাহারও উকীল হইয়াছি কি না। আজ তোমরা তিন ভাই এখানে উপস্থিত আছ, আজ আমি ওকালতী করিব। আমার, ক্ষীরদার, নন্দিনীর, আমাদের তিন জনেরই এক কথা। তোমরা যদি আমাদের চাও, তোমরাও প্রভুমন্ত্রে দীক্ষিত হও, ছেলেটীকেও দীক্ষা দিবার জন্য আমার ক্রোড়ে অর্পণ কর। ইচ্ছা যদি না হয়, ঘরে ফিরিয়া যাও। আমাদের ঘর নাই, প্রভুর প্রতি যাহারা বিশ্বাস করে, ঘর-সংসারে তাহাদের প্রয়োজন থাকে না। তোমরা যদি ঘর-সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়া প্রভুপদে শরণ লইতে চাও, সেই নামে বিশ্বাস কর, পরিত্রাণ পাইবে,—পরিত্রাণ পাইবে। বিবি বলেন, মানব-জাতির প্রতি স্বর্গীয় পিতার এত কৃপা, এত ভালবাসা যে, মানব-জাতির পরিত্রাণের নিমিত্ত তিনি তাঁহার একমাত্র প্রিয়তম ঔরস পুত্রকে ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই একমাত্র প্রিয়তম ঔরস পুত্র আমাদের ধন্য ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যিশু। তোমরা যদি আমাদের চাও, পরকালে যদি মুক্তবাঞ্ছা কর, তবে সেই স্বর্গস্থ প্রভু যিশুর নামে অন্তরের বিশ্বাসস্থাপন কর।"

পদ্মাবতীর বক্তৃতা ও উপদেশ শ্রবণে তিনটী ভ্রাতার তিনটী শরীর রোমাঞ্চিত হইল। নিবৃত্তি প্রবৃত্তি উভয় পন্থা-প্রসঙ্গে সেই ক্ষেত্রে বিস্তর তর্ক-বিতর্ক চলিল। তর্কমুখে পদ্মাবতী জিতিলেন, সয়ারাম হারিলেন; তাঁহার দুটী ভ্রাতাও নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। তিনটী বধূর প্রতি তিনটী ভ্রাতার যথার্থ ভালবাসা ছিল, সংসারধর্ম্মের দিকে চিত্ত আকৃষ্ট হইলে সেই ভালবাসা হারাইতে হয়, এই চিন্তা করিয়া মনে মনে তাঁহারা পদ্মাবতীর উপদেশেই অনুমোদন করিলেন; সম্মতি প্রকাশ করিবার কিঞ্চিৎ বিলম্ব রহিল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সয়ারাম গদগদস্বরে পদ্মাবতীকে কহিলেন, "আজ সোমবার, তোমাদের দীক্ষা-গ্রহণের দিন পড়িতেছে আগামী রবিবার, সেই রবিবারের পূর্ব্বদিন আমাদের মনের কথা তোমরা জানিতে পারিবে।"

মিহিরকে লইয়া ভ্রাতৃগণ গৃহগমনের উপক্রম করিতেছিলেন, সহসা বামদেবের একটী কথা স্মরণ হইল, পদ্মাবতীর দিকে চাহিয়া বামদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "উমাকালীর কি হইবে?"—পদ্মাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই বামদেব সতৃষ্ণ-নয়নে জ্যেষ্ঠ সহোদরের মুখের দিকে চাহিলেন।

বামদেবের দৃষ্টিপাতের অর্থ বুঝিতে না পারিয়াও পূর্ব্ব-প্রশ্নের উত্তরে পদ্মবতী কহিলেন, "উমাকালী কুলীনের বধূ, উমাকালীর স্বামী মূর্খ, মূর্খেরা সর্ব্বত্র সচ্চরিত্র থাকিতে পারে না,—উমাকালীর স্বামী দুশ্চরিত্র,—দুশ্চরিত্র মূর্খ স্বামীকে পরিত্যাগ করা আমাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে। সত্যকথা গোপন রাখিতে নাই, গোপন রাখিব না, আমার মুখে সেই সত্যকথাটী তোমরা শুনিয়া রাখ। মিস্ ডার্লিং নাম লইয়া যে বালকটী নারীবেশে আমাদের বাড়ীতে যাইত, যাহার নাম জর্জ্জ রবিন্‌সন্, উমাকালী সেই রবিন্‌সনের প্রতি অনুরাগিণী।"

তিনটী ভ্রাতা সমভাবে চমকিত। নিয়তি সর্ব্বত্র বলবতী। ক্ষণকাল চমকিতভাবে নিস্তব্ধ থাকিয়া; সয়ারাম আপন পকেট হইতে বাহির করিয়া নফরচন্দ্রের লিখিত সেই পত্রখানি পদ্মাবতীর হস্তে দিলেন। পদ্মাবতী পাঠ করিয়া ক্ষীরদাকে, ক্ষীরদা নরেশনন্দিনীকে সেইখানি দেখাইলেন। পত্র যখন নরেশনন্দিনীর হস্তে, উমাকালী সেই সময় সেই দিকে একটু ঝুঁকিয়া অক্ষরগুলি পাঠ করিল;—কি তখন তাহার মনে হইল, ঠিক বুঝিতে পারা গেল না, কিন্তু উমাকালী জোরে জোরে তিন বার করতালি দিল।

সয়ারাম আর সেখানে বিলম্ব করিলেন না, যাহা বুঝিবার তাহা বুঝিলেন, পুত্রটীর হস্তধারণ পূর্ব্বক ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন; বধূরা কোথায়, উমাকালী কোথায়, জননীকে সে কথা কিছুই কহিলেন না। চারি দিন গত হইল, প্রতিশ্রুত শনিবার আসিল। তিন ভ্রাতার মন্ত্রণা স্থির হইল। কপর্দ্দীকাবাস্তে সন্ন্যাসীরা যেমন সন্ন্যাসধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিল, পত্নীকাবাস্তে ঐ তিনটী সহোদরও সেইরূপে সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সন্ন্যাসীর গল্পটী এইখানে একটু পরিষ্কার করিয়া বলা ভাল।

নদীতীরে এক বৃক্ষতলে দুইজন সন্ন্যাসী থাকিত; প্রতিদিন নদীর জলে কৌপীন ধৌত করিয়া সেই বৃক্ষশাখায় শুকাইতে দিত; প্রতি রজনীতেই সেই কৌপীনগুলি ইঁদুরে কাটিত। নিত্য নিত্য ঐরূপ; নিত্য নিত্য নূতন কৌপীন প্রয়োজন হইত। ঐ উপদ্রব সহ্য করিতে না পারিয়া একজন সন্ন্যাসী তথা হইতে পলায়ন করিল, একজন রহিল। গ্রামের যে সকল স্ত্রী-পুরুষ সেই নদীতে স্নান করিতে আসিত, নিত্য নিত্য তাহারা দুইজন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া যাইত;

কেহ কেহ তাহাদের ভক্তও হইয়াছিল। প্রধান ভক্ত একটী বাবু;—তাঁহার নাম রামসুন্দর। যে দিন তিনি দেখিলেন, দুইজনের স্থলে একজনমাত্র সন্ন্যাসী, নিকটবর্ত্তী হইয়া সেইদিন তিনি সেই সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু! আর একজন কোথায় গেলেন?"—সন্ন্যাসী সেই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিলেন। রামসুন্দর বলিলেন, "আপনাকেও ত তবে প্রস্থান করিতে হইবে, এইরূপ বুঝিতেছি; কিন্তু আপনি যাইবেন না; সাধুর প্রতি আমার আন্তরিক ভক্তি, আপনাকে আমি রাখিব। আপনি এক কাজ করুন,—একটা বেরাল পুষিয়া রাখুন, ইঁদুর বংশ নির্ব্বংশ হইবে। আমি আপনাকে একটী বেরাল দিব, দিনের বেলা আপনি সেটীকে বাঁধিয়া রাখিবেন, রাত্রিকালে গাছের উপর ছাড়িয়া দিবেন।"

সন্ন্যাসী বিড়াল পুষিল। বিড়াল প্রতি রজনীতে ইন্দুর ধরিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল, বিড়ালের মেও মেও রব শুনিয়া কতক ইন্দুর পলাইল, কৌপীন কাটা বন্ধ হইল। এক উৎপাত বন্ধ হইল বটে, কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে আর এক উৎপাত। বিড়ালের জন্য প্রতিদিন তাঁহাকে পাড়ায় পাড়ায় দুগ্ধ ভিক্ষা করিতে যাইতে হইত। রামসুন্দর প্রতিদিন আসিয়া সংবাদ লন। সন্ন্যাসী একদিন তাঁহাকে বলিল, "ইন্দুর কমিয়াছে বটে, কিন্তু বিড়ালের দুগ্ধের জন্য আমার অনেকটা সময় নষ্ট হয়, আসল কার্য্যে বিঘ্ন ঘটে।"—রামসুন্দর বলিলেন, "উপায় আছে। আপনি একটী গাভী রাখুন। আমি আপনাকে একটী দুগ্ধবতী গাভী দিব, বৎস দিব, দুগ্ধের জন্য আর আপনাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না।"

তাহাই হইল, রামসুন্দর একটী সবৎসা দুগ্ধবতী গাভী দিলেন, প্রচুর দুগ্ধ হইতে লাগিল, বিড়ালও খায়, সন্ন্যাসীও খায়, বিলক্ষণ সুবিধা। একপক্ষে সুবিধা হইল বটে, অন্যপক্ষে নূতন অসুবিধা। গাভীর জন্য ঘাস কাটিতে হয়, বিচালী সংগ্রহ করিতে হয়, তাহাতেও সন্ন্যাসীর অনেক সময় যায়। বিশেষতঃ গাভীটী থাকে কোথায়? রৌদ্র আছে, বৃষ্টি আছে, শীত আছে, খোলা জায়গায় বড় কষ্ট, তাহাতেও পাপ আছে। সন্ন্যাসী সেই কথা রামসুন্দরকে জানাইল। রামসুন্দর সেই গাভীর জন্য একখানা চালা করিয়া দিলেন, একজন রাখাল রাখিলেন, বিচালী কিনিবার জন্য কিছু কিছু পয়সা দিতে লাগিলেন, সে অভাব ছিল, সে অভাব দূর হইল। গাভীর

চালাখানি একটু ড় করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এক ধারে গাভী থাকিত, এক ধারে রাখাল থাকিত, রাত্রিকালে একধারে সন্ন্যাসী শয়ন করিত।

বিড়াল হইল, গাভী হইল, রাখাল হইল, ঘর হইল, তথাপি সন্ন্যাসী তুষ্ট হইল না। রামসুন্দর আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, সন্ন্যাসী নিজের মুখের কথা চলেন, রামসুন্দর সন্তুষ্ট হন। এইরূপে দিন যায়। সন্ন্যাসী আর একদিন রামসুন্দরকে বলিল, "বাপু হে! সকলই তুমি দিয়াছ, কিন্তু গাভীর খোরাকীর জন্য নিত্য নিত্য তুমি নগদ পয়সা দাও, সেটা গ্রহণ করা আমার উচিত হয় না। আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার জন্য তোমার ঐরূপ দণ্ড হয় কেন? যাহাতে না হয়, তাহার কি কোন উপায় হইতে পারে না?" রামসুন্দর বলিলেন, "অবশ্য হইতে পারে। আমি আপনাকে পাঁচ বিঘা চাষের জমী দিব, তাহাতে ধান্য হইবে, খড় হইবে, ধান্য হইতে চাউল প্রস্তুত হইবে, ধান্য-চাউল বিক্রয় করিয়া কিছু কিছু অর্থাগমও হইবে, কোন অভাব থাকিবে না। গো-সেবাও চলিবে, আত্ম-সেবাও চলিবে।"

পাঁচ বিঘা জমাতে যথেষ্ট ধান্য উৎপন্ন হইতে লাগিল, রামসুন্দরের আদেশে গ্রামের দুঃখিনী স্ত্রীলোকেরা চাউল প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিল, সন্ন্যাসী ভাত খাইতে আরম্ভ করিল; রাখালও আর ঘরে ভাত খাইতে যায় না, সন্ন্যাসীর প্রসাদ পায়। দুই জনের জন্য কত চাউল আবশ্যক? অনেক চাউল উৎপন্ন হয়, রাখাল তাহা বাজারে বিক্রয় করিয়া সন্ন্যাসীকে মূল্য আনিয়া দেয়, ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসীর হস্তে কিছু কিছু অর্থ সঞ্চিত হইতে লাগিল; গো-সেবার উদ্‌বৃত্ত বিচালী বিক্রয় করিয়াও কিছু কিছু আয় হইতে লাগিল। গাভীটী প্রচুর দুগ্ধ দান করে, সন্ন্যাসী যত পারে খায়, রাখাল খায়, বিড়ালে খায়, বেশী যাহা থাকে, রাখাল তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলে; দুগ্ধের মূল্যও সন্ন্যাসীর তহবিলে জমা হয়। সন্ন্যাসী দেখিল, ধান্য-চাষে বিলক্ষণ লাভ, হাতেও টাকা জমিয়াছিল, দুই বৎসরের মধ্যে আরও পাঁচ বিঘা জমী কিনিল। দশ বিঘা জমীতে অধিক ধান্য উৎপন্ন হইতে লাগিল, সন্ন্যাসীর আয়ও বাড়িল। তদবধি বৎসর বৎসর চাষের জমীর পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে লাভও অধিক হয়। সাত বৎসরে সন্ন্যাসীর অনেক জমী হইল, গাভী-বৎসের সংখ্যা বাড়িল, অনেক টাকা জমিল, তখন আর চালা ঘরে বাস করিতে মন সরিল না; গ্রামের মধ্যে একখানা একতালা কোটা-বাড়ী বানাইল, বিড়াল, গাভী, বৎস, রাখাল সমস্তই সেই বাড়ীতে লইয়া যাওয়া

হইল, ক্রমশই সন্ন্যাসীর সম্পদ্‌বৃদ্ধি, সুখবৃদ্ধি। তখন আর কৌপীন রহিল না, জটা রহিল না, ভস্ম রহিল না, জপ, তপ, যাগ, যজ্ঞ কিছুই রহিল না, রহিল কেবল সন্ন্যাসাশ্রমের অল্প অল্প গাঁজা। সন্ন্যাসী তখন উত্তম উত্তম বসন পরিধান করিতে লাগিল, উপাদেয় সামগ্রী ভোজন করিতে লাগিল, বিলক্ষণ মোটা-সোটা হইল, বাড়ীতে দাস-দাসী, পাচিকা নিযুক্ত করিল, ক্রমে ক্রমে বাড়ীখানিও দোতালা হইল, সদরদরজায় একজন দরোয়ান বসিল।

বৃক্ষতলে যখন আশ্রম ছিল, তখন প্রতিদিন সন্ধ্যার পর একটী স্ত্রীলোক আসিয়া ঐ সন্ন্যাসীর সেবা করিত; অধিক রাত্রে—বিশেষতঃ ঝড়, বৃষ্টি প্রভৃতি দুর্যোগ হইলে সেই স্ত্রীলোক তাহাকে আপন বাড়ীতে লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া রাখিত। সন্ন্যাসীর সম্পদের সময় সেই স্ত্রীলোক ঐ নূতন বাড়ীতে আসিয়া রাত্রিকালে সেবা করিতে ভুলিত না। সেই স্ত্রীলোকের নাম ত্রিপুরা। ত্রিপুরাকে দাসী-চাকরেরা দেখিয়া মনে করিত, প্রভুর সেবাদাসী।

রামসুন্দরবাবু ভক্তিমান্ ছিলেন, সেটা কেবল তিনি মুখেই বলিতেন, তাঁহার অন্তরের ভাব ছিল অন্যপ্রকার। সন্ন্যাসীকে পরীক্ষা করিবার জন্যই বিড়াল পোষা হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ী করা পর্য্যন্ত তিনি ঐ সব খেলা খেলিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীর সম্পদের সময় মধ্যে মধ্যে আসিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিতেন। রামসুন্দরবাবুর চেষ্টায় সন্ন্যাসীর বিবাহ হইল। সন্ন্যাসীর রূপ-লাবণ্য সন্ন্যাসী নিজেই দর্শন করিয়া—দর্পণে মুখচ্ছবি অবলোকন করিয়া আনন্দে ও অহঙ্কারে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিত। জপ, তপ সমস্তই ফুরাইয়া গিয়াছিল, মধ্যে মধ্যে আত্মকলেবর নিরীক্ষণ করিয়া কেবল জপ করা হইত "কপিকাবাস্তে! কপিকাবাস্তে!"

সন্ন্যাসীর নাম হইল রূপচাঁদ গোস্বামী। দাসী-চাকরেরা তাহাকে বাবু বলিত। গ্রামের লোকেরা কেহ বলিত রূপচাঁদবাবু, কেহ বলিত গোঁসাইবাবু, কেহ কেহ বলিত সন্ন্যাসীবাবু। দরোয়ান বলিত, মহারাজ।

রূপচাঁদের বিবাহের দুই বৎসর পরে একদিন বেলা এক প্রহর সময় তাহার সদরদরজার সম্মুখে একজন সন্ন্যাসী আসিল, ভিক্ষার্থী হইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিল, দরোয়ান নিষেধ করিল। দরোয়ানের সঙ্গে সন্ন্যাসীর কথা-কাটাকাটি চলিতেছিল, এমন সময় রামসুন্দরবাবু সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হই-

লেন। তিনি তখন স্নান করিতে যাইতেছিলেন, সন্ন্যাসীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সেইখানে চমকিয়া দাঁড়াইলেন, অনেকক্ষণ একদৃষ্টে সন্ন্যাসীর শ্মশ্রুশোভিত বদন নিরীক্ষণ করিয়া তিনি তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন। বাহু তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া সন্ন্যাসী বলিল, "নারায়ণ—নারায়ণ—নারায়ণ!"

সন্ন্যাসীকে লইয়া রামসুন্দরবাবু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দ্বারপাল তখন আর নিষেধ করিতে পারিল না। উপরের যে ঘরে রূপচাঁদ বসিয়া আরাম করে, সেই ঘরের দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, সমভিব্যাহারী সন্ন্যাসীর দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ পূর্ব্বক রামসুন্দরবাবু উৎফুল্লকণ্ঠে রূপচাঁদকে কহিলেন, "দেখুন দেখি, এই সাধুটীকে আপনি চিনিতে পারেন কি না?"

রামসুন্দরবাবুর গাত্রে তৈলমাখা, ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি বিছানায় উঠিলেন না, সন্ন্যাসীর অঙ্গে ভস্ম-মাখা, চরণে ধূলা-মাখা, সন্ন্যাসীও বিছানায় উঠিতে সাহস করিল না। রূপচাঁদের ঘরে ঢালা বিছানা, জাজিমের উপর কার্পেট পাতা, সারি সারি অনেকগুলি উপাধান; দুটী উপাধান অবলম্বনে রূপচাঁদ উপবিষ্ট। তৃতীয় উপাধানে একটী বস্ত্রাবৃত পদার্থ। গৃহমধ্যে বিছানার উপর রূপচাঁদ, চৌকাঠের বাহিরে শ্যামসুন্দরবাবুর পার্শ্বে নবাগত সন্ন্যাসী। রূপচাঁদের চক্ষের সহিত সন্ন্যাসীর চক্ষের মিলন হইল। অল্পক্ষণ মিলনেই সন্ন্যাসী যেন রূপচাঁদকে চিনিতে পারিল; নাম জানিতে পারিল না, হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ভায়া হে! তোমার এ অবস্থা কত দিন?"

আকার-দর্শনে যতটা না হউক, কণ্ঠস্বর-শ্রবণে আর 'ভায়া' সম্বোধনে রূপচাঁদ সেই সন্ন্যাসীকে চিনিয়া লইল, উত্তর করিল, "যত দিন তোমাকে দেখি নাই, প্রায় তত দিন।"

সন্ন্যাসী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কি প্রকারে?"

রূপচাঁদ বলিল, "কপ্পিকাবাস্তে।"

সন্ন্যাসী বিস্ময় প্রকাশ করিল। কৌপীনের কথা তখন তাহার মনে পড়িল পাঠকমহাশয়ের বোধ হয় এত মনে পড়িতে পারিবে, ইঁদুর কৌপীন কাটিত, সেই উৎপাতে যুগল সন্ন্যাসীর একজন সন্ন্যাসী স্থানত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, দ্বাদশ বৎসরে কথা; দ্বাদশ বৎসর পরে সেই সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিয়াছে। কপ্পিকাবাস্তে এ জনের দেশত্যাগ, কপ্পিকাবাস্তে দ্বিতীয় জনের সম্পদপ্রাপ্তি, ইহা বড় আশ্চর্য্য।

রূপচাঁদ গাত্রোত্থান করিয়া সন্ন্যাসীকে আলিঙ্গন করিল, হস্তধারণ পূর্ব্বক গালিচার উপর লইয়া বসাইল। রামসুন্দরবাবু বহুদিনের পর যুগলমিলন দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া স্নান করিতে গেলেন; তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাস্য-রেখা দেখা দিল। কি তাঁহার মনে উঠিল, হাস্য-দর্শনে তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল না।

"কপ্পিকাবাস্তে"—রূপচাঁদের মুখে এই কথার ব্যাখ্যা হইতেছিল, পার্শ্বে হঠাৎ ক্ষুদ্র শিশুর ক্রন্দনধ্বনি। সন্ন্যাসী চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি?" ইতিপূর্ব্বে তৃতীয় উপাধানে যে একটী বস্ত্রাবৃত পদার্থের কথা বলা হইয়াছে, আবরণ-মোচন করিয়া রূপচাঁদ সেই পদার্থটীকে আপন ক্রোড়ের নিকটে আনয়ন পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর প্রশ্নে উত্তর দিল, "কপ্পিকাবাস্তে এই পদার্থ আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। এটী আমার পুত্র। ছয় মাসের শিশু।"

সন্ন্যাসীর পূর্ব্ব-বিস্ময় অধিক গাঢ়তর হইয়া উঠিল, সবিস্ময়ে রূপচাঁদ গোস্বামীকে কহিল, "ভায়া হে! কপ্পিকাবাস্তে তুমি সম্পদ পাইয়াছ, কপ্পিকাবাস্তে তুমি বিবাহ করিয়াছ, কপ্পিকাবাস্তে তুমি পুত্র পাইয়াছ; কপ্পিকাবাস্তে জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া বৃথা আমি দেশে দেশে পর্য্যটন করিয়াছি। এখন তোমাকে দেখিয়া আমার হিংসা হইতেছে।"

একবার ছেলের দিকে, একবার সন্ন্যাসীর দিকে চক্ষু ফিরাইয়া রূপচাঁদ বলিল, "ভালই হইয়াছে, হিংসা আসিলে সন্ন্যাসধর্ম্ম থাকে না। আমার মনে হিংসা আইসে নাই, ক্রমে ক্রমে ভোগ-বিলাসের ইচ্ছা আসিয়াছিল, তাহাতেই আমি সন্ন্যাসধর্ম্ম হারাইয়া ফেলিয়াছি। তোমার মনে হিংসা আসিয়াছে, তুমিও সন্ন্যাসধর্ম্ম রাখিতে পারিবে না।"

কপ্পিকাবাস্তে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, এই তর্কের পূর্ব্বে সংক্ষেপে সংক্ষেপে রূপচাঁদ সে সকল কথা ঐ সন্ন্যাসীর নিকট ব্যক্ত করিয়াছিল। গোড়ার কথা মনে করিয়া সন্ন্যাসী বলিল, "তোমার মনে হিংসা আইসে নাই, এমন কথা তুমি বলিতে পার না। তোমার অবস্থা দর্শনে আমার হিংসা হইতেছে, এ হিংসা এক প্রকার, তোমার হিংসা ছিল অন্য প্রকার। ইঁদুর মারিবার জন্য তুমি বিড়াল পুষিয়াছিলে, তোমার মনে জীব-হিংসার প্রবৃত্তি আসিয়াছিল। ভাব দেখি ভাই, কাহার হিংসায় বেশী দোষ?"

লেন। তিনি তখন স্নান করিতে যাইতেছিলেন, সন্ন্যাসীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া
সেইখানে চমকিয়া দাঁড়াইলেন, অনেকক্ষণ একদৃষ্টে সন্ন্যাসীর শ্মশ্রুশোভিত বদন
নিরীক্ষণ করিয়া তিনি তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন। বাহু তুলিয়া আশী-
র্ব্বাদ করিয়া সন্ন্যাসী বলিল, "নারায়ণ—নারায়ণ—নারায়ণ!"

সন্ন্যাসীকে লইয়া রামসুন্দরবাবু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দ্বারপাল
তখন আর নিষেধ করিতে পারিল না। উপরের যে ঘরে রূপচাঁদ বসিয়া আরাম
করে, সেই ঘরের দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, সমভিব্যাহারী সন্ন্যাসীর দিকে অঙ্গুলি-
নির্দ্দেশ পূর্ব্বক রামসুন্দরবাবু উৎফুল্লকণ্ঠে রূপচাঁদকে কহিলেন, "দেখুন দেখি,
এই সাধুটীকে আপনি চিনিতে পারেন কি না?"

রামসুন্দরবাবুর গাত্রে তৈলমাখা, ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি বিছানায় উঠি-
লেন না, সন্ন্যাসীর অঙ্গে ভস্ম-মাখা, চরণে ধূলা-মাখা, সন্ন্যাসীও বিছানায় উঠিতে
সাহস করিল না। রূপচাঁদের ঘরে ঢালা বিছানা, জাজিমের উপর কার্পেট
পাতা, সারি সারি অনেকগুলি উপাধান; দুটী উপাধান অবলম্বনে রূপচাঁদ উপ-
বিষ্ট। তৃতীয় উপাধানে একটী বস্ত্রাবৃত পদার্থ। গৃহমধ্যে বিছানার উপর রূপ-
চাঁদ, চৌকাঠের বাহিরে শ্যামসুন্দরবাবুর পার্শ্বে নবাগত সন্ন্যাসী। রূপচাঁদের
চক্ষের সহিত সন্ন্যাসীর চক্ষের মিলন হইল। অল্পক্ষণ মিলনেই সন্ন্যাসী যেন রূপ-
চাঁদকে চিনিতে পারিল; নাম জানিতে পারিল না, হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল
"ভায়া হে! তোমার এ অবস্থা কত দিন?"

আকার-দর্শনে যতটা না হউক, কণ্ঠস্বর-শ্রবণে আর 'ভায়া' সম্বোধনে রূপচাঁদ
সেই সন্ন্যাসীকে চিনিয়া লইল, উত্তর করিল, "যত দিন তোমাকে দেখি নাই,
প্রায় তত দিন।"

সন্ন্যাসী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কি প্রকারে?"

রূপচাঁদ বলিল, "কপ্নিকাবাস্তে।"

সন্ন্যাসী বিস্ময় প্রকাশ করিল। কৌপানের কথা তখন তাহার মনে পড়িল
পাঠকমহাশয়ের [illegible] মনে পড়িতে পারিবে, ইঁদুর কৌপীন কাটিত, সেই উৎপাতে
যুগল সন্ন্যাসী[illegible] একজন সন্ন্যাসী স্থানত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, দ্বাদশ বৎসরে
কথা; দ্বাদশ বৎসর পরে সেই সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিয়াছে। কপ্নিকাবাস্তে এক
জনের দেশত্যাগ, কপ্নিকাবাস্তে দ্বিতীয় জনের সম্পদপ্রাপ্তি, ইহা বড় আশ্চর্য্য।

রূপচাঁদ গাত্রোত্থান করিয়া সন্ন্যাসীকে আলিঙ্গন করিল, হস্তধারণ পূর্ব্বক গালিচার উপর লইয়া বসাইল। রামসুন্দরবাবু বহুদিনের পর যুগলমিলন দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া স্নান করিতে গেলেন; তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাস্য-রেখা দেখা দিল। কি তাঁহার মনে উঠিল, হাস্য-দর্শনে তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল না।

"কপ্নিকাবাস্তে"—রূপচাঁদের মুখে এই কথার ব্যাখ্যা হইতেছিল, পার্শ্বে হঠাৎ ক্ষুদ্র শিশুর ক্রন্দনধ্বনি। সন্ন্যাসী চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি?" ইতিপূর্ব্বে তৃতীয় উপাধানে যে একটী বস্ত্রাবৃত পদার্থের কথা বলা হইয়াছে, আবরণ-মোচন করিয়া রূপচাঁদ সেই পদার্থটীকে আপন ক্রোড়ের নিকটে আন-য়ন পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর প্রশ্নে উত্তর দিল, "কপ্নিকাবাস্তে এই পদার্থ আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। এটী আমার পুত্র। ছয় মাসের শিশু।"

সন্ন্যাসীর পূর্ব্ব-বিস্ময় অধিক গাঢ়তর হইয়া উঠিল, সবিস্ময়ে রূপচাঁদ-গোস্বামীকে কহিল, "ভায়া হে! কপ্নিকাবাস্তে তুমি সম্পদ পাইয়াছ, কপ্নিকা-বাস্তে তুমি বিবাহ করিয়াছ, কপ্নিকাবাস্তে তুমি পুত্র পাইয়াছ; কপ্নিকাবাস্তে জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া বৃথা আমি দেশে দেশে পর্য্যটন করিয়াছি। এখন তোমাকে দেখিয়া আমার হিংসা হইতেছে।"

একবার ছেলের দিকে, একবার সন্ন্যাসীর দিকে চক্ষু ফিরাইয়া রূপচাঁদ বলিল, "ভালই হইয়াছে, হিংসা আসিলে সন্ন্যাসধর্ম্ম থাকে না। আমার মনে হিংসা আইসে নাই, ক্রমে ক্রমে ভোগ-বিলাসের ইচ্ছা আসিয়াছিল, তাহাতেই আমি সন্ন্যাসধর্ম্ম হারাইয়া ফেলিয়াছি। তোমার মনে হিংসা আসিয়াছে, তুমিও সন্ন্যাসধর্ম্ম রাখিতে পারিবে না।"

কপ্নিকাবাস্তে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, এই তর্কের পূর্ব্বে সঙ্ক্ষেপে সঙ্ক্ষেপে রূপচাঁদ সে সকল কথা ঐ সন্ন্যাসীর নিকট ব্যক্ত করিয়াছিল। গোড়ার কথা মনে করিয়া সন্ন্যাসী বলিল, "তোমার মনে হিংসা আইসে নাই, এমন কথা তুমি বলিতে পার না। তোমার অবস্থা দর্শনে আমার হিংসা [illegible]ছে, এ হিংসা এক প্রকার, তোমার হিংসা ছিল অন্য প্রকার। ইন্দুর মারিবা[illegible] তুমি বিড়াল পুষিয়াছিলে, তোমার মনে জীব-হিংসার প্রবৃত্তি আসি[illegible] ভাব দেখি ভাই, কাহার হিংসায় বেশী দোষ?"

মাথা হেঁট করিয়া রূপচাঁদ তখন ছেলেটীকে শান্ত করিতে লাগিল, পূর্ব্ব-প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া, একজন দাসীকে ডাকাইয়া সন্ন্যাসীর আহারের আয়োজন করিয়া দিতে বলিল।

সেই দিন অপরাহ্ণে রামসুন্দরবাবু পুনবার আসিয়া উভয়ের সকল কথা শুনিলেন। স্নান করিতে যাইবার সময় তাঁহার মুখে যে হাসি আসিয়াছিল, তাহার ফল ফলিল। পরদিন প্রভাতে ক্ষৌরকার ডাকিয়া, গোঁপ-দাড়ী ও জটা মুড়াইয়া সেই সন্ন্যাসীকে স্নান করাইয়া নববস্ত্রাদি পরিধান করান হইল; তাহার নাম হইল খড়্গারাম গোস্বামী। রূপচাঁদ ও খড়্গারাম একসঙ্গে এক বাড়ীতেই বাস করিতে লাগিল। কি জাতি, কি বৃত্তান্ত, কিছুই জানা ছিল না, রূপচাঁদের পূর্ব্ব-সেবাদাসী ত্রিপুরাসুন্দরী ঘটকালী করিয়া রূপচাঁদের বিবাহ দিয়াছিল, সেই ত্রিপুরাসুন্দরীই আবার একজন বৈষ্ণবীর কন্যার সহিত খড়্গারামের বিবাহ দিয়া দিল। বৎসরান্তে খড়্গারামেরও একটী পুত্র জন্মিল, সন্ন্যাস ভুলিয়া খড়্গারাম দিব্য সুখস্বচ্ছন্দে রূপচাঁদের বাড়ীতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

কপিকাবাস্তে দুইজন সন্ন্যাসী সন্ন্যাসাশ্রম ত্যাগ করিয়া ঐরূপে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিল, পল্লীকাবাস্তে সয়ারাম চট্টোপাধ্যায় আপন ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়াই কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। যেমন মন্ত্রণা স্থির, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে গৃহত্যাগ। মিহিরকুমারকে লইয়া তাঁহারা তিন সহোদরে সেই শনিবার রাত্রেই বিবির বাড়ীতে চলিয়া গেলেন, রবিবার প্রাতে উপযুক্ত গির্জ্জামন্দিরে তাঁহারা আটজনেই বিশুমন্ত্রে দীক্ষা-গ্রহণ করিলেন। উমাকালী বিধবা হইয়াছিল, দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে তাহার কোন বাধা ছিল না, স্বয়ম্বরা হইয়া সে তখন তাহার পূর্ব্ব-অনুরাগপাত্র জর্জ্জ রবিন্‌সনকে বিবাহ করিল। নরেশনন্দিনীর উপর বালক রবিন্‌সনের লোভ পড়িয়াছিল, কিন্তু নরেশ-নন্দিনীর স্বামী খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করাতে প্রকাশ্যরূপে তাহার সেই লোভবৃত্তি চরিতার্থ হইতে পাইল না।

অন্তঃপুরে নারীশিক্ষায় সর্ব্বত্রই এইরূপ ফল, এমন কথা বলা হইতেছে না; তবে কি না, যেখানে স্বধর্ম্মের বিপরীত উপদেশ, স্বধর্ম্মের নিন্দা এবং আনুষঙ্গিক প্রলোভন থাকে, সেখানে ক্রমে ক্রমে বিষময় ফল উৎপন্ন হওয়া বিচিত্র কথা নহে। আমাদের রমণীগণের যেরূপ শিক্ষা হওয়া আবশ্যক, যেরূপ শিক্ষা প্রার্থনীয়, বর্ত্তমান

শিক্ষা-প্রণালীতে তাহা সিদ্ধ হইতেছে না। স্রোতের বেগ দিন দিন যেরূপ প্রবল হইতেছে, তাহাতে বাধা না পাইলে গতিরোধ করা দুরূহ হইয়া উঠিবে। পদ্মা ও দামোদরের বন্যার স্রোত যেরূপ সময়ে সময়ে বহু গ্রাম বহু জনপদ ভাসাইয়া লইয়া যায়, ঐরূপ শিক্ষা-স্রোত অবাধে প্রবাহিত হইলে অনেক স্থলে আর্য্যসংসারে আর্য্যকুলাচার সেইরূপে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, লক্ষণ দেখিয়া আমাদের মনে সেইরূপ আতঙ্কের সঞ্চার হয়। মহাজনেরা বলেন, নারী, পক্ষী এবং শিশু, এই তিন একরূপ প্রকৃতি-সম্পন্ন; তাহাদিগকে প্রথমাবধি যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হইবে, সেইরূপেই তাহারা প্রস্তুত হইয়া উঠিবে। আমাদের অবরোধ-প্রণালী আমাদের রমণীগণের পক্ষে যথার্থই উপযুক্ত; অবরোধে ধর্ম্ম-বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করিতে তাহারা শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, বাহিরের কোন বিষয়ে তাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পায় না, বিশ্বাসও টলে না। নারীশিক্ষা প্রয়োজন হইলেও ধর্ম্মগ্রন্থ-পাঠ এবং গৃহকার্য্য-শিক্ষাই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। বিবির নিকটে শিক্ষা-প্রাপ্ত কয়জন হিন্দুরমণী অটল বিশ্বাসে স্বধর্ম্মপালন করিতেছে, কয়জন হিন্দুরমণী সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে, গণনা করিয়া কেহই তাহা আমা-দিগকে দেখাইয়া দিতে পারেন না। ইংরাজী প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিয়া আমাদের রমণীগণ প্রায়ই গৃহকার্য্যে অবহেলা করিতে, ভোগবিলাসে আসক্ত হইতে, স্বধর্ম্মে অবিশ্বাস করিতে এবং গুরুজনের অবমাননা করিতে শিখিতেছে। ইহা কদাচ মঙ্গলের নিমিত্ত হইতে পারে না। কর্ণাটবাসিনী ধর্ম্মশীলা সুশিক্ষিতা মাতাজী ঠাকুরাণী এই রাজধানীমধ্যে মহাকালী পাঠশালা স্থাপন করিয়া যে রীতিতে হিন্দুবালিকাগণকে শিক্ষাদান করিতেছেন, সেই রীতিই আমাদের পক্ষে উপকারিণী। যদিও কেহ কেহ বালিকাগণের সংস্কৃতভাষা-শিক্ষার বিরোধী হইতেছেন, কিন্তু মূলাংশে জাতীয় ধর্ম্মজ্ঞান ও গৃহকর্ম্মে নৈপুণ্য শিক্ষা দিবার নিয়ম-গুলি অবশ্যই প্রশংসনীয়।

হিন্দু-অন্তঃপুরে যে সকল স্ত্রীলোক শিক্ষাদান করেন, তাঁহারা ভিন্নধর্ম্মের সেবিকা। যদিও তাঁহারা হিন্দুকামিনীগণকে আপনাদের ধর্ম্মে লওয়াইবার নিমিত্ত প্রকাশ্যরূপে কোন কথা বলেন না, কিন্তু তাঁহাদের উপদেশ প্রণালী এবং মনোগত ইচ্ছা অন্যপ্রকার। যাঁহারা বুঝিয়াছেন, হিন্দুসংসারের সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া দেওয়া অত্যাবশ্যক, যাঁহারা বুঝিয়াছেন, হিন্দুধর্ম্মের গৌরব খর্ব্ব করা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাঁহা-

রাই ইংরাজী প্রণালীতে হিন্দুস্থী-শিক্ষার পক্ষপাতী। একদিন সমগ্র পৃথিবী খৃষ্টধর্ম্মে
উপাসক হইবে, কতকগুলি খৃষ্টান অখণ্ড বিশ্বাসে সেই বাসনাকে হৃদয়মধ্যে পোষণ
করেন। সমগ্র পৃথিবীর কথা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু এই ভারত-ক্ষেত্রের
নাম ধর্ম্মক্ষেত্র; হিন্দুকামিনীরা এই ক্ষেত্রের গৌরবরক্ষা করিতেছেন, হিন্দুকামিনী
গণকে ভিন্নধর্ম্মে লইয়া যাওয়া নিতান্ত সহজ হইবে না, পূর্ণ বিশ্বাসে অবশ্য
এ কথা বলা যাইতে পারে। পূর্ণবিশ্বাস থাকিলেও পূর্ব্ব হইতে সাবধান হই
থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

স্ত্রীলোকেরা তরলমতি; পুনঃ পুনঃ বিরুদ্ধবাদ শ্রবণ করিলে উন্মার্গগামি
হইবার সাধ তাহাদের মনে উদিত হইতে পারে। যাহাতে না পারে, তাহার
উপায় করা পুরুষগণের কর্ত্তব্য। দিনকাল যেরূপ পড়িয়া আসিসেছে, তাহাও
দেখা যায়, পুরুষেরাই বিবিয়ানা শিক্ষায় প্রশ্রয় দিতেছেন। পরিণাম-চিন্তা তাঁ
দের মনে উদিত হইতেছে না। তরল শোণিতের উত্তাপে মস্তিষ্ক বিকারগ্র
হয়। শীতল-বুদ্ধির পরামর্শ না লইয়া যাঁহারা আপনাদের পদে কুঠারা
করিতে ব্যগ্র, আঘাতের যন্ত্রণায় পরিণামে তাঁহাদিগকে পরিতপ্ত হইয়া অনুত
করিতে হইবে; এখানি প্রহসনের নাম স্মরণ করিয়া চতুর্দ্দিকে তাঁহারা দৃ
করিবেন, তাজ্জব ব্যাপার! তাজ্জব ব্যাপার!

হিন্দুদায়ভাগের বিধানে স্বধর্ম্মত্যাগী পুত্রেরা পৈতৃক বিভবের উত্তরা
কারী হইতে পারে না; দায়ভাগ পরিবর্ত্তন না করিয়াও বর্ত্তমান রাজপুরু
তাহার বিপরীত ব্যবস্থা করিয়াছেন। হিন্দুসন্তান খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে পি
সম্পত্তির অধিকারী হইবে, সে ব্যবস্থানুরূপ নজীরও হইয়াছে। সয়ারাম চট্টোপা
"পত্নীকাবাস্তে" যুগল সহোদরের সহিত খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পৈতৃক সম্প
অংশ-গ্রহণে অভিলাষী হইলেন। ঐরূপ নজীর যখন ছিল না, পৈতৃকসম্পত্তি
বঞ্চিত হইবার আশঙ্কায় ধনবানের সন্তানেরা তখন অন্য কোন প্রকার প্রলো
খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রহণে সম্মত হইতে পারিতেন না। চাকুরী পাইবার, অন্ন পাইবার বি
বিবি পাইবার আশায় যে সকল গরীবের ছেলে খৃষ্টান হইত, লেখা-পড়া জা
না থাকিলে তাহাদের কষ্টের সীমা থাকিত না। পাদ্রী সাহেবেরা বলি
তাঁহাদের ধর্ম্মে ঐহিক সুখ নাই; সুতরাং খৃষ্টধর্ম্ম-দীক্ষিত, অশিক্ষিত গরী
ছেলেরা ঐহিক সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া একপ্রকার অনাহারে উ

মুক্তিপথ চাহিয়া থাকিত। এখনকার নূতন নিয়মে সে ভয়টা দূর হইয়া গিয়াছে। সয়ারাম চট্টোপাধ্যায় জমীদারের পুত্র; তাঁহারা পাঁচ সহোদর, পিতার মৃত্যুর পর তাঁহারা পাঁচজনেই পূর্ণ বিষয়ের অধিকারী হইয় ছিলেন, তন্মধ্যে তিনজন ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিলেন। পিতৃসম্পত্তির ত্রিপঞ্চমাংশ তাঁহাদের প্রাপ্য, সহজে সে তিন অংশ তাঁহারা বাহির করিয়া লইতে পারিলেন না, মকদ্দমা করিতে হইল। মকদ্দমা অবশ্যই ডিক্রী হইল; জমীদারীর তিন অংশ, ভদ্রাসনবাটীর তিন অংশ এবং নগদ টাকার তিন অংশ তাঁহারা প্রাপ্ত হইবার অধিকার পাইলেন। কিরূপে ভাগ করা হয়? এজমালী সম্পত্তি বিভাগ করিয়া তিন অংশ বাহির করিয়া লওয়া অসম্ভব না হইলেও এ ক্ষেত্রে অসম্ভব। বাঁটোয়ারা করিয়া চিহ্নিত করিয়া লইলেও সে অবস্থায় এক বাড়ীতে পাঁচ জনের বাস করা সমাজ-বিরুদ্ধ কার্য্য; দুই জন হিন্দু, তিন জন খৃষ্টান; কিছুতেই সামঞ্জস্য হইয়া উঠিল না; খরিদ্দার স্থির করিয়া সয়ারাম তাঁহাদের ভদ্রাসনবাটীর তিন অংশ বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন; জমীদারীর তিন অংশও কাজে কাজে বিক্রয় করিতে হইল। মূল্যের টাকাগুলি তাঁহারা তিন জনে বিভাগ করিয়া লইলেন। পিতার সঞ্চিত অর্থ অতি সহজেই সমাংশে বিভাগ করিয়া লওয়া হইল।

সুধারাম চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী তখন জীবিতা ছিলেন, ভদ্রাসনবাটীর তিন অংশ অপরের হস্তে গেল, দুটী পুত্রের অংশ অবশিষ্ট থাকিল, সে বাটীতে বাস করা তিনি অকর্ত্তব্য ভাবিলেন। যে ব্যক্তি তিন অংশ ক্রয় করিয়াছিল, নিধিরাম ও মৃত্যুঞ্জয়ের দ্বারা বাকী দুই অংশও তিনি তাহার নিকট বিক্রয় করাইলেন। জমীদারীর অংশ বিক্রয় করিতে হইল না, নম্বর খারিজ করাইয়া স্বতন্ত্র তৌজী বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হইল। পুত্র মরিলে জননীর শোক হয়, পুত্রেরা খৃষ্টান হইয়া গেল, শিশু পৌত্রটীও খৃষ্টান হইল, সুধারামের পুণ্যশীলা সহধর্ম্মিণী সেজন্য শোকপ্রকাশ করিলেন না; অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া, তিনি ধৈর্য্য ধারণ করিলেন।

ভদ্রাসন গেল, সে গ্রামে বাস করা বড়ই কষ্টকর, অতএব তিনি দুটী পুত্রকে লইয়া অপর এক গ্রামে একখানি বাড়ী খরিদ করিয়া সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। উপযুক্ত সময়ে নিধিরামের, তাহার পর মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হইল; পূর্ব্বের ন্যায় মনের সুখ না থাকিলেও তাঁহারা সংসারী হইয়া ক্রমে ক্রমে ভাতৃ

স্বাই ইংরাজী প্রণালীতে হিন্দুস্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী। একদিন সমগ্র পৃথিবী খৃষ্টধর্ম্মের উপাসক হইবে, কতকগুলি খৃষ্টান অখণ্ড বিশ্বাসে সেই বাসনাকে হৃদয়মধ্যে পোষণ করেন। সমগ্র পৃথিবীর কথা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু এই ভারত-ক্ষেত্রের নাম ধর্ম্মক্ষেত্র; হিন্দুকামিনীরা এই ক্ষেত্রের গৌরবরক্ষা করিতেছেন, হিন্দুকামিনী-গণকে ভিন্নধর্ম্মে লইয়া যাওয়া নিতান্ত সহজ হইবে না, পূর্ণ বিশ্বাসে অবশ্য এ কথা বলা যাইতে পারে। পূর্ণ বিশ্বাস থাকিলেও পূর্ব্ব হইতে সাবধান হই। থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

স্ত্রীলোকেরা তরলমতি; পুনঃ পুনঃ বিরুদ্ধবাদ শ্রবণ করিলে উন্মার্গগামি... হইবার সাধ তাহাদের মনে উদিত হইতে পারে। যাহাতে না পারে, তাহার উপায় করা পুরুষগণের কর্ত্তব্য। দিনকাল যেরূপ পড়িয়া আসিসেছে, তাহাতে দেখা যায়, পুরুষেরাই বিবিয়ানা শিক্ষায় প্রশ্রয় দিতেছেন। পরিণাম-চিন্তা তাঁহা-দের মনে উদিত হইতেছে না। তরল শোণিতের উত্তাপে মস্তিষ্ক বিকারপ্রাপ্ত হয়। শীতল-বুদ্ধির পরামর্শ না লইয়া যাঁহারা আপনাদের পদে কুঠারাঘাত করিতে ব্যগ্র, আঘাতের যন্ত্রণায় পরিণামে তাঁহাদিগকে পরিতপ্ত হইয়া অনুতাপ করিতে হইবে; একখানি প্রহসনের নাম স্মরণ করিয়া চতুর্দ্দিকে তাঁহারা দর্শন করিবেন, তাজ্জব ব্যাপার! তাজ্জব ব্যাপার!

হিন্দুদায়ভাগের বিধানে স্বধর্ম্মত্যাগী পুত্রেরা পৈতৃক বিভবের উত্তরা-ধিকারী হইতে পারে না; দায়ভাগ পরিবর্ত্তন না করিয়াও বর্ত্তমান রাজপুরুষ গণ তাহার বিপরীত ব্যবস্থা করিয়াছেন। হিন্দুসন্তান খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে পি... সম্পত্তির অধিকারী হইবে, সে ব্যবস্থানুরূপ নজীরও হইয়াছে। সয়ারাম চট্টোপাধ্যায় "পত্নীকাবাস্তে" যুগল সহোদরের সহিত খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পৈতৃক সম্পত্তির অংশ-গ্রহণে অভিলাষী হইলেন। ঐরূপ নজীর যখন ছিল না, পৈতৃকসম্পত্তি... বঞ্চিত হইবার আশঙ্কায় ধনবানের সন্তানেরা তখন অন্য কোন প্রকার প্রলোভনে খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রহণে সম্মত হইতে পারিতেন না। চাকরী পাইবার, অশ্ব পাইবার ... বিবি পাইবার ...তে যে সকল গরীবের ছেলে খৃষ্টান হইত, লেখা-পড়া জা... না থাকিলে ...হাদের কষ্টের সীমা থাকিত না। পাদ্রী সাহেবেরা বলি... তাঁহাদের ধ...হিক সুখ নাই; সুতরাং খৃষ্টধর্ম্ম-দীক্ষিত, অশিক্ষিত গরী...র ছেলেরা ঐহিক সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া একপ্রকার অনাহারে উর্দ্ধে...

মুক্তিপথ চাহিয়া থাকিত। এখনকার নূতন নিয়মে সে ভয়টা দূর হইয়া গিয়াছে। সয়ারাম চট্টোপাধ্যায় জমীদারের পুত্র; তাঁহারা পাঁচ সহোদর, পিতার মৃত্যুর পর তাঁহারা পাঁচজনেই পূর্ণ বিষয়ের অধিকারী হইয় ছিলেন, তন্মধ্যে তিনজন ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিলেন। পিতৃসম্পত্তির ত্রিপঞ্চমাংশ তাঁহাদের প্রাপ্য, সহজে সে তিন অংশ তাঁহারা বাহির করিয়া লইতে পারিলেন না, মকদ্দমা করিতে হইল। মকদ্দমা অবশ্যই ডিক্রী হইল; জমীদারীর তিন অংশ, ভদ্রাসনবাটীর তিন অংশ এবং নগদ টাকার তিন অংশ তাঁহারা প্রাপ্ত হইবার অধিকার পাইলেন। কিরূপে ভাগ করা হয়? এজমালী সম্পত্তি বিভাগ করিয়া তিন অংশ বাহির করিয়া লওয়া অসম্ভব না হইলেও এ ক্ষেত্রে অসম্ভব। বাঁটোয়ারা করিয়া চিহ্নিত করিয়া লইলেও সে অবস্থায় এক বাড়ীতে পাঁচ জনের বাস করা সমাজ-বিরুদ্ধ কার্য্য; দুই জন হিন্দু, তিন জন খৃষ্টান; কিছুতেই সামঞ্জস্য হইয়া উঠিল না; খরিদ্দার স্থির করিয়া সয়ারাম তাঁহাদের ভদ্রাসনবাটীর তিন অংশ বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন; জমীদারীর তিন অংশও কাজে কাজে বিক্রয় করিতে হইল। মূল্যের টাকাগুলি তাঁহারা তিন জনে বিভাগ করিয়া লইলেন। পিতার সঞ্চিত অর্থ অতি সহজেই সমাংশে বিভাগ করিয়া লওয়া হইল।

সুধারাম চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী তখন জীবিতা ছিলেন, ভদ্রাসনবাটীর তিন অংশ অপরের হস্ত গেল, দুটী পুত্রের অংশ অবশিষ্ট থাকিল, সে বাটীতে বাস করা তিনি অকর্ত্তব্য ভাবিলেন। যে ব্যক্তি তিন অংশ ক্রয় করিয়াছিল, নিধিরাম ও মৃত্যুঞ্জয়ের দ্বারা বাকী দুই অংশও তিনি তাহার নিকট বিক্রয় করাইলেন। জমীদারীর অংশ বিক্রয় করিতে হইল না, নম্বর খারিজ করাইয়া স্বতন্ত্র তৌজী বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হইল। পুত্র মরিলে জননীর শোক হয়, পুত্রেরা খৃষ্টান হইয়া গেল, শিশু পৌত্রটীও খৃষ্টান হইল, সুধারামের পুণ্যশীলা সহধর্ম্মিণী সেজন্য শোকপ্রকাশ করিলেন না; অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া, তিনি ধৈর্য্য ধারণ করিলেন।

ভদ্রাসন গেল, সে গ্রামে বাস করা বড়ই কষ্টকর, অতএব ...ী দুটী পুত্রকে লইয়া অপর এক গ্রামে একখানি বাড়ী খরিদ করিয়া সেই স্থ... বাস করিতে লাগিলেন। উপযুক্ত সময়ে নিধিরামের, তাহার পর মৃত্যুঞ্জয়ের ...হ হইল; পূর্ব্বের ন্যায় মনের সুখ না থাকিলেও তাঁহারা সংসারী হইয়া ক্রমে ক্রমে ভ্রাতৃ...

গণের মায়া ভুলিলেন, তাঁহাদের বিবাহের পূর্ব্বে খৃষ্টানের ভ্রাতা বলিয়া একটা
গোল উঠিয়াছিল, খৃষ্টান হইবার পর ভ্রাতৃগণ আর ভদ্রাসনে ফিরিয়া আইসেন
নাই, তাঁহাদের সহিত কোন সংস্রব ছিল না, বিশেষ প্রমাণে তাহা প্রকাশ
পাওয়াতে, অতি অল্পেই সে গোলমালটা মিটিয়া গিয়াছিল।

পুরুষের স্বেচ্ছাচারে একটী সংসার ঐরূপে ভাঙ্গিয়া গেল, আর কখনও
যায় নাই, আর কখনও যাইবে না কিম্বা আর কখনও যাইতে পারিবে না
এমন বিবেচনা করিয়া লওয়া অবশ্যই ভুল। দিন দিন যেরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত
হইতেছে, বিভ্রান্ত যুবকগণের যেরূপ স্বেচ্ছাচার বাড়িতেছে, পরিবারে
পরিবারে যেরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস কমিতেছে, তাহাতে অশান্তি বাড়িবে, ইহা নিশ্চয়।
যাঁহারা আপনাদিগকে উন্নতিশীল বলিয়া শ্লাঘা প্রকাশ করেন, তাঁহাদের
বিবেচনায় ঐরূপ আত্মবিচ্ছেদ মঙ্গলের নিমিত্ত হইতে পারে, কিন্তু আমাদের
হিন্দু-সমাজ যে ভাবে গঠিত, যে ভাবে পরিচালিত, তাহা বিবেচনা করিয়া
দেখিলে উহা মহা অমঙ্গলের নিদান বলিয়া গণনা করিতে হয়।

মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির সমষ্টিকেই পরিবার
বলা যায়। যদিও অভিধানে পাওয়া যায়, বিবাহিতা পত্নীর একটী অর্থ পরিবার
কিন্তু আজকাল ঐ শেষোক্ত অর্থই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। পরিবার বলিলে
এখন যেন কেবল স্ত্রীকেই বুঝায়। পরিবার লইয়া অমুক ব্যক্তি অমুক স্থানে
বাস করিতেছেন, অমুক ব্যক্তি সপরিবারে শৈলবিহারে গমন করিয়াছেন,
কথা বলিলে কেবল স্ত্রীর সহিত বাস ও বিহার ভিন্ন আর কিছু বুঝায় না।
অনেকেই এখন এক একটী স্ত্রী লইয়া স্বতন্ত্র বাস করিতে ভালবাসিতেছেন
পুত্রকন্যা জন্মিলে নিকটে রাখিয়া প্রতিপালন করিতে হয়, পরিবার ভক্ত
পুরুষেরা তাহা করিয়াও থাকেন, কিন্তু পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্বতন্ত্র
স্বতন্ত্র বাস করে, কন্যারা বিবাহিতা হইলে স্বামী-গৃহে চলিয়া যায়
ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা। এগুলিও ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী অনুকরণের
ফল। কেবল [illegible] স্বামী এক বাড়ীতে থাকিয়া স্বাধীনতা উপভোগ করি[illegible]
স্বামীর উপ[illegible]র সম্পূর্ণ প্রভুত্ব চলে, স্বামীকে স্ত্রীর আজ্ঞাকারী হই[illegible]
থাকিতে হ[illegible]র গৌরব তখন এত অধিক হইয়া উঠে যে বাড়ীতে আর
কেহ না থাকিলেও স্ত্রীর নাম বাড়ী; পরিবারের বদলে ইহাও কেহ কেহ বলি[illegible]

আরম্ভ করিয়াছেন। ঐ প্রকারের একটী বাবুর পরিবারের একদিন মাথা ধরিয়াছিল, বাড়ীতে কেবল তিনি আর তাঁহার পরিবার থাকিতেন, আর কেহই না। একটা ডাক্তারখানায় উপস্থিত হইয়া, সেই বাবু অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া বসিয়া ছিলেন। তাঁহার একজন বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি এমন বিমর্ষ কেন?" বাবু উত্তর দিলেন, "বাড়ীর অসুখের জন্য আমার মনে একটুও সুখ নাই।"

"বাড়ীর অসুখ।"—এ কথার অর্থ সকলে কি বুঝিবেন? বুঝিতে হইবে, যিনি ঐরূপ উত্তর দিলেন, তাঁহার পরিবারের মাথা-ধরা। পরিবারের মাথাধরার নাম "বাড়ীর অসুখ!" এখনকার সমাজে অনেকেরই পরিবার সর্ব্বস্ব। পরিবারকে "বাড়ী" বলিয়াও সকলে সন্তুষ্ট হইতে চান না, তাঁহারা ভাবেন, জগতের যথা-সর্ব্বস্বই তাঁহাদের পরিবার।

পরিবার লইয়া পৃথক্ থাকাই পরম সুখ। পরিবারভক্তগণের সেই সুখসাধনের উপদ্রবেই বঙ্গের নারী-সংসার ভঙ্গ হইতেছে। দৃষ্টান্ত এখনও অধিক হয় নাই বলিয়া সকলে সেটী সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিতেছেন না, কিন্তু ঔদাস্য-সাগরে ডুবিয়া থাকিলে পূর্ণতা-দর্শন অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে।

সয়ারাম চট্টোপাধ্যায় মাতৃসংসার পরিত্যাগ করিয়া, মাতৃধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া, পরিবার লইয়া পৃথক্ হইলেন। তিন ভ্রাতা একসঙ্গে বাটী হইতে বাহির হইয়াছিলেন, তিনজনে একত্র রহিলেন না; পরিবার লইয়া নরহরিও পৃথক্, পরিবার লইয়া বামদেবও পৃথক্। হিন্দু-সংসারে উচ্চজাতীয়া স্ত্রীলোকেরা নিজে নিজে কিছু উপার্জ্জন করেন না, হিন্দুসংসার পরিত্যাগ করিলে স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপার্জ্জনের সুবিধা হয়। জমীদারী ও ভদ্রাসন বিক্রয় করিয়া, পিতৃসঞ্চিত নগদ টাকা বিভাগ করিয়া লইয়া, তিন ভ্রাতার হস্তে অনেকগুলি টাকা হইয়াছিল; আলস্যের দাস হইয়া ক্রমাগত বসিয়া খাইলে অনেক টাকাও অল্পদিনে ফুরায়; নবধর্ম্ম-বিশ্বাসে, নব নব অনুরাগে, নব নব উৎসাহে ঐ তিন ভ্রাতার লব্ধ অর্থ অল্পদিনে ফুরাইয়া আসিল; সেই অবস্থায় তাঁহারা চাকরী অন্বেষণে সাহেবের দ্বারে দ্বারে উমেদারী করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনজনেরই কিছু কিছু ইংরাজীভাষা জানা ছিল, মিশনরীগণের সুপারিশে তাঁহারা তিনজনেই ভিন্ন ভিন্ন আফি[illegible] তিনটী কেরাণী-গিরী চাকরী পাইলেন। ব্যবহারে তাঁহারা সাহেব; সাহেবী [illegible]ক, সাহেবী-খানায়, সাহেবী বিলাসে অনেক টাকা খরচ; কেরাণীগিরীর মজুরীতে তত টাকা[illegible]

[illegible]

গণের মায়া ভুলিলেন, তাঁহাদের বিবাহের পূর্ব্বে খৃষ্টানের ভ্রাতা বলিয়া একটা
গোল উঠিয় ছিল, খৃষ্টান হইবার পর ভ্রাতৃগণ আর ভদ্রাসনে ফিরিয়া আইসেন
নাই, তাঁহাদের সহিত কোন সংস্রব ছিল না, বিশেষ প্রমাণে তাহা প্রকাশ
পাওয়াতে, অতি অল্পেই সে গোলমালটা মিটিয়া গিয়াছিল।

পুরুষের স্বেচ্ছাচারে একটী সংসার ঐরূপে ভাঙ্গিয়া গেল, আর কখনও
যায় নাই, আর কখনও যাইবে না কিম্বা আর কখনও যাইতে পারিবে না,
এমন বিবেচনা করিয়া লওয়া অবশ্যই ভুল। দিন দিন যেরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত
হইতেছে, বিভ্রান্ত যুবকগণের যেরূপ স্বেচ্ছাচার বাড়িতেছে, পরিবারে
পরিবারে যেরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস কমিতেছে, তাহাতে অশান্তি বাড়িবে, ইহা নিশ্চয়।
যাঁহারা আপনাদিগকে উন্নতিশীল বলিয়া শ্লাঘা প্রকাশ করেন, তাঁহাদের
বিবেচনায় ঐরূপ আত্মবিচ্ছেদ মঙ্গলের নিমিত্ত হইতে পারে, কিন্তু আমাদের
হিন্দু-সমাজ যে ভাবে গঠিত, যে ভাবে পরিচালিত, তাহা বিবেচনা করিয়া
দেখিলে উহা মহা অমঙ্গলের নিদান বলিয়া গণনা করিতে হয়।

মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির সমষ্টিকেই পরিবার
বলা যায়। যদিও অভিধানে পাওয়া যায়, বিবাহিতা পত্নীর একটী অর্থ পরিবার,
কিন্তু আজকাল ঐ শেষোক্ত অর্থই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। পরিবার বলিলে
এখন যেন কেবল স্ত্রীকেই বুঝায়। পরিবার লইয়া অমুক ব্যক্তি অমুক স্থানে
বাস করিতেছেন, অমুক ব্যক্তি সপরিবারে শৈলবিহারে গমন করিয়াছেন,
কথা বলিলে কেবল স্ত্রীর সহিত বাস ও বিহার ভিন্ন আর কিছু বুঝায় না।
অনেকেই এখন এক একটী স্ত্রী লইয়া স্বতন্ত্র বাস করিতে ভালবাসিতেছেন।
পুত্রকন্যা জন্মিলে নিকটে রাখিয়া প্রতিপালন করিতে হয়, পরিবার ভক্ত
পুরুষেরা তাহা করিয়াও থাকেন, কিন্তু পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্বতন্ত্র
স্বতন্ত্র বাস করে, কন্যারা বিবাহিতা হইলে স্বামী-গৃহে চলিয়া যায়,
ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা। এগুলিও ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী অনুকরণের
ফল। কেবল [illegible] স্বামী এক বাড়ীতে থাকিয়া স্বাধীনতা উপভোগ করিলে
স্বামীর উপ[illegible]র সম্পূর্ণ প্রভুত্ব চলে, স্বামীকে স্ত্রীর আজ্ঞাকারী হইতে
থাকিতে হ[illegible]র গৌরব তখন এত অধিক হইয়া উঠে যে বাড়ীতে আর
কেহ না থাকিলেও স্ত্রীর নাম বাড়ী; পরিবারের বদলে ইহাও কেহ কেহ বলি[illegible]

আরম্ভ করিয়াছেন। ঐ প্রকারের একটী বাবুর পরিবারের একদিন মাথা ধরিয়া-
ছিল, বাড়ীতে কেবল তিনি আর তাঁহার পরিবার থাকিতেন, আর কেহই না।
একটা ডাক্তারখানায় উপস্থিত হইয়া, সেই বাবু অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া বসিয়া ছিলেন।
তাঁহার একজন বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি এমন বিমর্ষ কেন?"
বাবু উত্তর দিলেন, "বাড়ীর অসুখের জন্য আমার মনে একটুও সুখ নাই।"

"বাড়ীর অসুখ।"—এ কথার অর্থ সকলে কি বুঝিবেন? বুঝিতে হইবে, যিনি
ঐরূপ উত্তর দিলেন, তাঁহার পরিবারের মাথা-ধরা। পরিবারের মাথাধরার নাম
"বাড়ীর অসুখ!" এখনকার সমাজে অনেকেরই পরিবার সর্ব্বস্ব। পরিবারকে
"বাড়ী" বলিয়াও সকলে সন্তুষ্ট হইতে চান না, তাঁহারা ভাবেন, জগতের যথা-
সর্ব্বস্বই তাঁহাদের পরিবার।

পরিবার লইয়া পৃথক্ থাকাই পরম সুখ। পরিবারভক্তগণের সেই সুখসাধনের
উপদ্রবেই বঙ্গের নারী-সংসার ভঙ্গ হইতেছে। দৃষ্টান্ত এখনও অধিক হয় নাই
বলিয়া সকলে সেটী সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিতেছেন না, কিন্তু ঔদাস্য-সাগরে
ডুবিয়া থাকিলে পূর্ণতা-দর্শন অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে।

সয়ারাম চট্টোপাধ্যায় মাতৃসংসার পরিত্যাগ করিয়া, মাতৃধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া,
পরিবার লইয়া পৃথক্ হইলেন। তিন ভ্রাতা একসঙ্গে বাটী হইতে বাহির হইয়া-
ছিলেন, তিনজনে একত্র রহিলেন না; পরিবার লইয়া নরহরিও পৃথক্, পরিবার
লইয়া বামদেবও পৃথক্। হিন্দু-সংসারে উচ্চজাতীয়া স্ত্রীলোকেরা নিজে নিজে
কিছু উপার্জ্জন করেন না, হিন্দুসংসার পরিত্যাগ করিলে স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র
উপার্জ্জনের সুবিধা হয়। জমীদারী ও ভদ্রাসন বিক্রয় করিয়া, পিতৃসঞ্চিত নগদ টাকা
বিভাগ করিয়া লইয়া, তিন ভ্রাতার হস্তে অনেকগুলি টাকা হইয়াছিল; আল-
স্যের দাস হইয়া ক্রমাগত বসিয়া খাইলে অনেক টাকাও অল্পদিনে ফুরায়; নবধর্ম্ম-
বিশ্বাসে, নব নব অনুরাগে, নব নব উৎসাহে ঐ তিন ভ্রাতার লব্ধ অর্থ অল্পদিনে
ফুরাইয়া আসিল; সেই অবস্থায় তাঁহারা চাকরী অন্বেষণে সাহেবের দ্বারে দ্বারে
উমেদারী করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনজনেরই কিছু কিছু ইংরাজীভাষা জানা ছিল,
মিশনরীগণের সুপারিসে তাঁহারা তিনজনেই ভিন্ন ভিন্ন আফি[illegible]তনটী কেরাণী-
গিরী চাকরী পাইলেন। ব্যবহারে তাঁহারা সাহেব; সাহেবী [illegible]ক, সাহেবী-
খানায়, সাহেবী বিলাসে অনেক টাকা খরচ; কেরাণীগিরীর মজুরীতে তত টাকা [illegible]
[illegible]

পারেন নাই, রবিন্‌সন্‌ও পারে নাই। বামদেব গৃহে না থাকিলে প্রায় প্রতিদিন নাগর-নাগরীর ঐরূপ সাক্ষাৎ আলাপ হইত।

সাহেব-সংসারে বাল্যবিবাহ চলে না। রবিন্‌সনের বয়ঃক্রম ষোড়শ কি সপ্ত-দশ বর্ষ, সেই বয়সে রবিন্‌সন্‌ পূর্ব্বানুরাগপাত্রী তরুণী উমাকালীকে বিবাহ করিয়াছিল, ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; অবস্থা স্মরণ করিয়া পাঠকমহাশয় হয় তো বলিতে পারিবেন, রবিন্‌সনের দোষ নাই, রবিন্‌সন্‌ স্বেচ্ছাক্রমে আপনাদের সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ করে নাই; রবিন্‌সন্‌ স্বেচ্ছাক্রমে বাল্যবিবাহের বন্ধু হয় নাই, যুবতী উমাকালীই তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল। রবিন্‌সনের অনুকূলে এইরূপ সাফাই সত্য সত্য বলবৎ হইবে কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

নরেশনন্দিনী উমাকালীর ভ্রাতৃজায়া;—স্বধর্ম্মে থাকিলে এক বাড়ীতে একত্র বাস করা সম্ভব হইত, নূতনধর্ম্ম-গ্রহণে উমাকালী এখন নরেশনন্দিনীর পর হইয়া গিয়াছে। রবিন্‌সন্‌ যে বাড়ীতে থাকে, উমাকালী এখন সেই বাড়ীতেই বাস করে। সে বাড়ীখানা নরেশনন্দিনীর বাড়ী হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূর। রবিন্‌সনে আর নরেশনন্দিনীতে কিরূপ লীলা-খেলা হয়, উমাকালী তাহা জানিতে পারে না। নরেশনন্দিনীর সহিত নূতন স্বামীর [illegible]প্রেম, উমাকালী যদি ইহা জানিতে পারিত, সাক্ষী-সাবুদ রাখিয়া উমাকালী তাহা হইলে ডাইভোর্স আইনের আশ্রয় লইতে পেছু-পা হইত না। সেরূপ অবস্থা ঘটিলে রবিন্‌সনের বদলে অন্য কোন ডিয়ারসন্‌ কিম্বা পিয়ারসন্‌ স্বচ্ছন্দে উমাকালীর উচ্ছিষ্ট প্রণয়কমলে নূতন মধুকর হইয়া বসিত।

সর্ব্বদা সেরূপ হইতে পায় না। সাহেবের সমাজ যে প্রকার উপাদানে গঠিত, তাহাতে সে সমাজের বন্ধন যেমন শক্ত, তেমনি শিথিল। নারীবন্ধু পুরুষবন্ধু সমান কথা;—নারীতে নারীতে নির্জ্জনে দেখা-সাক্ষাতে যেমন কোন দোষ ঘটে না, নারী-পুরুষে গুপ্তসাক্ষাৎ-আলাপেও সেইরূপ দোষ নাই, ইহাই ঐ সমাজের পদ্ধতি। [illegible]হেবের সমাজে যে ভাব চলে, সাহেবের ধর্ম্ম যাহারা [illegible] করে, তাহ[illegible] সেই ভাব চালায়,—চালাইতে বাধ্য, ইহাও স্বীকার করিতে [illegible] গৃহে স্বামীর অসাক্ষাতে বন্ধুলোকের প্রবেশ, ইহা কোন [illegible] বাজারে, [illegible] হইতে পারে না। উমাকালীর গৃহেও ঐরূপ হইতে পারে, [illegible] লাভ [illegible]

পদ্মাবতীর গৃহেও হইতে পারে, ক্ষীরোদকুমারীর গৃহেও হইতে পারে; আরও যাহারা যাহারা ঐ ভাবে ঐ পথে আইসে, তাহাদের গৃহেও হইতে পারে। আদর্শানুরূপ প্রতিলিপি হয়, তাহার অন্যথা হইতে পারে না; যেখানে অন্যথা হয়, প্রতিলিপি সেখানে অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

বঙ্গের নারী-সংসার—হিন্দুর নারী-সংসার অনেক প্রকারেই ভঙ্গ হইয়া যাইতেছে। সংসার হইতে পৃথক্‌ থাকিবার ইচ্ছা, স্বাধীনতালাভ করিবার ইচ্ছা, পতির উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার ইচ্ছা, গৃহকার্য্য পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা, নিত্য নূতন নূতন ভোগবিলাসের ইচ্ছা, নারীগণের এই সকল ইচ্ছাতেই হিন্দু-পরিবারের সুশৃঙ্খলা বিনষ্ট হইতেছে। স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া ভিন্নধর্ম্ম-গ্রহণে উন্মত্ত হইয়া পুরুষেরা স্ব স্ব রমণীগণকে সেই পথে লইয়া গিয়া স্বতন্ত্র থাকিতেছেন, ইহাতেও হিন্দুর নারী-সংসার বিলক্ষণ আঘাত পাইতেছে। বৈদেশিক ব্যবহারের অনুকরণ-প্রবৃত্তি আর একটী প্রধান কারণ। সাহেবলোকেরা সর্ব্বপ্রকারে বিবিলোকের বাধ্য। কি করিলে কি হয়, তাহা বিবেচনা করিবার অগ্রে স্ত্রীলোকের কথায় কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে অনেক স্থলে অনর্থ ঘটে, শাস্ত্রে, ইতিহাসে ও গল্পে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে; নববঙ্গযুবকেরা সে সকল না দেখিয়াই—না বুঝিয়াই—ফলাফল চিন্তা না করিয়াই, কেবল সাহেবের অনুকরণে স্ত্রীবাধ্য হইতে অনুরাগী হইতেছেন, লোকে স্ত্রৈণ বলে, সে কথায় বধির হইতেছেন, দিন দিন এই রোগ সংক্রামক হইয়া উঠিতেছে। স্ত্রীর কথা একবারেই শুনিতে হইবে না কিম্বা সকল কথাই শুনিতে হইবে, আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রের কোন স্থানেই এরূপ উপদেশ নাই; শাস্ত্রের প্রতি অনাদর হওয়াতেই নানা প্রকার অনর্থকর ব্যাপারের সূত্রপাত হইতেছে।

স্ত্রীলোকর স্বাধীনপ্রবৃত্তি আমাদের সমাজের উপযোগিনী হইতে পারে না অথচ এখনকার স্ত্রীলোকেরা তাহাই ভালবাসে। সে ভালবাসা দুই পক্ষেই সমান। পুরুষেরা মনে করেন, নারীগণকে স্বাধীন করিতে পারিলে বাহাদুরী-লাভ হইবে, আমোদেরও জমাট বাঁধিবে। নারীগণ স্ব[illegible]ীনতা ভালবাসেন কেন, তাহার অনেকগুলি কারণ। সংসারের অনেকগুলি [illegible] ঘুচিয়া যায়। লজ্জা রাখিতে হয় না, ঘোমটা রাখিতে হয় না, কাহা[illegible] [illegible]খানে থাকিতে হয় না, খোলা বাতাসে বিহার করা হয়, বন্ধুগণে[illegible] [illegible] কথা বোধ[illegible] [illegible]

পারেন নাই, রবিন্‌সন্‌ও পারে নাই। বামদেব গৃহে না থাকিলে প্রায় প্রতিদিন নাগর-নাগরীর ঐরূপ সাক্ষাৎ আলাপ হইত।

সাহেব-সংসারে বাল্যবিবাহ চলে না। রবিন্‌সনের বয়ঃক্রম ষোড়শ কি সপ্তদশ বর্ষ, সেই বয়সে রবিন্‌সন্ পূর্ব্বানুরাগপাত্রী তরুণী উমাকালীকে বিবাহ করিয়াছিল, ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; অবস্থা স্মরণ করিয়া পাঠকমহাশয় হয় তো বলিতে পারিবেন, রবিন্‌সনের দোষ নাই, রবিন্‌সন্ স্বেচ্ছাক্রমে আপনাদের সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ করে নাই; রবিন্‌সন্ স্বেচ্ছাক্রমে বাল্যবিবাহের বন্ধু হয় নাই, যুবতী উমাকালীই তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল। রবিন্‌সনের অনুকূলে এইরূপ সাফাই সত্য সত্য বলবৎ হইবে কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

নরেশনন্দিনী উমাকালীর ভ্রাতৃজায়া;—স্বধর্ম্মে থাকিলে এক বাড়ীতে একত্র বাস করা সম্ভব হইত, নূতনধর্ম্ম-গ্রহণে উমাকালী এখন নরেশনন্দিনীর পর হইয়া গিয়াছে। রবিন্‌সন্ যে বাড়ীতে থাকে, উমাকালী এখন সেই বাড়ীতেই বাস করে। সে বাড়ীখানা নরেশনন্দিনীর বাড়ী হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূর। রবিন্‌সনে আর নরেশনন্দিনীতে কিরূপ লীলা-খেলা হয়, উমাকালী তাহা জানিতে পারে না। নরেশনন্দিনীর সহিত নূতন স্বামীর গুপ্তপ্রেম, উমাকালী যদি ইহা জানিতে পারিত, সাক্ষী-সাবুদ রাখিয়া উমাকালী তাহা হইলে ডাইভোর্স আইনের আশ্রয় লইতে পেছু-পা হইত না। সেরূপ অবস্থা ঘটিলে রবিন্‌সনের বদলে অন্য কোন ডিয়ারসন্ কিম্বা পিয়ারসন্ স্বচ্ছন্দে উমাকালীর উচ্ছিষ্ট প্রণয়কমলে নূতন মধুকর হইয়া বসিত।

সর্ব্বদা সেরূপ হইতে পায় না। সাহেবের সমাজ যে প্রকার উপাদানে গঠিত, তাহাতে সে সমাজের বন্ধন যেমন শক্ত, তেমনি শিথিল। নারীবন্ধু পুরুষবন্ধু সমান কথা;—নারীতে নারীতে নির্জ্জনে দেখা-সাক্ষাতে যেমন কোন দোষ ঘটে না, নারী-পুরুষে গুপ্তসাক্ষাৎ-আলাপেও সেইরূপ দোষ নাই, ইহাই ঐ সমাজের পদ্ধতি। সাহেবের সমাজে যে ভাব চলে, সাহেবের ধর্ম্ম যাহারা [illegible] করে, তাহা[illegible] সেই ভাব চালায়,—চালাইতে বাধ্য, ইহাও স্বীকার করিতে [illegible] গৃহে স্বামীর অসাক্ষাতে বন্ধুলোকের প্রবেশ, ইহা কোন [illegible] বাজারে, [illegible] হইতে পারে না। উমাকালীর গৃহেও ঐরূপ হইতে পারে, [illegible] লাভ [illegible]

পদ্মাবতীর গৃহেও হইতে পারে, ক্ষীরোদকুমারীর গৃহেও হইতে পারে; আরও যাহারা যাহারা ঐ ভাবে ঐ পথে আইসে, তাহাদের গৃহেও হইতে পারে। আদর্শানুরূপ প্রতিলিপি হয়, তাহার অন্যথা হইতে পারে না; যেখানে অন্যথা হয়, প্রতিলিপি সেখানে অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

বঙ্গের নারী-সংসার—হিন্দুর নারী-সংসার অনেক প্রকারেই ভঙ্গ হইয়া যাইতেছে। সংসার হইতে পৃথক্ থাকিবার ইচ্ছা, স্বাধীনতালাভ করিবার ইচ্ছা, পতির উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার ইচ্ছা, গৃহকার্য্য পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা, নিত্য নূতন নূতন ভোগবিলাসের ইচ্ছা, নারীগণের এই সকল ইচ্ছাতেই হিন্দু-পরিবারের সুশৃঙ্খলা বিনষ্ট হইতেছে। স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া ভিন্নধর্ম্ম-গ্রহণে উন্মত্ত হইয়া পুরুষেরা স্ব স্ব রমণীগণকে সেই পথে লইয়া গিয়া স্বতন্ত্র থাকিতেছেন, ইহাতেও হিন্দুর নারী-সংসার বিলক্ষণ আঘাত পাইতেছে। বৈদেশিক ব্যবহারের অনুকরণ-প্রবৃত্তি আর একটী প্রধান কারণ। সাহেবলোকেরা সর্ব্বপ্রকারে বিবিলোকের বাধ্য। কি করিলে কি হয়, তাহা বিবেচনা করিবার অগ্রে স্ত্রীলোকের কথায় কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে অনেক স্থলে অনর্থ ঘটে, শাস্ত্রে, ইতিহাসে ও গল্পে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে; নববঙ্গযুবকেরা সে সকল না দেখিয়াই—না বুঝিয়াই—ফলাফল চিন্তা না করিয়াই, কেবল সাহবের অনুকরণে স্ত্রীবাধ্য হইতে অনুরাগী হইতেছেন, লোকে স্ত্রৈণ বলে, সে কথায় বধির হইতেছেন, দিন দিন এই রোগ সংক্রামক হইয়া উঠিতেছে। স্ত্রীর কথা একবারেই শুনিতে হইবে না কিম্বা সকল কথাই শুনিতে হইবে, আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রের কোন স্থানেই এরূপ উপদেশ নাই; শাস্ত্রের প্রতি অনাদর হওয়াতেই নানা প্রকার অনর্থকর ব্যাপারের সূত্রপাত হইতেছে।

স্ত্রীলোকর স্বাধীনপ্রবৃত্তি আমাদের সমাজের উপযোগিনী হইতে পারে না অথচ এখনকার স্ত্রীলোকেরা তাহাই ভালবাসে। সে ভালবাসা দুই পক্ষেই সমান। পুরুষেরা মনে করেন, নারীগণকে স্বাধীন করিতে পারিলে বাহাদুরী-লাভ হইবে, আমোদেরও জমাট বাঁধিবে। নারীগণ স্বাধীনতা ভালবাসেন কেন, তাহার অনেকগুলি কারণ। সংসারের অনেকগুলি [illegible] ঘুচিয়া যায়। লজ্জা রাখিতে হয় না, ঘোমটা রাখিতে হয় না, কাহা[illegible] খানে থাকিতে হয় না, খোলা বাতাসে বিহার করা হয়, বন্ধুগণে[illegible] কথা বোধ [illegible] য়া [illegible]

বিহারে, তরণীবিহারে, নির্জ্জনবিহারে আনন্দলাভ করা যায়, কোন দিকে কোন
বাধাই থাকে না। উভয় পক্ষের মনোগত ভাবের সার সংগ্রহ করিয়া বুঝিলা
হইলে এই ফল পাওয়া যায় যে, শীঘ্র শীঘ্র হিন্দুসমাজের অধঃপতন।
খৃষ্টাশ্রয় গ্রহণ করিলে হিন্দু নারী হিন্দু-সংসার পরিত্যাগ করে, আর কোন
কারণে পরিত্যাগ করিয়া যায় না, এ কথাও ঠিক নহে। বর্ত্তমান যুগের অপর এক
আখ্যা উপধর্ম্মের যুগ। হিন্দু-নারী যে কোন উপধর্ম্মের দাসী হয়, সেই উপ
ধর্ম্মই তাহাদিগকে মাতৃসমাজ হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায়; তখন আ
তাহারা পিত্রালয়ের সহিত—শ্বশুরালয়ের সহিত কোন সংস্রব রাখিতে পারে না
সমাজ তজ্জন্য আক্ষেপ করিতে পারেন, কিন্তু তাহারা তাহাতে আনন্দ পায়
আনন্দলাভের নিগূঢ় কারণ ধর্ম্ম নহে, ভক্তি নহে, বিশ্বাস নহে, প্রধান কার
স্বাধীনতালাভ। হিন্দু-নারীকে লইয়া ব্রাহ্ম-সমাজে দলাদলি হইয়াছে; সে
দলাদলির ফলে এ পর্য্যন্ত কতকগুলি হিন্দু-নারী স্বাধীন হইয়া পিত্রালয় হইতে,
শ্বশুরালয় হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, যাঁহারা তালিকা রাখিতে জানেন, তালিক
রাখা যাঁহাদের প্রয়োজন, তাঁহারাই তদ্বিষয়ের সাক্ষী হইবেন।
সংসারে যাঁহাদের মাতা-পিতা বর্ত্তমান নাই, তাদৃশ পুরুষেরা উপধর্ম্মের সে
হইলে নিজে নিজেই সংসারের কর্ত্তা হন, তাঁহাদিগকে সংসারত্যাগ করিয়া যাই
হয় না; তাঁহাদের রমণীরাও ঘরে বসিয়া স্বাধীনতা-সুখ উপভোগ করিতে পা
ইহা এক প্রকার মন্দের ভাল, ফল কিন্তু এক। স্বামী উপধর্ম্ম গ্রহণ করিলে স্ত্রী
যদি তাহার অনুগামিনী হইতে না চায়, তাহা হইলে স্বামী তাহাকে বাহির ক
আনিবার জন্য স্বতঃ পরত নানাপ্রকার প্রলোভন দেখায়। স্ত্রীর যদি লেখা
জানা থাকে, পুনঃ পুনঃ ডাকযোগে পত্র লিখিয়া স্বামী তাহাকে অনেক প্র
উপদেশ দেয়। দুই একটী দৃষ্টান্ত আমাদের জানা আছে। হুগলী জেলার এক
ব্রাহ্মণ-কন্যা যৌবনের অঙ্কুরে পিত্রালয়ে বাস করিত, বাঁকুড়া জেলায় তাহার
শ্বশুরালয়; তাহার স্বামী খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে, যত দিন সেই কথা তাহার শ্বশুর
পরিবারের কর্ণগোচর হয় নাই, তত দিন সেই স্বামী মধ্যে মধ্যে রাত্রিযোগে গো
ভাবে শ্বশুরালয়ে যাইয়া স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিত; শ্বশুরালয়ে আহারাদি
স্পৃষ্ট অথবা উচ্ছিষ্ট পাছে কেহ খায়, কিঞ্চিৎ ধর্ম্মজ্ঞানপ্রভাবে
...কিত। দুই তিন মাসের মধ্যে পাঁচ সাতবার সেই ...

ঐরূপে শ্বশুরালয়ে গিয়া বালিকা স্ত্রীকে ফুস্‌লাইয়া, আপন মতে লওয়াইয়া সঙ্গে আসিতে রাজী করে। একদিন গভীর রাত্রে স্ত্রীকে জামা-জোড়া পরাইয়া, মাথায় পাগ্‌ড়ী বাঁধিয়া দিয়া, পুরুষ সাজাইয়া, মাঠের পথ দিয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। এরূপ আরও দৃষ্টান্ত মধ্যে মধ্যে শুনা যায়। পুরুষেরাই নারীসংসার নষ্ট করিবার মূল, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।

ধর্ম্মান্তরগ্রহণ উপলক্ষে ঐরূপ হইয়া আসিতেছিল, তাহার উপর আর একটা নূতন উপসর্গ দেখা দিয়াছে। বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশে যে সকল হিন্দু-সন্তান আজকাল কালাপানি পার হইয়া বিলাত-যাত্রা করেন, দেশে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি সাহসী পুরুষ এককালে বিলাতী ভাবাপন্ন হইয়া সহরের ইংরাজটোলা আশ্রয় করিয়া থাকেন; মাতাপিতা ভুলিয়া যান, মাতৃভাষা ভুলিয়া যান, হিন্দু-সংস্রবে ঘৃণা করেন, হিন্দু খাদ্যদ্রব্যের আস্বাদন তিক্তবোধ হয়, সর্ব্বপ্রকারেই সমাজ হইতে তাঁহারা স্বতন্ত্র হইয়া যান। বিলাতে গিয়া সকলে কিছু ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করেন না, তথাপি দেশে আসিয়া ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী অপেক্ষাও অধিক স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় হন। যাঁহাদের স্ত্রী থাকে, তাঁহারা সেই স্ত্রীগণকে বিবি সাজাইয়া নিকটে লইয়া রাখেন। হিন্দু আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে উল্টাইয়া যায়। দাসীর উপাধি হয় আয়া, চাকরের উপাধি হয় খানসামা, পাচকের উপাধি হয় বাবুর্চ্চী। তাহারাও যে হিন্দু-জাতি হইতে গৃহীত হয়, ইহাও তাঁহারা ইচ্ছা করেন না। হিন্দুর প্রতি তাঁহাদের কেমন এক প্রকার বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা জন্মিয়া থাকে। হেতু জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উত্তর দেন, "সমাজ আমাদিগকে গ্রহণ করে না, কাজেই আমাদিগকে স্বতন্ত্র থাকিতে হয়।" তাঁহাদের রমণীগণও লজ্জাসম্ভ্রমাদি বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। বিসর্জ্জন দেওয়া হয় বটে, কিন্তু অনেক দিনের অভ্যাস, সহজে অল্পদিনে সে অভ্যাস পরিত্যাগ করা কঠিন হইয়া উঠে। একটী ঘটনা আমাদের মনে হইতেছে। কালীঘাটের একটী বাবু একবার হাইকোর্টের একটী মকদ্দমায় জড়িত হন, তাঁহার একজন বারিষ্টার প্রয়োজন হয়; সাহেব বারিষ্টার অপেক্ষা বাঙ্গালী বারিষ্টারে খরচ অল্প হ... এই বিশ্বাসে সেই বাবুটী একজন বাঙ্গালী বারিষ্টারের নূতন নিকেতনে উপস্থি... আটটা। বাড়ীখানি চৌরঙ্গীতে ছিল, এ কথা বোধ হয় ...লিয়া ... উপস্থিত হইলেন. বারিষ্টার তখন ... করে...

বিহারে, তরণীবিহারে, নির্জ্জনবিহারে আনন্দলাভ করা যায়, কোন দিকে কোন
বাধাই থাকে না। উভয় পক্ষের মনোগত ভাবের সার সংগ্রহ করিয়া বুঝিয়া
লইলে এই ফল পাওয়া যায় যে, শীঘ্র শীঘ্র হিন্দুসমাজের অধঃপতন।

খৃষ্টাশ্রয় গ্রহণ করিলে হিন্দু নারী হিন্দু-সংসার পরিত্যাগ করে, আর কোন
কারণে পরিত্যাগ করিয়া যায় না, এ কথাও ঠিক নহে। বর্ত্তমান যুগের অপর এক
আখ্যা উপধর্ম্মের যুগ। হিন্দু-নারী যে কোন উপধর্ম্মের দাসী হয়, সেই উপ
ধর্ম্মই তাহাদিগকে মাতৃসমাজ হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায়; তখন আ[illegible]
তাহারা পিত্রালয়ের সহিত—শ্বশুরালয়ের সহিত কোন সংস্রব রাখিতে পারে না
সমাজ তজ্জন্য আক্ষেপ করিতে পারেন, কিন্তু তাহারা তাহাতে আনন্দ পায়
আনন্দলাভের নিগূঢ় কারণ ধর্ম্ম নহে, ভক্তি নহে, বিশ্বাস নহে, প্রধান কার[illegible]
স্বাধীনতালাভ। হিন্দু-নারীকে লইয়া ব্রাহ্ম-সমাজে দলাদলি হইয়াছে; সে[illegible]
দলাদলির ফলে এ পর্য্যন্ত কতকগুলি হিন্দু-নারী স্বাধীন হইয়া পিত্রালয় হইতে,
শ্বশুরালয় হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, যাঁহারা তালিকা রাখিতে জানেন, তালি[illegible]
রাখা যাঁহাদের প্রয়োজন, তাঁহারাই তদ্বিষয়ের সাক্ষী হইবেন।

সংসারে যাঁহাদের মাতা-পিতা বর্ত্তমান নাই, তাদৃশ পুরুষেরা উপধর্ম্মের সেব[illegible]
হইলে নিজে নিজেই সংসারের কর্ত্তা হন, তাঁহাদিগকে সংসারত্যাগ করিয়া যাই[illegible]
হয় না; তাঁহাদের রমণীরাও ঘরে বসিয়া স্বাধীনতা-সুখ উপভোগ করিতে পা[illegible]।
ইহা এক প্রকার মন্দের ভাল, ফল কিন্তু এক। স্বামী উপধর্ম্ম গ্রহণ করিলে স্ত্রী
যদি তাহার অনুগামিনী হইতে না চায়, তাহা হইলে স্বামী তাহাকে বাহির ক[illegible]
আনিবার জন্য স্বতঃ পরত নানাপ্রকার প্রলোভন দেখায়। স্ত্রীর যদি লেখা [illegible]
জানা থাকে, পুনঃ পুনঃ ডাকযোগে পত্র লিখিয়া স্বামী তাহাকে অনেক প্র[illegible]
উপদেশ দেয়। দুই একটী দৃষ্টান্ত আমাদের জানা আছে। হুগ্লী জেলার [illegible]
ব্রাহ্মণ-কন্যা যৌবনের অঙ্কুরে পিত্রালয়ে বাস করিত, বাঁকুড়া জেলায় তাহার
শ্বশুরালয়; তাহার স্বামী খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে, যত দিন সেই কথা তাহার শ্বশুর-
পরিবারের কর্ণগোচর হয় নাই, তত দিন সেই স্বামী মধ্যে মধ্যে রাত্রিযোগে [illegible]
ভাবে শ্বশুরা[illegible] যাইয়া স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিত; শ্বশুরালয়ে আহ[illegible]
[illegible] স্পৃষ্ট অথবা উচ্ছিষ্ট পাছে কেহ খায়, কিঞ্চিৎ ধর্ম্মজ্ঞান[illegible]
[illegible]কিত। দুই তিন [illegible]সের মধ্যে পাঁচ সাতবার সেই [illegible]

ঐরূপে শ্বশুরালয়ে গিয়া বালিকা স্ত্রীকে ফুস্‌লাইয়া, আপন মতে লওয়াইয়া সঙ্গে আসিতে রাজী করে। একদিন গভীর রাত্রে স্ত্রীকে জামা-জোড়া পরাইয়া, মাথায় পাগ্‌ড়ী বাঁধিয়া দিয়া, পুরুষ সাজাইয়া, মাঠের পথ দিয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। এরূপ আরও দৃষ্টান্ত মধ্যে মধ্যে শুনা যায়। পুরুষেরাই নারীসংসার নষ্ট করিবার মূল, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।

ধর্ম্মান্তরগ্রহণ উপলক্ষে ঐরূপ হইয়া আসিতেছিল, তাহার উপর আর একটা নূতন উপসর্গ দেখা দিয়াছে। বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশে যে সকল হিন্দু-সন্তান আজকাল কালাপানি পার হইয়া বিলাত-যাত্রা করেন, দেশে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি সাহসী পুরুষ এককালে বিলাতী ভাবাপন্ন হইয়া সহরের ইংরাজটোলা আশ্রয় করিয়া থাকেন; মাতাপিতা ভুলিয়া যান, মাতৃভাষা ভুলিয়া যান, হিন্দু-সংস্রবে ঘৃণা করেন, হিন্দু খাদ্যদ্রব্যের আস্বাদন তিক্তবোধ হয়, সর্ব্বপ্রকারেই সমাজ হইতে তাঁহারা স্বতন্ত্র হইয়া যান। বিলাতে গিয়া সকলে কিছু ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করেন না, তথাপি দেশে আসিয়া ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী অপেক্ষাও অধিক স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় হন। যাঁহাদের স্ত্রী থাকে, তাঁহারা সেই স্ত্রীগণকে বিবি সাজাইয়া নিকটে লইয়া রাখেন। হিন্দু আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে উল্টাইয়া যায়। দাসীর উপাধি হয় আয়া, চাকরের উপাধি হয় খানসামা, পাচকের উপাধি হয় বাবুর্চ্চী। তাহারাও যে হিন্দু-জাতি হইতে গৃহীত হয়, ইহাও তাঁহারা ইচ্ছা করেন না। হিন্দুর প্রতি তাঁহাদের কেমন এক প্রকার বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা জন্মিয়া থাকে। হেতু জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উত্তর দেন, “সমাজ আমাদিগকে গ্রহণ করে না, কাজেই আমাদিগকে স্বতন্ত্র থাকিতে হয়।” তাঁহাদের রমণীগণও লজ্জাসম্ভ্রমাদি বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। বিসর্জ্জন দেওয়া হয় বটে, কিন্তু অনেক দিনের অভ্যাস, সহজে অল্পদিনে সে অভ্যাস পরিত্যাগ করা কঠিন হইয়া উঠে। একটী ঘটনা আমাদের মনে হইতেছে। কালীঘাটের একটী বাবু একবার হাইকোর্টের একটী মকদ্দমায় জড়িত হন, তাঁহার একজন বারিষ্টার প্রয়োজন হয়; সাহেব বারিষ্টার অপেক্ষা বাঙ্গালী বারিষ্টারে খরচ অল্প হ[illegible] এই বিশ্বাসে সেই বাবুটী একজন বাঙ্গালী বারিষ্টারের নূতন নিকেতনে উপস্থি[illegible] ন[illegible] আটটা। বাড়ীখানি চৌরঙ্গীতে ছিল, এ কথা বোধ হয় [illegible]লিয়া [illegible] বাব[illegible] উপস্থিত হইলেন. বারিষ্টার তখন [illegible] করে[illegible]
[illegible]

একমহল, বারিষ্টারের বাড়ীতে সদর অন্দর থাকে না, একজন খানসামা সেই
বাবুটীকে দরদালানে বসিতে বলিল। দরদালানে একখানি বেঞ্চ পাতা ছিল,
বাবু সেই বেঞ্চের উপর উপবেশন করিয়া বারিষ্টারের গাত্রোত্থান প্রতীক্ষা করিতে
লাগিলেন। দক্ষিণদিকে একটা দরজা; সে দরজায় কপাট ছিল না, চৌকাঠের
মাথার উপর একটা ক্যাম্বিসের পর্দ্দা গুটান ছিল, ঐ দরজার দক্ষিণাংশে বা...
ষ্টারের শয়নকক্ষের বারান্দা; সেই বারান্দার রেলের ধারে ছোট একখা...
চৌকী পাতা, পার্শ্বে একটা জলের টব। কক্ষমধ্য হইতে একটী বিবি বা... র
হইলেন। বিলাতী বিবি নহে, বাঙ্গালী বিবি,—বারিষ্টারের পূর্ব্ব-বিবাহিতা ...
পত্নী। বিবিটী বারান্দায় সেই চৌকীর উপর বসিয়া মুখে চক্ষে জল দিতেছিলেন,
হঠাৎ উত্তরদিকে চাহিয়া দেখিলেন, পূর্ব্ব-কথিত সেই বাবুটী দরদালানে বেঞ্চের
উপর উপবিষ্ট। বিবির লজ্জা আসিল;—নূতন পুরুষ দেখিলে পূর্ব্বে ঘোমটা
দেওয়া অভ্যাস ছিল, হস্তভঙ্গী করিয়া ঘোমটা টানিবার চেষ্টা করিলেন;—না...
গাউন পরা, ঘোমটা উঠিল না। বিবি তখন কি করেন, মাথা হেঁট করিয়া, ...
হস্তে মুখ-চক্ষু ঢাকিয়া, খুব মিহি-সুরে ডাকিলেন, "আয়া—আয়া—আয়া!"

একজন আয়া ছুটিয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি দরজায় সেই পর্দ্দাটা ফেলিয়া দিল,
বিবির লজ্জারক্ষা হইল। যায় যায়, যায় না। অনেক দিনের অভ্যাস ঘোমটা
দেওয়া; সে অভ্যাস যায় যায় যায় না। ঐ প্রকারের বিবিরা মনে করেন, ...
জলাঞ্জলি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু লজ্জা তাঁহাদিগকে শীঘ্র ছাড়িয়া যায় না,—...
করিয়া ছাড়াইতে হয়।

বঙ্গের নারী-সংসার কি প্রকারে বিপর্য্যস্ত হইতেছে, বঙ্গের বন্ধুগণ তাহা ...
দেখিয়াও দেখিতেছেন না। সংসার হইতে বাহির করিয়া রমণীর লজ্জা-রক্ষা...
যতই রমণীগণকে নির্লজ্জ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, ততই তাঁহাদের ...
বাড়িতেছে। লজ্জা স্ত্রীজাতির অলঙ্কার; সকল দেশে সকল সমাজে ঘোমটার
গৌরব নাই বটে, কিন্তু রমণীর স্বভাবসুলভ যে একটী লজ্জা, বিনা ঘোমটাতেও
তাহার শক্তি ... প্রায়। বিদ্যা শিখিয়া, বিলাত হইতে আসিয়া, ...
... স্ত্রী... লজ্জা নষ্ট করিতেছেন, ইহাতে যে তাঁহাদের কি গৌরব ...
...কে লজ্জাশীলা রাখিলে তাঁহাদের অর্থোপার্জ্জনের যে কি
...ত হয় ... কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে পারেন না।

তাঁহাদের কেবল এক কথা,—"সমাজ আমাদিগকে গ্রহণ করে না, সমাজে আমরা
থাকিতে পারি না, বিবাহিতা পত্নীকেও ত্যাগ করিতে পারি না, সুতরাং পত্নীকে
নিকটে আনিয়া স্বাধীনতা দিতে হয়।"

মিথ্যা আপত্তি। সমাজ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করেন না, তাঁহারা সমাজকে
চাহেন, ইহা কি তাঁহারা সপ্রমাণ করিতে পারেন? সমুদ্রযাত্রায় জাতি যায়,
সমুদ্রপারে বিদ্যাশিক্ষা করিতে গেলে জাতি যায়, এ সংস্কার দিন দিন ঘুচিয়া
যাইতেছে; স্বধর্ম্মে অটল থাকিয়া সদাচারে দৃঢ়তা রাখিলে সমাজ কেনই বা
তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন? যাঁহারা বিলাত হইতে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া
প্রত্যাগত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই কি সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত?—কখনই
না। স্বদেশে আসিয়া যাঁহারা স্বধর্ম্মপালন করিতেছেন, সদাচারে রত থাকিতে-
ছেন, সমাজমধ্যে তাঁহারা সগৌরবে আদৃত হইতেছেন, তাদৃশ দৃষ্টান্ত আজকাল
বিরল নহে। ইহা জানিয়াও, স্বচক্ষে ইহা দেখিয়াও যাঁহারা সমাজের সহিত
মিশিতে চাহেন না, সমাজ হইতে দূরে থাকেন, তাঁহাদের প্রকৃতি কিরূপ,
বিজ্ঞলোকে তাহা বুঝিতে অক্ষম।

ঐ দলের মধ্যে এমন কেহ কেহ আছেন, তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া আক্ষেপ
উপস্থিত হয়। সাহেব সাজিয়া সাহেব হইতেই তাঁহাদের একান্ত অভিলাষ।
সাহেবেরা এ দেশে যেরূপ ব্যবহার করেন, যে ভাবে চলেন, যে ভাবে কথা কন,
যে ভাবে এ দেশের লোককে অবজ্ঞা করেন, বাঙ্গালী হইয়াও ঐ দলের নকল
সাহেবেরা ঠিক সেইরূপ, বরং কোন কোন অংশে অধিক রৌদ্রভাব প্রদর্শন করেন।
শরীর অসুস্থ হইলে তাঁহারা "হোমে" যান, "হোম" তাঁহাদিগের বিলাত। তাঁহা-
দের মধ্যে দুই একজন বিলাতে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া প্রকৃতই হোম বানাইয়াছেন।
এ দেশের ফিরিঙ্গীরা পুঁইপাড়া চিংড়ী খাইয়া যেমন গর্ব্ব করিয়া বলে, "মোদের
বেলাত," ঐ দলের বাঙ্গালী পাছে সেইরূপে "মোদের বেলাত" বলিয়া বাঁকা কথায়
লোকের কাছে পরিচয় দেন, এক একবার আমাদের সেই ভয় হয়। স্ত্রী গর্ভবতী
হইলে বিলাতে পাঠাইয়া দেওয়া কাহারও কাহারও ইচ্ছা; ... না, স্ত্রী বিলাতে
সন্তান প্রসব করিলে, সেই সন্তান ব্রিটিস্ বরণ (British born) অর্থাৎ ব্রিটিস...
আখ্যা প্রাপ্ত হইবে। যাহারা ব্রিটেন্ জাত, ভারত জাত লো...
... এ দেশে তাহারা ... অধিকার

একমহল, বারিষ্টারের বাড়ীতে সদর অন্দর থাকে না, একজন খানসামা সেই
বাবুটীকে দরদালানে বসিতে বলিল। দরদালানে একখানি বেঞ্চ পাতা ছিল,
বাবু সেই বেঞ্চের উপর উপবেশন করিয়া বারিষ্টারের গাত্রোত্থান প্রতীক্ষা করিতে
লাগিলেন। দক্ষিণদিকে একটা দরজা ; সে দরজায় কপাট ছিল না, চৌকাঠের
মাথার উপর একটা ক্যাম্বিসের পর্দ্দা গুটান ছিল, ঐ দরজার দক্ষিণাংশে বারি-
ষ্টারের শয়নকক্ষের বারান্দা ; সেই বারান্দার রেলের ধারে ছোট একখানা
চৌকী পাতা, পার্শ্বে একটা জলের টব। কক্ষমধ্য হইতে একটী বিবি বাহির
হইলেন। বিলাতী বিবি নহে, বাঙ্গালী বিবি,—বারিষ্টারের পূর্ব্ব-বিবাহিতা হিন্দু
পত্নী। বিবিটী বারান্দায় সেই চৌকীর উপর বসিয়া মুখে চক্ষে জল দিতেছিলেন,
হঠাৎ উত্তরদিকে চাহিয়া দেখিলেন, পূর্ব্ব-কথিত সেই বাবুটী দরদালানে বেঞ্চের
উপর উপবিষ্ট। বিবির লজ্জা আসিল ;—নূতন পুরুষ দেখিলে পূর্ব্বে ঘোমটা
দেওয়া অভ্যাস ছিল, হস্তভঙ্গী করিয়া ঘোমটা টানিবার চেষ্টা করিলেন ;—না
গাউন পরা, ঘোমটা উঠিল না। বিবি তখন কি করেন, মাথা হেঁট করিয়া, দুই
হস্তে মুখ-চক্ষু ঢাকিয়া, খুব মিহি-সুরে ডাকিলেন, "আয়া—আয়া—আয়া !"

একজন আয়া ছুটিয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি দরজায় সেই পর্দ্দাটা ফেলিয়া দিল,
বিবির লজারক্ষা হইল। যায় যায়, যায় না। অনেক দিনের অভ্যাস ঘোমটা
দেওয়া ; সে অভ্যাস যায় যায় যায় না। ঐ প্রকারের বিবিরা মনে করেন, [illegible]
জলাঞ্জলি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু লজ্জা তাঁহাদিগকে শীঘ্র ছাড়িয়া যায় না,—[illegible]
করিয়া ছাড়াইতে হয়।

বঙ্গের নারী-সংসার কি প্রকারে বিপর্য্যস্ত হইতেছে, বঙ্গের বন্ধুগণ তাহা [illegible]
দেখিয়াও দেখিতেছেন না। সংসার হইতে বাহির করিয়া রমণীর লজ্জা-রক্ষক [illegible]
যতই রমণীগণকে নির্লজ্জ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, ততই তাঁহাদের স্ফূর্ত্তি
বাড়িতেছে। লজ্জা স্ত্রীজাতির অলঙ্কার ; সকল দেশে সকল সমাজে ঘোমটার
গৌরব নাই বটে, কিন্তু রমণীর স্বভাবসুলভ যে একটী লজ্জা, বিনা ঘোমটাতেও
তাহার শক্তি [illegible]শ পায়। বিদ্যা শিখিয়া, বিলাত হইতে আসিয়া, [illegible]
[illegible] স্ত্রী[illegible]র লজ্জা নষ্ট করিতেছেন, ইহাতে যে তাঁহাদের কি গৌরব [illegible]
[illegible]গকে লজ্জাশীলা রাখিলে তাঁহাদের অর্থোপার্জ্জনের যে কি
[illegible]ত হয় [illegible] কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে [illegible] না।

তাঁহাদের কেবল এক কথা,—"সমাজ আমাদিগকে গ্রহণ করে না, সমাজে আমরা
থাকিতে পারি না, বিবাহিতা পত্নীকেও ত্যাগ করিতে পারি না, সুতরাং পত্নীকে
নিকটে আনিয়া স্বাধীনতা দিতে হয়।"

মিথ্যা আপত্তি। সমাজ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করেন না, তাঁহারা সমাজকে
চাহেন, ইহা কি তাঁহারা সপ্রমাণ করিতে পারেন ? সমুদ্রযাত্রায় জাতি যায়,
সমুদ্রপারে বিদ্যাশিক্ষা করিতে গেলে জাতি যায়, এ সংস্কার দিন দিন ঘুচিয়া
যাইতেছে ; স্বধর্ম্মে অটল থাকিয়া সদাচারে দৃঢ়তা রাখিলে সমাজ কেনই বা
তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন ? যাঁহারা বিলাত হইতে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া
প্রত্যাগত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই কি সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ?—কখনই
না। স্বদেশে আসিয়া যাঁহারা স্বধর্ম্মপালন করিতেছেন, সদাচারে রত থাকিতে-
ছেন, সমাজমধ্যে তাঁহারা সগৌরবে আদৃত হইতেছেন, তাদৃশ দৃষ্টান্ত আজকাল
বিরল নহে। ইহা জানিয়াও, স্বচক্ষে ইহা দেখিয়াও যাঁহারা সমাজের সহিত
মিশিতে চাহেন না, সমাজ হইতে দূরে থাকেন, তাঁহাদের প্রকৃতি কিরূপ,
বিজ্ঞলোকে তাহা বুঝিতে অক্ষম।

ঐ দলের মধ্যে এমন কেহ কেহ আছেন, তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া আক্ষেপ
উপস্থিত হয়। সাহেব সাজিয়া সাহেব হইতেই তাঁহাদের একান্ত অভিলাষ।
সাহেবেরা এ দেশে যেরূপ ব্যবহার করেন, যে ভাবে চলেন, যে ভাবে কথা কন,
যে ভাবে এ দেশের লোককে অবজ্ঞা করেন, বাঙ্গালী হইয়াও ঐ দলের নকল
সাহেবেরা ঠিক সেইরূপ, বরং কোন কোন অংশে অধিক রৌদ্রভাব প্রদর্শন করেন।
শরীর অসুস্থ হইলে তাঁহারা "হোমে" যান, "হোম" তাঁহাদিগের বিলাত। তাঁহা-
দের মধ্যে দুই একজন বিলাতে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া প্রকৃতই হোম বানাইয়াছেন।
এ দেশের ফিরিঙ্গীরা পুঁইখাড়া চিংড়ী খাইয়া যেমন গর্ব্ব করিয়া বলে, "মোদের
বেলাত," ঐ দলের বাঙ্গালী পাছে সেইরূপে "মোদের বেলাত" বলিয়া বাঁকা কথায়
লোকের কাছে পরিচয় দেন, এক একবার আমাদের সেই ভয় হয়। স্ত্রী গর্ভবতী
হইলে বিলাতে পাঠাইয়া দেওয়া কাহারও কাহারও ইচ্ছা ; [illegible] না, স্ত্রী বিলাতে
সন্তান প্রসব করিলে, সেই সন্তান ব্রিটিস্ বরণ (Brit[illegible] bor[illegible]) অর্থাৎ ব্রিটন[illegible]
আখ্যা প্রাপ্ত হইবে। যাহারা ব্রিটন্ জাত, ভারত জাত লো[illegible]
[illegible] এ দেশে তা[illegible]র ক[illegible] [illegible]ধিকার

অনুভব করিতেছে। পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিতেন, "ব্রিটন্-জাত পুরুষেরা কলিযুগের দেবতা।" ব্যবহার মিলাইয়া লইলে যথার্থই তাহা সুসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হয়। মহর্ষি বেদব্যাস বেদবিভাগকর্ত্তা বলিয়া দেব-গৌরব লাভ করিয়াছিলেন; কৃষ্ণদ্বীপে তাঁহার জন্ম, এই কারণে তাঁহার একটী নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন;—ব্রিটনকে শ্বেতদ্বীপ বলিতে যাঁহারা সন্দেহ রাখেন না, তাঁহারা ব্রিটন-জাত পুরুষগণকে "শ্বেতদ্বৈপায়ন" আখ্যা প্রদান করিতে পারেন। শ্বেতদ্বৈপায়নেরা এ দেশে দেবতুল্য পূজা প্রাপ্ত হন, মনে মনে তাঁহাদের এইরূপ বাসনা। কৃষ্ণ-বঙ্গবাসীর পুত্র শ্বেতদ্বীপে প্রসূত হইলে শ্বেতদ্বৈপায়নগণের সমানাধিকার লাভ করিবে, এরূপ আশা যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহারা বঙ্গবাসিগণকে ঘৃণা করিবেন, ইহা বড় বিচিত্র কথা নহে। তাঁহারা যাহাই করুন, তাঁহারা যাহাই ভাবুন, তাঁহারা যাহাই হউন, তাহাতে বঙ্গের বিশেষ ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই নাই; তাঁহারা যে বঙ্গে নারী-সংসারকে শ্রীভ্রষ্ট করিয়া তুলিতেছেন, সেই কথাই বড় শক্ত কথা।

যে সকল গৃহলক্ষ্মী গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়া অন্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছেন, তাঁহারা আর আমাদের নহেন, এই মনে করিয়া কতকটা নির্ব্বেদ সহ্য করা যায়, কিন্তু যাঁহারা গৃহে থাকিয়া সনাতন গৃহধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ অভ্যাস করিতেছেন, তাঁহাদের দ্বারা হিন্দুসংসারের কোন মঙ্গলের আশা নাই। ভিন্ন ভিন্ন দেশের জাতীয় আচার-ব্যবহার যে সকল পুস্তকে লেখা থাকে, সেই সকল পুস্তক পাঠ করিয়া বঙ্গকামিনীর এক প্রকার শিক্ষালাভ হয়; নারীগণ স্বাধীন হইলে কত সুখ, সেই বিষয় যে সকল পুস্তকে লেখা থাকে, তাহা পাঠ করিয়া বঙ্গকামিনীর এক প্রকার লোভ জন্মে; স্বাধীনা অঙ্গনাগণের সৌভাগ্যের কথা যে সকল উপন্যাসপুস্তকে লেখা থাকে, তাহা পাঠ করিয়া শিক্ষিতা বঙ্গকামিনীরা চমৎকার কুহকে আকৃষ্ট হয়। এই তো গেল পুস্তকপাঠের ফল; তাহা ছাড়া নূতন নূতন প্রলোভনের আরও সামগ্রী আছে। বড়মানুষের বাড়ীর পার্শ্বে গরীবের বাস, বড়মানুষের বধূরা মহামূল্য অলঙ্কার-বস্ত্র পরিধান করিয়া যে প্রকার বিলাসে লালিতা হয়, গরী[illegible] অহরহ তাহা দর্শন করে, সেইরূপ ভোগবিলাসে [illegible]দের ইচ্ছা [illegible] স্বা[illegible]র সামর্থ্য আছে কি না, তাহা বিবেচনা করিবার [illegible]র [illegible] মাসিক আয় [illegible]দশ মুদ্রামাত্র, সে স্বচ্ছন্দে অম্লান-[illegible] ক[illegible] নিযুক্ত ক[illegible]রিয়া দাও, রন্ধনের [illegible]

ধরে, উত্তাপ সহ্য হয় না, অমুকের স্ত্রীর যেমন কণ্ঠহার আছে, আমাকে সেই রকম একছড়া হার গড়াইয়া দাও, তরুবালার যেমন সবুজ সাটিনের পোষাক আছে, আমাকে সেই রকম একটা পোষাক কিনিয়া দাও," ইত্যাকার নানাপ্রকার বাহনায় স্বামীকে নিত্য নিত্য জ্বালাতন করিয়া তুলে। একটী পূর্ণগর্ভা দরিদ্ররমণী তাহার স্বামীকে বলিয়াছিল, "পাশের বাড়ীতে বিবি ধাত্রী আসিয়াছিল, আমার প্রসবের সময় সেইরূপ ধাত্রী না আসিলে আমি প্রসব করিব না।" এই গেল ঐশ্বর্য্যদর্শনের ফল। তৃতীয় প্রলোভন আরও কিছু বেশী ভয়ঙ্কর। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কলিকাতায় দিন দিন বেশ্যা-নিবাসের অসম্ভব আধিক্য; সেই সকল নিবাসের নির্দ্দিষ্ট পল্লী নাই; যেখানে যাহাদের ইচ্ছা, বেশ্যারা সেইখানেই বাসস্থান মনোনীত করে। গৃহস্থালয়ের গাত্রে গাত্রে বেশ্যার বাস;—গৃহস্থকন্যারা নিত্য নিত্য সেই সকল কুলটার বিচিত্র বসনভূষণ, বিচিত্র কেশবিন্যাস, বিচিত্র হাবভাব লীলা-বিলাস দর্শন করিয়া চঞ্চলা হইয়া থাকে, ভিতরের যন্ত্রণা বিবেচনা করিতে পারে না; যাহাদের বুদ্ধি অল্প, বিলাসেচ্ছা প্রবলা, তাহারা সেইরূপ সুখবিলাসে মনে মনে অভিলাষিণী হয়; কাহারও কাহারও কপাল ভাঙ্গিয়া যায়, পতঙ্গ যেমন জ্বলন্ত অনলে ঝাঁপ দিয়া মরে, ঐ প্রকারের গৃহপিঞ্জরের বিহঙ্গিনারা কেহ কেহ ঐরূপ বিষম দৃষ্টান্ত দর্শনে পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া পিশাচী গণিকাদলের পুষ্টিসাধন করে; পলায়নের ইচ্ছায় বাধা পাইলে কেহ কেহ উদ্বন্ধনে অথবা বিষপানে আত্মহত্যাও করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে শুনা যাইত, শাশুড়ী-ননদের গঞ্জনায় বঙ্গের কুলবধূরা বহুযন্ত্রণা সহ্য করিত, কেহ কেহ সেই যন্ত্রণার দায় হইতে মুক্ত হইবার অভিলাষে কুলের বাহির হইয়া যাইত, কেহ কেহ জীবনবিসর্জ্জন দিয়া সংসার-যন্ত্রণা এড়াইত, এখন অনেক স্থলে তাহার বিপরীত ঘটিতেছে।

এখনকার বধূরা প্রায়ই শাশুড়ী-ননদকে গ্রাহ্য করেন না, বধূর গঞ্জনায়—বধূর তাড়নায় শাশুড়ী-ননদেরা সর্ব্বদাই অস্থির;—মর্ম্মান্তিক যাতনায় প্রতিদিন তাহাদিগকে অশ্রুপাত করিতে হয়। বধূগণের প্রতিকূলাচরণে পুত্রগণও জননার প্রতি ভক্তিশূন্য হইতেছে। বধূরা বাবু হইয়া বসিয়া থাকে, বৃদ্ধা শা[illegible]রা দাসীর ন্যায় গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হন। হিন্দু সংসারে এ[illegible]হার আছে, যখন বিবাহযাত্রা করে, জননী ত[illegible] জিজ্ঞাসা করেন, [illegible] এবং [illegible] "মা! তোমার [illegible]দী আনি[illegible] ভাড়ম্বার[illegible] [illegible]কারের এক প্রকা[illegible] অলঙ্কার[illegible]

অনুভব করিতেছে। পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিতেন, "ব্রিটন্-জাত পুরুষেরা কলিযুগের দেবতা।" ব্যবহার মিলাইয়া লইলে যথার্থই তাহা সুসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হয়। মহর্ষি বেদব্যাস বেদবিভাগকর্ত্তা বলিয়া দেব-গৌরব লাভ করিয়াছিলেন; কৃষ্ণদ্বীপে তাঁহার জন্ম, এই কারণে তাঁহার একটী নাম কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন;—ব্রিটনকে শ্বেতদ্বীপ বলিতে যাঁহারা সন্দেহ রাখেন না, তাঁহারা ব্রিটন-জাত পুরুষগণকে "শ্বেতদ্বৈপায়ন" আখ্যা প্রদান করিতে পারেন। শ্বেতদ্বৈপায়নেরা এ দেশে দেবতুল্য পূজা প্রাপ্ত হন, মনে মনে তাঁহাদের এইরূপ বাসনা। কৃষ্ণ-বঙ্গবাসীর পুত্র শ্বেতদ্বীপে প্রসূত হইলে শ্বেতদ্বৈপায়নগণের সমানাধিকার লাভ করিবে, এরূপ আশা যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহারা বঙ্গবাসিগণকে ঘৃণা করিবেন, ইহা বড় বিচিত্র কথা নহে। তাঁহারা যাহাই করুন, তাঁহারা যাহাই ভাবুন, তাঁহারা যাহাই হউন, তাহাতে বঙ্গের বিশেষ ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই নাই; তাঁহারা যে বঙ্গের নারী-সংসারকে শ্রীভ্রষ্ট করিয়া তুলিতেছেন, সেই কথাই বড় শক্ত কথা।

যে সকল গৃহলক্ষ্মী গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়া অন্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছেন, তাঁহারা আর আমাদের নহেন, এই মনে করিয়া কতকটা নির্ব্বেদ সহ্য করা যায়, কিন্তু যাঁহারা গৃহে থাকিয়া সনাতন গৃহধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ অভ্যাস করিতেছেন, তাঁহাদের দ্বারা হিন্দুসংসারের কোন মঙ্গলের আশা নাই। ভিন্ন ভিন্ন দেশের জাতীয় আচার-ব্যবহার যে সকল পুস্তকে লেখা থাকে, সেই সকল পুস্তক পাঠ করিয়া বঙ্গকামিনীর এক প্রকার শিক্ষালাভ হয়; নারীগণ স্বাধীন হইলে কত সুখ, সেই বিষয় যে সকল পুস্তকে লেখা থাকে, তাহা পাঠ করিয়া বঙ্গকামিনীর এক প্রকার লোভ জন্মে; স্বাধীনা অঙ্গনাগণের সৌভাগ্যের কথা যে সকল উপন্যাসপুস্তকে লেখা থাকে, তাহা পাঠ করিয়া শিক্ষিতা বঙ্গকামিনীরা চমৎকার কুহকে আকৃষ্ট হয়। এই তো গেল পুস্তকপাঠের ফল; তাহা ছাড়া নূতন নূতন প্রলোভনের আরও সামগ্রী আছে। বড়মানুষের বাড়ীর পার্শ্বে গরীবের বাস, বড়মানুষের বধূরা মহামূল্য অলঙ্কার-বস্ত্র পরিধান করিয়া যে প্রকার বিলাসে লালিতা হয়, গরী[illegible] অহরহ তাহা দর্শন করে, সেইরূপ ভোগবিলাসে [illegible]দের ইচ্ছা [illegible] স্বা[illegible]র সামর্থ্য আছে কি না, তাহা বিবেচনা করিবার [illegible]র[illegible]। মাসিক আয় [illegible]দশ মুদ্রামাত্র, সে স্বচ্ছন্দে অম্লান-[illegible] ক[illegible] নিযুক্ত ক[illegible]রিয়া দাও, রন্ধনের [illegible]

ধরে, উত্তাপ সহ্য হয় না, অমুকের স্ত্রীর যেমন কণ্ঠহার আছে, আমাকে সেই রকম একছড়া হার গড়াইয়া দাও, তরুবালার যেমন সবুজ সাটিনের পোষাক আছে, আমাকে সেই রকম একটা পোষাক কিনিয়া দাও," ইত্যাকার নানাপ্রকার বাহনায় স্বামীকে নিত্য নিত্য জ্বালাতন করিয়া তুলে। একটী পূর্ণগর্ভা দরিদ্ররমণী তাহার স্বামীকে বলিয়াছিল, "পাশের বাড়ীতে বিবি ধাত্রী আসিয়াছিল, আমার প্রসবের সময় সেইরূপ ধাত্রী না আসিলে আমি প্রসব করিব না।" এই গেল ঐশ্বর্য্যদর্শনের ফল। তৃতীয় প্রলোভন আরও কিছু বেশী ভয়ঙ্কর। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কলিকাতায় দিন দিন বেশ্যা-নিবাসের অসম্ভব আধিক্য; সেই সকল নিবাসের নির্দ্দিষ্ট পল্লী নাই; যেখানে যাহাদের ইচ্ছা, বেশ্যারা সেইখানেই বাসস্থান মনোনীত করে। গৃহস্থালয়ের গাত্রে গাত্রে বেশ্যার বাস;—গৃহস্থকন্যারা নিত্য নিত্য সেই সকল কুলটার বিচিত্র বসনভূষণ, বিচিত্র কেশবিন্যাস, বিচিত্র হাবভাব লীলা-বিলাস দর্শন করিয়া চঞ্চলা হইয়া থাকে, ভিতরের যন্ত্রণা বিবেচনা করিতে পারে না; যাহাদের বুদ্ধি অল্প, বিলাসেচ্ছা প্রবলা, তাহারা সেইরূপ সুখবিলাসে মনে মনে অভিলাষিণী হয়; কাহারও কাহারও কপাল ভাঙ্গিয়া যায়, পতঙ্গ যেমন জ্বলন্ত অনলে ঝাঁপ দিয়া মরে, ঐ প্রকারের গৃহপিঞ্জরের বিহঙ্গিনারা কেহ কেহ ঐরূপ বিষম দৃষ্টান্ত দর্শনে পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া পিশাচী গণিকাদলের পুষ্টিসাধন করে; পলায়নের ইচ্ছায় বাধা পাইলে কেহ কেহ উদ্বন্ধনে অথবা বিষপানে আত্মহত্যাও করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে শুনা যাইত, শাশুড়ী-ননদের গঞ্জনায় বঙ্গের কুলবধূরা বহুযন্ত্রণা সহ্য করিত, কেহ কেহ সেই যন্ত্রণার দায় হইতে মুক্ত হইবার অভিলাষে কুলের বাহির হইয়া যাইত, কেহ কেহ জীবনবিসর্জ্জন দিয়া সংসার-যন্ত্রণা এড়াইত, এখন অনেক স্থলে তাহার বিপরীত ঘটিতেছে।

এখনকার বধূরা প্রায়ই শাশুড়ী-ননদকে গ্রাহ্য করেন না, বধূর গঞ্জনায়—বধূর তাড়নায় শাশুড়ী-ননদেরা সর্ব্বদাই অস্থির;—মর্ম্মান্তিক যাতনায় প্রতিদিন তাহাদিগকে অশ্রুপাত করিতে হয়। বধূগণের প্রতিকূলাচরণে পুত্রগণও জননার প্রতি ভক্তিশূন্য হইতেছে। বধূরা বাবু হইয়া বসিয়া থাকে, বৃদ্ধা শা[illegible]রা দাসীর ন্যায় গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হন। হিন্দু সংসারে এ[illegible]হার আ[illegible]। যখন বিবাহযাত্রা করে, জননী ত[illegible] জিজ্ঞাসা করেন, [illegible] "মা! তোমার [illegible]দী আ[illegible] [illegible]ক্কারের এক প্রকা[illegible] অলঙ্কা[illegible]

যেদিক্ দিয়াই হউক, অলঙ্কারের সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছে। অলঙ্কারে অহঙ্কার
হয়, সে কথা এখন ডুবিয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকের অহঙ্কার কেবল অলঙ্কারের সঙ্গে
গাঁথা, এমন কথাও বলা যায় না। ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে অহঙ্কার আইসে, এ কথা
স্বীকার্য্য, তথাপি স্ত্রীজাতির অহঙ্কারের আরও অনেক প্রকার হেতু আছে। যাঁহারা
আমাদের সামাজিক অবস্থা জানেন, তাঁহাদের নিকটে নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া
অনাবশ্যক। অহঙ্কারে উন্মত্তা হইয়া কতকগুলি বঙ্গকামিনী এক এক প্রকার
স্বেচ্ছাচারে বঙ্গের নারী-সংসার উৎসন্ন দিবার পন্থা পরিষ্কার করিতেছে।

তর্ক উঠিতে পারিবে, যতগুলি কথা বলা হইল, তৎসমস্তই কলিকাতার কথা।
কলিকাতার সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইলে সমগ্র বঙ্গসমাজ বিপ্লুত হইয়া যাইবে
ইহা অগ্রাহ্য। যাঁহারা ভাবেন অগ্রাহ্য, তাঁহাদের তর্কও অগ্রাহ্য। কত স্থানে
কত প্রকারে কত দৃষ্টান্তে প্রকাশ পাইতেছে, রাজধানীর হাওয়া অতি শীঘ্র শী
প্রদেশে প্রদেশে প্রবাহিত হইতেছে। নারীরাই নারী-সংসার ভঙ্গ করিতেছে
এ কথা ঠিক নহে, পুরুষের যোগ না থাকিলে এই হতভাগ্য দেশের এম
দুর্দ্দশা হইত না। যাঁহারা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বঙ্গের প্রদেশগুলি দর্শন করিয়াছেন, সূক্ষ্
দর্শনে যাঁহারা মফস্বলের পূর্ব্বাবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থা মিলাইয়া দেখিয়াছে
তাঁহারাই বুঝিয়াছেন, প্রত্যেক বিংশতি বৎসরে, প্রত্যেক দশম বৎসরে, প্রত্যে
পঞ্চম বৎসরে, এমন কি, প্রত্যেক সম্বৎসরে কতদূর পরিবর্ত্তন। সর্ব্বত্রই পরিবর্ত্
ঘটে। পরিবর্ত্তনে ভাল মন্দ দুইই থাকে। আমাদের দেশের পরিবর্ত্তনগু
ভালপথে ধাবিত হইতেছে না, মন্দের দিকেই ছুটিয়া চলিতেছে, ইহাই অমঙ্গে
কারণ ;—অমঙ্গলের কারণ বলিয়াই আক্ষেপের কারণ। মফস্বলের লো
কলিকাতায় আসিতেছে, কলিকাতার জল-হাওয়ায় তাহাদিগের হৃদয় জুড়াইতে
কলিকাতার দুর্দ্দশাকে তাহারা সৌভাগ্য মনে করিতেছে, সেই সৌভাগ্যবৃ
কলম বাঁধিয়া কলমের চারাগুলি স্ব স্ব গ্রামে লইয়া গিয়া রোপণ করিতে ;
অতি অল্পদিনেই কলমের গাছে ফল ধরে ; শীঘ্র শীঘ্রই মফস্বলের উদ্যা
উদ্যানে নূতন ... ফল ফলিতেছে ... ফল দুই প্রকার ;—অমৃতফল ও বিষফ ।
... মে ... মোক্ত ফল অতি বিরল।
... র উদ্যান। পৃ ... সমস্ত রাজধানীই পাপের উ ... ন

মফস্বলে যাইতেছে, কলিকাতার পুণ্য যদি কিছু থাকে, তাহা মফস্বলে যাইতেছে না ; মফস্বলের পুণ্য কলিকাতায় আসিতে পারে, কিন্তু পাপের সহিত মিশ্রিত হইয়া রসায়ন-শাস্ত্রের মর্য্যাদানুসারে তাহা বিকৃতভাব ধারণ করিতেছে।

নারী-সংসার নষ্ট হইবার আর একটা নূতন কারণ। বঙ্গে হিন্দু-নারীর সতীত্বধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসনীয়। হিন্দুবিধবার বিবাহের হুজুগ সেই প্রশংসাকে ডুবাইয়া দিবার উপক্রম করিতেছিল। বিধবা-বিবাহ চলে নাই, কিন্তু ভিতরে ভিতরে প্রধূমিত হইতেছে। যে সকল রমণী স্বাধীনা হইতেছে, তাহাদের মনে একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, পতির মৃত্যু হইলে তাহারা বিধবা হইবে না ; পুনঃ পুনঃ নূতন নূতন পতিগ্রহণ করিতে পারিবে। এই বিশ্বাস মহা অনর্থের মূল। এই মূল হইতেই অঙ্কুর বাহির হইয়া বঙ্গের সতী-সংসার কণ্টকীলতায় জড়াইয়া ফেলিবে, "পতি মোলে হাতের বালা খুলবো না লো খুলবো না," নাট-মন্দিরের রঙ্গমঞ্চের এই গীত তাহা বুঝাইয়া দিতেছে।

পতিব্রতা নারী বঙ্গ-সংসারের ভূষণ। পতিভক্তি কুরূপা নারীর অতুল্য রূপ। পতিই স্ত্রীলোকের গুরু, পতিই দেবতা ; পতিভক্তি ভিন্ন স্ত্রীলোকের অন্য কোন ব্রত নাই ; পতিসেবাই স্ত্রীজাতির পরম ধর্ম্ম। শাস্ত্রপ্রমাণে এই বিশ্বাস থাকাতে বঙ্গের হিন্দু-সংসারের স্ত্রীলোকেরা কায়মনোবাক্যে পতিসেবা করেন। পতির মৃত্যু হইলে স্ত্রীলোকের জীবন শূন্যময় বোধ হয়, সংসারের সকল সুখ ফুরাইয়া যায় ; এই কারণেই পতিব্রতা রমণীগণ পতি-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন। এক পতি মরিলে নূতন পতি প্রাপ্ত হইবে, এমন ধারণা যদি থাকে, তাহা হইলে স্ত্রীলোকেরা পতি-সেবায় যত্নবতী হইবে না, পতির মঙ্গলামঙ্গলে ভ্রূক্ষেপ রাখিবে না, অন্য জাতির দৃষ্টান্ত দর্শনে তাহা বিলক্ষণ বুঝা যায়। হিন্দু-রমণীর বৈধব্যযন্ত্রণা দর্শন করিয়া সকলের শোক উপস্থিত হয়, হিন্দু-বিধবার ম্লানবদন নিরীক্ষণ করিলে হৃদয়বান্ লোকের হৃদয়ে বেদনা লাগে, কিন্তু পুত্র-পৌত্রবতী বিধবাকে দেখিলে তাদৃশ শোক হয় না। মহাজনবাক্য আছে, "অশোচ্যা বিধবা নারী পুত্র-পৌত্রপ্রতিষ্ঠিতা।"—এখন বিবে ... করা হউক, তাদৃশী অশোচ্যা বিধবা যদি দ্বিতীয়বার পতিগ্রহণে ভিলা ... হইলে বঙ্গ-সংসারের কি অবস্থা দাঁ ... ইবে। স্বাধীন-প্র ...
কো ... লে তাহা যে ঘ ...

যেদিক্ দিয়াই হউক, অলঙ্কারের সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছে। অলঙ্কারে অহঙ্কার
হয়, সে কথা এখন ডুবিয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকের অহঙ্কার কেবল অলঙ্কারের সঙ্গে
গাঁথা, এমন কথাও বলা যায় না। ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে অহঙ্কার আইসে, এ কথা
স্বীকার্য্য, তথাপি স্ত্রীজাতির অহঙ্কারের আরও অনেক প্রকার হেতু আছে। যাঁহারা
আমাদের সামাজিক অবস্থা জানেন, তাঁহাদের নিকটে নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া
অনাবশ্যক। অহঙ্কারে উন্মত্তা হইয়া কতকগুলি বঙ্গকামিনী এক এক প্রকার
স্বেচ্ছাচারে বঙ্গের নারী-সংসার উৎসন্ন দিবার পন্থা পরিষ্কার করিতেছে।

তর্ক উঠিতে পারিবে, যতগুলি কথা বলা হইল, তৎসমস্তই কলিকাতার কথা।
কলিকাতার সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইলে সমগ্র বঙ্গসমাজ বিপ্লুত হইয়া যাইবে
ইহা অগ্রাহ্য। যাঁহারা ভাবেন অগ্রাহ্য, তাঁহাদের তর্কও অগ্রাহ্য। কত স্থানে
কত প্রকারে কত দৃষ্টান্তে প্রকাশ পাইতেছে, রাজধানীর হাওয়া অতি শীঘ্র শী
প্রদেশে প্রদেশে প্রবাহিত হইতেছে। নারীরাই নারী-সংসার ভঙ্গ করিতেছে
এ কথা ঠিক নহে, পুরুষের যোগ না থাকিলে এই হতভাগ্য দেশের এম
দুর্দ্দশা হইত না। যাঁহারা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বঙ্গের প্রদেশগুলি দর্শন করিয়াছেন, সূক্ষ
দর্শনে যাঁহারা মফস্বলের পূর্ব্বাবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থা মিলাইয়া দেখিয়াছে
তাঁহারাই বুঝিয়াছেন, প্রত্যেক বিংশতি বৎসরে, প্রত্যেক দশম বৎসরে, প্রত্যে
পঞ্চম বৎসরে, এমন কি, প্রত্যেক সম্বৎসরে কতদূর পরিবর্ত্তন। সর্ব্বত্রই পরিবর্ত
ঘটে। পরিবর্ত্তনে ভাল মন্দ দুইই থাকে। আমাদের দেশের পরিবর্ত্তনগু
ভালপথে ধাবিত হইতেছে না, মন্দের দিকেই ছুটিয়া চলিতেছে, ইহাই অমঙ্গ
কারণ;—অমঙ্গলের কারণ বলিয়াই আক্ষেপের কারণ। মফস্বলের লো
কলিকাতায় আসিতেছে, কলিকাতার জল-হাওয়ায় তাহাদিগের হৃদয় জুড়াইতে
কলিকাতার দুর্দ্দশাকে তাহারা সৌভাগ্য মনে করিতেছে, সেই সৌভাগ্যবৃ
কলম বাঁধিয়া কলমের চারাগুলি স্ব স্ব গ্রামে লইয়া গিয়া রোপণ করিতে ;
অতি অল্পদিনেই কলমের গাছে ফল ধরে; শীঘ্র শীঘ্রই মফস্বলের উদ্যান
উদ্যানে নূতন [illegible] ফল ফলিতেছে। ফল দুই প্রকার;—অমৃতফল ও বিষফ।
[illegible] ক্রমে [illegible] মোক্ত ফল অতি বিরল।
[illegible] র উদ্যান। পৃথিবী সমস্ত রাজধানীই পাপের উদ্যান
[illegible]

মফস্বলে যাইতেছে, কলিকাতার পুণ্য যদি কিছু থাকে, তাহা মফস্বলে যাইতেছে না; মফস্বলের পুণ্য কলিকাতায় আসিতে পারে, কিন্তু পাপের সহিত মিশ্রিত হইয়া রসায়ন-শাস্ত্রের মর্য্যাদানুসারে তাহা বিকৃতভাব ধারণ করিতেছে।

নারী-সংসার নষ্ট হইবার আর একটা নূতন কারণ। বঙ্গে হিন্দু-নারীর সতীত্বধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসনীয়। হিন্দুবিধবার বিবাহের হুজুগ সেই প্রশংসাকে ডুবাইয়া দিবার উপক্রম করিতেছিল। বিধবা-বিবাহ চলে নাই, কিন্তু ভিতরে ভিতরে প্রধূমিত হইতেছে। যে সকল রমণী স্বাধীনা হইতেছে, তাহাদের মনে একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, পতির মৃত্যু হইলে তাহারা বিধবা হইবে না; পুনঃ পুনঃ নূতন নূতন পতিগ্রহণ করিতে পারিবে। এই বিশ্বাস মহা অনর্থের মূল। এই মূল হইতেই অঙ্কুর বাহির হইয়া বঙ্গের সতী-সংসার কণ্টকীলতায় জড়াইয়া ফেলিবে, "পতি মোলে হাতের বালা খুলবো না লো খুলবো না," নাট-মন্দিরের রঙ্গমঞ্চের এই গীত তাহা বুঝাইয়া দিতেছে।

পতিব্রতা নারী বঙ্গ-সংসারের ভূষণ। পতিভক্তি কুরূপা নারীর অতুল্য রূপ। পতিই স্ত্রীলোকের গুরু, পতিই দেবতা; পতিভক্তি ভিন্ন স্ত্রীলোকের অন্য কোন ব্রত নাই; পতিসেবাই স্ত্রীজাতির পরম ধর্ম্ম। শাস্ত্রপ্রমাণে এই বিশ্বাস থাকাতে বঙ্গের হিন্দু-সংসারের স্ত্রীলোকেরা কায়মনোবাক্যে পতিসেবা করেন। পতির মৃত্যু হইলে স্ত্রীলোকের জীবন শূন্যময় বোধ হয়, সংসারের সকল সুখ ফুরাইয়া যায়; এই কারণেই পতিব্রতা রমণীগণ পতি-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন। এক পতি মরিলে নূতন পতি প্রাপ্ত হইবে, এমন ধারণা যদি থাকে, তাহা হইলে স্ত্রীলোকেরা পতি-সেবায় যত্নবতী হইবে না, পতির মঙ্গলামঙ্গলে ভ্রূক্ষেপ রাখিবে না, অন্য জাতির দৃষ্টান্ত দর্শনে তাহা বিলক্ষণ বুঝা যায়। হিন্দু-রমণীর বৈধব্যযন্ত্রণা দর্শন করিয়া সকলের শোক উপস্থিত হয়, হিন্দু-বিধবার ম্লানবদন নিরীক্ষণ করিলে হৃদয়বান্ লোকের হৃদয়ে বেদনা লাগে, কিন্তু পুত্র-পৌত্রবতী বিধবাকে দেখিলে তাদৃশ শোক হয় না। মহাজনবাক্য আছে, "অশোচ্যা বিধবা নারী পুত্র-পৌত্রপ্রতিষ্ঠিতা।"—এখন বিবেচনা করা হউক, তাদৃশী অশোচ্যা বিধবা যদি দ্বিতীয়বার পতিগ্রহণে [illegible] হয়, হইলে বঙ্গ-সংসারের কি অবস্থা দাঁড়াইবে। স্বাধীন-প্র [illegible]
[illegible] তাহা যে [illegible]

কেন না, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বিধবা-বিবাহ" পুস্তক যখন বাজারে বাহির হয়, বিধবা-বিবাহের কথা লইয়া চতুর্দ্দিকে যখন মহা আন্দোলন হয়, সেই সম বাজারে একটা গীত উঠিয়াছিল, "সাত ছেলের মা পতি পাবে, আহলাদে আটখানা।"

পতিবিয়োগে সতী যদি কাতরা না হইয়া নূতন পতি পাইবার লো আহলাদে আটখানা হয়, তাহা হইলে বঙ্গে আর সতীত্ব-গৌরব থাকিবে না তীত্ব-গৌরব আছে বলিয়াই নিজ সংসারে নারীগণের এতাধিক যত্ন দৃষ্ট হয় বিধবা হওবার ভয় না থাকিলে নারীগণ কদাচ পতিসেবায় অনুরাগিণী হইবে না। পর্য্যায়ক্রমে যতগুলি পতি হইবে, একনারী ততগুলি পতির প্রতি সমান ভা রাখিতে পারিবে, এরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র। বিধবার সন্তানেরা নূ পিতা প্রাপ্ত হইলে যদি তুষ্ট হইতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের জননী নূ পতি পাইয়া তুষ্ট হইতে পারিবে, এরূপ অনুমান করা প্রকৃতিসঙ্গত হই পারে না। একজনের প্রতি ভক্তি জন্মিলে, এক সংসারের উপর মায়া বসি নারী যেমন মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক সংসারপালন কর সেই মায়া-ভক্তি অটল রাখিতে পারে, সেই সংসারে সে যেমন সুখী হয়, র বার নূতন সংসারে যাইতে হইবে, নূতন লোকের সেবা করিতে হইবে, নূত র মন যোগাইতে হইবে, এটা জানা থাকিলে কোন সংসারের প্রতিই নারীগ র তেমন যত্ন থাকিবে না। সতীত্বে অনাদর জন্মিলেই সংসার নষ্ট হইবে, ইহা নিশ।

নারীজাতির সতীত্ব-মহিমা ভারতবাসী যেমন জানেন, জগতের অন্যান্য জ তি তেমন জানেন না; অধিক কথা কি, সতী কাহাকে বলে, সেই সূক্ষ্ম ক টী বুঝিতেই অনেক জাতি অক্ষম। সত্তর বৎসর পূর্ব্বে লর্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের আ ল এতদ্দেশীয় সাধ্বী রমণীগণের সহমরণপ্রথা নিষিদ্ধ হইয়াছে, সাধারণ সাহে রা সেই সহমরণপ্রথার প্রকৃত অর্থ আজিও অবগত হইতে পারেন নাই। বল সাধারণ সাহেব কেন, পুলিশের সাহেব এবং বিচারালয়ের সিবিলিয়ান্ স হব পর্য্যন্ত নারীর সহমরণকে একটা অপরাধ বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। তাঁহ দের সেই ... "সতী হওয়া।"—সেই অপরাধে কারাবাসদণ্ডের ান ... সিদ্ধান্ত করেন, ...র জলন্ত চিতায় আরোহণের াম

তাহাদেরও কারাবাসদণ্ডাজ্ঞা হয়। মনে করুন, একটী স্ত্রীলোক অনুমৃতা হইল, আইন-পালকেরা ইংরাজীতে লিখিলেন, "Committed Suttee"—ইহা দ্বারাই বুঝা যায়, ইংরাজী আইনমতে সতী হওয়া ফৌজদারী অপরাধ।

সতী হওয়া ফৌজদারী অপরাধ, এরূপ যাঁহাদের ধারণা, তাঁহারা সতীমহিমা কতদূর বুঝিয়াছেন, সকলেই তাহা অনুভব করিতে পারেন। বিদেশীলোকের কথা লইয়া আন্দোলন করা নিষ্ফল, যাঁহারা এতদ্দেশের সতীমাহাত্ম্য অবগত আছেন, পাকে প্রকারে তাঁহারা পরম্পরা-সম্বন্ধে আমাদের সতীস্ত্রীগণকে সতীত্বধর্ম্মপালনে নিরুৎসাহ করেন, ইহার তুল্য সমাজধ্বংসের সাঙ্ঘাতিক হেতু আর কি হইতে পারে? পতিব্রতার প্রধানধর্ম্মে আঘাত করিলে হিন্দুসংসার খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাস্তি। যাঁহাদিগকে লইয়া সংসার, তাঁহাদিগের মতিভ্রম জন্মাইয়া দেওয়া কতদূর অমঙ্গলের নিদান, উন্মত্ত উন্নতিকামুকেরা এখনও তাহা বুঝিতেছেন না। বঙ্গের নারীসংসার নষ্ট হইলে কি লইয়া বঙ্গসংসার চলিবে, এ সংসারে কি সুখ থাকিবে, সময় থাকিতে থাকিতে এখনও তাহা চিন্তা করা উচিত;—চিন্তা করিয়া সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী তৎপ্রণীত বঙ্গসুন্দরী কাব্যের একস্থানে নারী-মহিমা কীর্ত্তন করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন:—

"প্রেমের প্রতিমা স্নেহের পুতলি,
করুণা-সাগর, দয়ার নদী।
হতো মরুময় সব চরাচর,
না থাকিতে তুমি জগতে যদি॥"

স্ত্রীজাতি জগতে না থাকিলে চরাচর সংসার মরুময় হইয়া যাইত, ইহাই কবির কথা। এখন সেই স্ত্রীজাতি বিদ্যমান থাকিতে থাকিতে পুরুষেরা যদি তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ গুণাবলী বিলুপ্ত করিতে বদ্ধপরিকর হয়, বঙ্গসংসারের সুখের নিদর্শন আর কি অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা কি ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য নহে? বর্ত্তমান লক্ষণ দর্শন করিয়া, ভবিষ্যৎ অবধারণ করিবার ক্ষমতা যাঁহাদের আছে, তাঁহারা উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন, বঙ্গনারী স্বেচ্ছাচারিণী হইলে সমস্ত বঙ্গসং... মরুময় ... ... তদুৎপন্ন ... যাইবে।

... উত্তম উত্তম বসন- ...

বিলক্ষণ বিলাসী হইতেছেন মানবের মহোপকা...

কেন না, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বিধবা-বিবাহ" পুস্তক যখন বাজারে বাহির হয়, যখন মহা আন্দোলন হয়, সেই সময় বিধবা-বিবাহের কথা লইয়া চতুর্দ্দিকে বাজারে একটা গীত উঠিয়াছিল, "সাত ছেলের মা পতি পাবে, আহ্লাদে আটখানা।"

পতিবিয়োগে সতী যদি কাতরা না হইয়া নূতন পতি পাইবার লো[illegible] আহ্লাদে আটখানা হয়, তাহা হইলে বঙ্গে আর সতীত্ব-গৌরব থাকিবে না [illegible]তীত্ব-গৌরব আছে বলিয়াই নিজ সংসারে নারীগণের এতাধিক যত্ন দৃষ্ট হয় [illegible] বিধবা হওবার ভয় না থাকিলে নারীগণ কদাচ পতিসেবায় অনুরাগিণী হইবে না। পর্য্যায়ক্রমে যতগুলি পতি হইবে, একনারী ততগুলি পতির প্রতি সমান ভ[illegible] রাখিতে পারিবে, এরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র। বিধবার সন্তানেরা নূ[illegible] পিতা প্রাপ্ত হইলে যদি তুষ্ট হইতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের জননী নূ[illegible] পতি পাইয়া তুষ্ট হইতে পারিবে, এরূপ অনুমান করা প্রকৃতিসঙ্গত হই[illegible] পারে না। একজনের প্রতি ভক্তি জন্মিলে, এক সংসারের উপর মায়া বসি[illegible] নারী যেমন মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক সংসারপালন ক[illegible] সেই মায়া-ভক্তি অটল রাখিতে পারে, সেই সংসারে সে যেমন সুখী হয়, [illegible] বার নূতন সংসারে যাইতে হইবে, নূতন লোকের সেবা করিতে হইবে, নূ[illegible] মন যোগাইতে হইবে, এটা জানা থাকিলে কোন সংসারের প্রতিই নারীগ[illegible] তেমন যত্ন থাকিবে না। সতীত্বে অনাদর জন্মিলেই সংসার নষ্ট হইবে, ইহা নিশ্[illegible]।

নারীজাতির সতীত্ব-মহিমা ভারতবাসী যেমন জানেন, জগতের অন্যান্য [illegible] তেমন জানেন না; অধিক কথা কি, সতী কাহাকে বলে, সেই সূক্ষ্ম [illegible] বুঝিতেই অনেক জাতি অক্ষম। সত্তর বৎসর পূর্ব্বে লর্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের আ[illegible] এতদ্দেশীয় সাধ্বী রমণীগণের সহমরণপ্রথা নিষিদ্ধ হইয়াছে, সাধারণ সাহে[illegible] সেই সহমরণপ্রথার প্রকৃত অর্থ আজিও অবগত হইতে পারেন নাই। [illegible] সাধারণ সাহেব কেন, পুলিশের সাহেব এবং বিচারালয়ের সিবিলিয়ান্ স[illegible] পর্য্যন্ত নারীর সহমরণকে একটা অপরাধ বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। তাঁ[illegible] [illegible] "সতী হওয়া"—সেই অপরাধে কারাবাসদণ্ডের [illegible] [illegible] সিদ্ধান্ত করেন, [illegible]র জ্বলন্ত চিতায় আরোহণের [illegible]

তাহাদেরও কারাবাসদণ্ডাজ্ঞা হয়। মনে করুন, একটী স্ত্রীলোক অনুমৃতা হইল, আইন-পালকেরা ইংরাজীতে লিখিলেন "Committed Suttee"—ইহা দ্বারাই বুঝা যায়, ইংরাজী আইনমতে সতী হওয়া ফৌজদারী অপরাধ।

সতী হওয়া ফৌজদারী অপরাধ, এরূপ যাঁহাদের ধারণা, তাঁহারা সতীমহিমা কতদূর বুঝিয়াছেন, সকলেই তাহা অনুভব করিতে পারেন। বিদেশীলোকের কথা লইয়া আন্দোলন করা নিষ্ফল, যাঁহারা এতদ্দেশের সতীমাহাত্ম্য অবগত আছেন, পাকে প্রকারে তাঁহারা পরম্পরা-সম্বন্ধে আমাদের সতীস্ত্রীগণকে সতীত্বধর্ম্মপালনে নিরুৎসাহ করেন, ইহার তুল্য সমাজধ্বংসের সাঙ্ঘাতিক হেতু আর কি হইতে পারে? পতিব্রতার প্রধানধর্ম্মে আঘাত করিলে হিন্দুসংসার খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাস্তি। যাঁহাদিগকে লইয়া সংসার, তাঁহাদিগের মতিভ্রম জন্মাইয়া দেওয়া কতদূর অমঙ্গলের নিদান, উন্মত্ত উন্নতিকামুকেরা এখনও তাহা বুঝিতেছেন না। বঙ্গের নারীসংসার নষ্ট হইলে কি লইয়া বঙ্গসংসার চলিবে, এ সংসারে কি সুখ থাকিবে, সময় থাকিতে থাকিতে এখনও তাহা চিন্তা করা উচিত;—চিন্তা করিয়া সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী তৎপ্রণীত বঙ্গসুন্দরী কাব্যের একস্থানে নারী-মহিমা কীর্ত্তন করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন :—

"প্রেমের প্রতিমা স্নেহের পুতলি,
করুণা-সাগর, দয়ার নদী।
হতো মরুময় সব চরাচর,
না থাকিতে তুমি জগতে যদি॥"

স্ত্রীজাতি জগতে না থাকিলে চরাচর সংসার মরুময় হইয়া যাইত, ইহাই কবির কথা। এখন সেই স্ত্রীজাতি বিদ্যমান থাকিতে থাকিতে পুরুষেরা যদি তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ গুণাবলী বিলুপ্ত করিতে বদ্ধপরিকর হয়, বঙ্গসংসারের সুখের নিদর্শন আর কি অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা কি ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য নহে? বর্ত্তমান লক্ষণ দর্শন করিয়া, ভবিষ্যৎ অবধারণ করিবার ক্ষমতা যাঁহাদের আছে, তাঁহারা উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন, বঙ্গনারী স্বেচ্ছাচারিণী হইলে সমস্ত বঙ্গসং[illegible] মরুময় [illegible] যাইবে।

[illegible] তত্তম উত্তম [illegible] ক্রমে তদুৎপন্ন [illegible]

বিলক্ষণ বিলাসী হইতেছেন মানবের মহোপক[illegible]

চতুর্দ্দশ তরঙ্গ।

বিষয়-সংসার।

বঙ্গের বিষয়-সংসার একপ্রকার বিষম-সংসার হইয়াছে। একদিকে কর্ণপাত কর, নিরন্তর বিজয়-কোলাহলে আমোদধ্বনি শ্রুতিগোচর হইবে, অন্যদিকে কর্ণপাত কর, সকরুণ আর্ত্তনাদমিশ্রিত বিষাদধ্বনি শ্রুত হইতে থাকিবে। কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক পরিমাণে দুইদিকেই কিন্তু একরূপ পরিস্ফুট মিশ্রধ্বনি—হা অন্ন, হা অন্ন!

শ্রবণেন্দ্রিয় যেমন পরস্পর-বিরোধী উভয়ধ্বনি শ্রবণ করে, দর্শনেন্দ্রিয়ও তদ্রূপ পরস্পর-বিরোধী উভয়প্রকার দৃশ্য দর্শন করিয়া তৃপ্ত ও অতৃপ্ত হয়। জগতের সর্ব্বদেশের সর্ব্বলোকেই বলেন, ক্রমোন্নতিই জগতের ধর্ম্ম। ক্রমোন্নতি অস্বীকার করিবার কোন হেতু নাই, কিন্তু এককালে পৃথিবীর সমস্ত দেশে সমভাবে উন্নতির পতাকা উড়িতেছে, ইহা অস্বীকার করিবার যথেষ্ট হেতু আছে।

আমাদের দেশে কতকগুলি পণ্ডিত জন্মিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই রাজভক্ত; ভারতে রাজভক্ত কে নহে, সে প্রশ্ন উত্থিত হইতেই পারে না; কেন না, ভারতবাসীমাত্রেই চিরদিন অবিচ্ছেদে রাজভক্ত। বঙ্গে এখন একটু ইতরবিশেষ এই হইয়াছে যে, যাঁহাদিগকে পণ্ডিত বলিয়া উল্লেখ করা হইল, তাঁহাদের রাজভক্তি অনেক উচ্চসীমা অথবা উচ্চশিখর স্পর্শ করে। রাজপুরুষেরা যাহা কিছু করেন, সর্ব্ববিধায়ে সেই সকল বিষয়ের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করা সেই পণ্ডিতগণের কার্য্য। ইংরাজ চরিত সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁহাদের অচলা ভক্তি।

... বলে ... ভারতে ... মঙ্গলের নিমিত্ত জগদীশ্বর তাঁহাদিগকে ভারতক্ষেত্রে ... রা অকপট রাজভ..., রাজবর্ণবিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রের প্রতি ... ধ্বনি ... আরোহণে...

না করে? দেড়শত বৎসর হইতে চলিল, পলাশীযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইংরাজেরা এ দেশের অধিপতি হইয়াছেন, এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহাদের দ্বারা এ দেশে কত প্রকার মঙ্গল সাধিত হইয়াছে, আমরা তাহা জানিতে পারিতেছি, জগদীশ্বরও তাহা দেখিতে পাইতেছেন।

পৌষ মাঘ মাসে অধিক বেলায় সূর্য্য প্রকাশ পাইলে অন্ধকার-কুজ্ঝটিকা যেমন দূর হইয়া যায়, ইংরাজের অনুগ্রহে এ দেশের কুসংস্কার সেইরূপ দূর হইয়া যাইতেছে। ইংরাজের অনুগ্রহে এ দেশের লোকেরা আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান-মঞ্চে আরোহণ করিতেছে, দেশের স্থানে স্থানে ব্রহ্মসভা ও হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, প্রজালোকের যাহাতে জ্ঞানবৃদ্ধি হয়, ইংরাজরাজপুরুষেরা সদয় হইয়া তদর্থ নানাস্থানে বহু বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন, যাহাতে প্রজালোকের সত্ত্বশান্তি সুরক্ষিত হয়, তদর্থ স্থানে স্থানে বহু বিচারালয় স্থাপন করিয়া দিয়াছেন, যাহাতে প্রজালোকের সাংসারিক অভাব দূর হয়, ইংরাজরাজার উৎসাহে ইংরাজ বণিকেরা তদর্থ তাঁহাদের দেশ হইতে বিবিধ দ্রব্যসামগ্রী এ দেশে আমদানী করিতেছেন, ইংরাজ-রাজপুরুষেরা নিরপেক্ষভাবে এ দেশের লোকের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মকর্ম্মে স্বাধীনতা দিয়া রাখিয়াছেন, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার খাস আমলের উদার ঘোষণাপত্রের মর্ম্মানুসারে ইংরাজরাজপুরুষেরা এ দেশের সমস্ত প্রজাকে সমনেত্রে দর্শন করিতেছেন; এতৎসমস্তই ভারত-মঙ্গলের উজ্জ্বল নিদর্শন।

রাজপুরুষেরা যাহা করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়! তাঁহাদের প্রদত্ত বহুবিধ উপকার প্রাপ্ত হইয়া এ দেশের লোকেরা নিজে নিজে কি করিতেছেন, তাহাও গণনা করা কর্ত্তব্য। ইংরাজের প্রসাদে এ দেশের লোকেরা বিদ্বান্ হইতেছেন, বিশুদ্ধধর্ম্মে অনুরাগী হইতেছেন, ঐক্যহারা হইয়াও দশজনে মিলিয়া সভা করিতে শিখিয়াছেন, দেশের উপকারের জন্য সহানুভূতি জানাইয়া নানাভাবপূর্ণ বক্তৃতা করিতে শিখিয়াছেন, শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিকল্পে যত্নবান্ হইয়া, দেশোৎপন্ন তুলা, পাট, রেশম, পশম ইত্যাদি মূল্যবান্ বস্তুজাত বিদেশে প্রেরণ করিয়া তদ্বিনিময়ে তদুৎপন্ন বস্ত্রাদি বহুমূল্য দিয়া এ দেশে আনাইতেছেন, উত্তম উত্তম বসন-... বিলক্ষণ বিলাসী হইতেছেন ... মানবের মহোপকা...

চতুর্দ্দশ তরঙ্গ।

বিষয়-সংসার।

বঙ্গের বিষয়-সংসার একপ্রকার বিষম-সংসার হইয়াছে। একদিকে কর্ণপাত কর, নিরন্তর বিজয়-কোলাহলে আমোদধ্বনি শ্রুতিগোচর হইবে, অন্যদিকে কর্ণপাত কর, সকরুণ আর্ত্তনাদমিশ্রিত বিষাদধ্বনি শ্রুত হইতে থাকিবে। কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক পরিমাণে দুইদিকেই কিন্তু একরূপ পরিস্ফুট মিশ্রধ্বনি—হা অন্ন, হা অন্ন!

শ্রবণেন্দ্রিয় যেমন পরস্পর-বিরোধী উভয়ধ্বনি শ্রবণ করে, দর্শনেন্দ্রিয়ও তদ্রূপ পরস্পর-বিরোধী উভয়প্রকার দৃশ্য দর্শন করিয়া তৃপ্ত ও অতৃপ্ত হয়। জগতের সর্ব্বদেশের সর্ব্বলোকেই বলেন, ক্রমোন্নতিই জগতের ধর্ম্ম। ক্রমোন্নতি অস্বীকার করিবার কোন হেতু নাই; কিন্তু এককালে পৃথিবীর সমস্ত দেশে সমভাবে উন্নতির পতাকা উড়িতেছে, ইহা অস্বীকার করিবার যথেষ্ট হেতু আছে।

আমাদের দেশে কতকগুলি পণ্ডিত জন্মিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই রাজভক্ত। ভারতে রাজভক্ত কে নহে, সে প্রশ্ন উত্থিত হইতেই পারে না; কেন না, ভারতবাসীমাত্রেই চিরদিন অবিচ্ছেদে রাজভক্ত। বঙ্গে এখন একটু ইতরবিশেষ এই হইয়াছে যে, যাঁহাদিগকে পণ্ডিত বলিয়া উল্লেখ করা হইল, তাঁহাদের রাজভক্তি অনেক উচ্চসীমা অথবা উচ্চশিখর স্পর্শ করে। রাজপুরুষেরা যাহা কিছু করেন, সর্ব্ববিধায়ে সেই সকল বিষয়ের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করা সেই পণ্ডিতগণের কার্য্য। ইংরাজ চরিত সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁহাদের অচলা ভক্তি।

[illegible] বঙ্গে [illegible] ভারতে [illegible] মঙ্গলের নিমিত্ত জগদীশ্বর তাঁহাদিগকে ভারতক্ষেত্রে [illegible] রা অকপট রাজভ[illegible], রাজবর্ণবিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রের প্রতি [illegible]

না করে? দেড়শত বৎসর হইতে চলিল, পলাশীযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইংরাজেরা এ দেশের অধিপতি হইয়াছেন, এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহাদের দ্বারা এ দেশে কত প্রকার মঙ্গল সাধিত হইয়াছে, আমরা তাহা জানিতে পারিতেছি, জগদীশ্বরও তাহা দেখিতে পাইতেছেন।

পৌষ মাঘ মাসে অধিক বেলায় সূর্য্য প্রকাশ পাইলে অন্ধকার-কুজ্ঝটিকা যেমন দূর হইয়া যায়, ইংরাজের অনুগ্রহে এ দেশের কুসংস্কার সেইরূপ দূর হইয়া যাইতেছে। ইংরাজের অনুগ্রহে এ দেশের লোকেরা আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান-মঞ্চে আরোহণ করিতেছে, দেশের স্থানে স্থানে ব্রহ্মসভা ও হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, প্রজালোকের যাহাতে জ্ঞানবৃদ্ধি হয়, ইংরাজরাজপুরুষেরা সদয় হইয়া তদর্থ নানাস্থানে বহু বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন, যাহাতে প্রজালোকের সত্ত্বশান্তি সুরক্ষিত হয়, তদর্থ স্থানে স্থানে বহু বিচারালয় স্থাপন করিয়া দিয়াছেন, যাহাতে প্রজালোকের সাংসারিক অভাব দূর হয়, ইংরাজরাজার উৎসাহে ইংরাজ বণিকেরা তদর্থ তাঁহাদের দেশ হইতে বিবিধ দ্রব্যসামগ্রী এ দেশে আমদানী করিতেছেন, ইংরাজ-রাজপুরুষেরা নিরপেক্ষভাবে এ দেশের লোকের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মকর্ম্মে স্বাধীনতা দিয়া রাখিয়াছেন, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার খাস আমলের উদার ঘোষণাপত্রের মর্ম্মানুসারে ইংরাজরাজপুরুষেরা এ দেশের সমস্ত প্রজাকে সমনেত্রে দর্শন করিতেছেন; এতৎসমস্তই ভারত-মঙ্গলের উজ্জ্বল নিদর্শন।

রাজপুরুষেরা যাহা করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়। তাঁহাদের প্রদত্ত বহুবিধ উপকার প্রাপ্ত হইয়া এ দেশের লোকেরা নিজে নিজে কি করিতেছেন, তাহাও গণনা করা কর্ত্তব্য। ইংরাজের প্রসাদে এ দেশের লোকেরা বিদ্বান্ হইতেছেন, বিশুদ্ধধর্ম্মে অনুরাগী হইতেছেন, ঐক্যহারা হইয়াও দশজনে মিলিয়া সভা করিতে শিখিয়াছেন, দেশের উপকারের জন্য সহানুভূতি জানাইয়া নানাভাবপূর্ণ বক্তৃতা করিতে শিখিয়াছেন, শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিকল্পে যত্নবান্ হইয়া, দেশোৎপন্ন তুলা, পাট, রেশম, পশম ইত্যাদি মূল্যবান্ বস্তুজাত বিদেশে প্রেরণ করিয়া তদ্বিনিময়ে তদুৎপন্ন বস্ত্রাদি বহুমূল্য দিয়া এ দেশে আনাইতেছেন, উত্তম উত্তম বসন-[illegible] বিলক্ষণ বিলাসী হইতেছেন। মানবের মহোপকা[illegible]

প্রসাদে এ দেশের পণ্ডিতেরা তাহাও আয়ত্ত করিয়া লইতেছেন। সমস্তই ভাল, সমস্তই মঙ্গলের নিদর্শন।

সমস্তই ভাল, মন্দ কি তবে কিছুই নাই? বুঝিবার দোষে আমরা যেগুলিকে মন্দ বলিয়া অবধারণ করি, বাস্তবিক সেগুলি সভ্যতার অঙ্গ; সভ্যতার রাজ্যে সেগুলি না থাকিলে সভ্যতার মান থাকে না। ছোট বড় গুটীকতক-অঙ্গ আমাদের চক্ষে অপ্রীতিকর বোধ হয়, তৎসমস্তের আলোচনা করা অতিশয় কষ্টসাধ্য, বড় বড় দুটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। মদিরা ও গণিকা। সকল সময়ে সকল দেশেই ঐ দুটীর বিদ্যমানতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন কি, পুরাণ-বর্ণিত স্বর্গ যে সর্ব্বজনবাঞ্ছনীয় সুখস্থান, সে স্বর্গেও মদিরা-গণিকার অবিদ্য-মানতা নাই। তবে আমরা ঐ দুটীকে মন্দের নিদর্শন কেন বলি, তাহার কারণ আছে।

ইংরাজ-আমলে এতদ্দেশে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে ঐ দুটী বস্তুর অধিকতর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এ দেশের ইতরলোকেরা কতক পরিমাণে দেশীয় মদ্য ব্যবহার করিত, ভদ্রলোকেরা মদ্যের নামে ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন, প্রকাশ্যরূপে মদিরা-বিক্রয়ের স্থানও নিতান্ত অল্প ছিল, পথে ঘাটে মাতালের ছড়াছড়ি দৃষ্ট হইত না, এখন কিরূপ হইয়াছে, সকলেই তাহা দেখিতেছেন। দেশের অধিকাংশ লোক মাতাল; পূর্ণমাত্রায় মাতাল না হইলেও ভগ্নাংশবাদে এ বাজারে ইতর-ভদ্র অনেক লোক মদ্যপায়ী। রাজা এই বিষয়ে উৎসাহ দেন, ইহাই বড় আক্ষেপের বিষয়। কে বলে রাজা উৎসাহ দেন? বে-এক্তার মাতাল রাস্তায় পাইলে পুলিশের লোকেরা ধরিয়া লইয়া যায়, একরাত্রি কয়েদ করিয়া রাখে, পুলিশকোর্টে জরিমানা হয়; বিনা অনুমতিতে কেহ মদ্য বিক্রয় করিতে পারে না, অনুমতি-প্রাপ্ত লোকেরাও নির্দ্ধারিত সময়ান্তে বিক্রয় করিলে দণ্ডনীয় হয়; তবে আর রাজার উৎসাহ কোথায়?

মদ্যবিক্রয়ে ও মদ্যপানে রাজার উৎসাহদান নাই, ইহা স্বীকার করিলেও একটু একটু সন্দেহ আইসে। বর্ষে বর্ষে আবকারী বিজ্ঞাপনী প্রকাশ হয়, কোন বৎসর যদি মদ্যবিক্রয়ের অল্পতা এবং মদ্যপায়ীর সংখ্যার অল্পতা সেই রিপোর্টে ... কেন বিক্রয় অল্প হইল, কেন মাতাল কমিল, তদ্বিষয়ে উপর হইতে ...র কৈফিয়ৎ তলপ হই... থাকে। প্রকৃতিপুঞ্জের মদ্য-

পানে রাজার উৎসাহ, এ কথা বলা অসঙ্গত হইলেও রাজস্ব-বিভাগের আয়-বৃদ্ধসম্বন্ধে রাজপুরুষগণের আনন্দ আছে, এরূপ অনুমান করা বোধ হয়, অসঙ্গত হইবে না।

দ্বিতীয়ত গণিকা।—প্রত্যেক দশম বৎসরে রাজ্যের প্রজাগণনা করা হয়। রাজধানীর গণনার ফলে প্রকাশ পায়, ক্রমশই নগরের গণিকা-সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। কলিকাতাবাসী ও প্রবাসী ইতর ভদ্র নায়কেরা সেই সকল গণিকার পরিপোষণ করিতেছে। এ পাপ দূর করিবার কোন উপায় অবধারণ সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না; বরং এই দুর্দ্দমনীয় পাপস্রোত ক্রমশই বেগবান্ হইয়া উঠিবে। বড়লোকেরা বেশ্যা পোষণ করেন, তাহার একটী কারণ আছে। এখনকার বিষয়-সংসার রূপভোগ করিয়া বুঝাইতে হইলে অবশ্যই বলিতে হয়, অর্দ্ধাংশের অধিকাংশ আমোদসংসাররূপে পরিণত হইয়াছে। যাহাতে অধিক আমোদ, তাহাতেই অধিকলোকের প্রবৃত্তি। আমোদ দুই প্রকার;—বিশুদ্ধ এবং অশুদ্ধ। বিশুদ্ধ আমোদে এখনকার লোকের আসক্তি অল্প, অশুদ্ধ আমোদের দিকেই অধিক আকর্ষণ। বিলাসিনীগণের বিলাসমন্দিরে যে প্রকার খোলা আমোদলাভ হয়, অন্যত্র সেরূপ হয় না। এই জন্যই বিলাস-মন্দিরগুলি সর্ব্বদা গুল্‌জার। সুরাসেবন, বায়ুসেবন, কুৎসিত কুৎসিত নৃত্য-দর্শন, কুৎসিত কুৎসিত সঙ্গীতশ্রবণ এবং ষোড়শোপচারে মকরকেতনের সমর্চ্চন ঐ সকল স্থলেই অবিরোধে হইয়া থাকে। বড় বড় লোকের গাড়ী-ঘোড়া ইত্যাদি যেমন আসবাব, সখের বারাঙ্গনাগণও তদ্রূপ আসবাবের মধ্যে গণ্য। সমস্ত বড়লোকের এই আসবাব আছে, নিশ্চয় করিয়া সে কথা বলা না যাউক, শতকরা পাঁচজনের অধিক বাদ দেওয়া যাইতে পারে কি না, তাহাতেও সন্দেহ হয়। বারাঙ্গনারা ভাল খায়, ভাল পরে, ভাল ভাল আমোদ করে, ভাল হাসে, ভাল নাচে, ভাল গায়, অবিচ্ছেদে সুখভোগ করে, বাহিরের বিলাস দেখিয়া অদূরদর্শী লোকেরা তাহাই বিশ্বাস করিয়া থাকে; গণিকারা যে পাপানলে অন্তরে অন্তরে জ্বলে, সেটা সকল লোকে হয় ত কল্পনাতেও আনিতে পারে না; ভ্রান্ত বিশ্বাসে ইহ-সংসারের অনেক কুলস্ত্রী সুখের লোভে বিপথগামিনী হয়; শেষকালে পাপের হ্রদে ডুবিয়া ডুবিয়া জীবন্ত শরীরে নরকযন্ত্রণা ভোগ কর... ...হণ্ডের একজন পণ্ডিত নিত্য নিত্য গণিকাপল্লী...

প্রসাদে এ দেশের পণ্ডিতেরা তাহাও আয়ত্ত করিয়া লইতেছেন। সমস্তই ভাল, সমস্তই মঙ্গলের নিদর্শন।

সমস্তই ভাল, মন্দ কি তবে কিছুই নাই? বুঝিবার দোষে আমরা যেগুলিকে মন্দ বলিয়া অবধারণ করি, বাস্তবিক সেগুলি সভ্যতার অঙ্গ; সভ্যতার রাজ্যে সেগুলি না থাকিলে সভ্যতার মান থাকে না। ছোট বড় গুটীকতক অঙ্গ আমাদের চক্ষে অপ্রীতিকর বোধ হয়, তৎসমস্তের আলোচনা করা অতিশয় কষ্টসাধ্য, বড় বড় দুটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। মদিরা ও গণিকা। সকল সময়ে সকল দেশেই ঐ দুটীর বিদ্যমানতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন কি, পুরাণ-বর্ণিত স্বর্গ যে সর্ব্বজনবাঞ্ছনীয় সুখস্থান, সে স্বর্গেও মদিরা-গণিকার অবিদ্য-মানতা নাই। তবে আমরা ঐ দুটীকে মন্দের নিদর্শন কেন বলি, তাহার কারণ আছে।

ইংরাজ-আমলে এতদ্দেশে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে ঐ দুটী বস্তুর অধিকতর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এ দেশের ইতরলোকেরা কতক পরিমাণে দেশীয় মদ্য ব্যবহার করিত, ভদ্রলোকেরা মদ্যের নামে ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন, প্রকাশ্যরূপে মদিরা-বিক্রয়ের স্থানও নিতান্ত অল্প ছিল, পথে ঘাটে মাতালের ছড়াছড়ি দৃষ্ট হইত না, এখন কিরূপ হইয়াছে, সকলেই তাহা দেখিতেছেন। দেশের অধিকাংশ লোক মাতাল; পূর্ণমাত্রায় মাতাল না হইলেও ভগ্নাংশবাদে এ বাজারে ইতর-ভদ্র অনেক লোক মদ্যপায়ী। রাজা এই বিষয়ে উৎসাহ দেন, ইহাই বড় আক্ষেপের বিষয়। কে বলে রাজা উৎসাহ দেন? বে-এক্তার মাতাল রাস্তায় পাইলে পুলিশের লোকেরা ধরিয়া লইয়া যায়, একরাত্রি কয়েদ করিয়া রাখে, পুলিশকোর্টে জরিমানা হয়; বিনা অনুমতিতে কেহ মদ্য বিক্রয় করিতে পারে না, অনুমতি-প্রাপ্ত লোকেরাও নির্দ্ধারিত সময়ান্তে বিক্রয় করিলে দণ্ডনীয় হয়; তবে আর রাজার উৎসাহ কোথায়?

মদ্যবিক্রয়ে ও মদ্যপানে রাজার উৎসাহদান নাই, ইহা স্বীকার করিলেও একটু একটু সন্দেহ আইসে। বর্ষে বর্ষে আবকারী বিজ্ঞাপনী প্রকাশ হয়, কোন বৎসর যদি মদ্যবিক্রয়ের অল্পতা এবং মদ্যপায়ীর সংখ্যার অল্পতা সেই রিপোর্টে ... কেন ... ক্রয় ... হইল, কেন মাতাল কমিল, তদ্বিষয়ে উপর হইতে ... কৈফিয়ৎ তলপ ... থাকে। প্রকৃতিপুঞ্জের মদ্য-

পানে রাজার উৎসাহ, এ কথা বলা অসঙ্গত হইলেও রাজস্ব-বিভাগের আয়-বৃদ্ধিসম্বন্ধে রাজপুরুষগণের আনন্দ আছে, এরূপ অনুমান করা বোধ হয়, অসঙ্গত হইবে না।

দ্বিতীয়ত গণিকা।—প্রত্যেক দশম বৎসরে রাজ্যের প্রজাগণনা করা হয়। রাজধানীর গণনার ফলে প্রকাশ পায়, ক্রমশই নগরের গণিকা-সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। কলিকাতাবাসী ও প্রবাসী ইতর ভদ্র নায়কেরা সেই সকল গণিকার পরিপোষণ করিতেছে। এ পাপ দূর করিবার কোন উপায় অবধারণ সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না; বরং এই দুর্দ্দমনীয় পাপস্রোত ক্রমশই বেগবান্ হইয়া উঠিবে। বড়লোকেরা বেশ্যা পোষণ করেন, তাহার একটী কারণ আছে। এখনকার বিষয় সংসার রূপভোগ করিয়া বুঝাইতে হইলে অবশ্যই বলিতে হয়, অর্দ্ধাংশের অধিকাংশ আমোদসংসাররূপে পরিণত হইয়াছে। যাহাতে অধিক আমোদ, তাহাতেই অধিকলোকের প্রবৃত্তি। আমোদ দুই প্রকার;—বিশুদ্ধ এবং অশুদ্ধ। বিশুদ্ধ আমোদে এখনকার লোকের আসক্তি অল্প, অশুদ্ধ আমোদের দিকেই অধিক আকর্ষণ। বিলাসিনীগণের বিলাসমন্দিরে যে প্রকার খোলা আমোদলাভ হয়, অন্যত্র সেরূপ হয় না। এই জন্যই বিলাস-মন্দিরগুলি সর্ব্বদা গুল্‌জার। সুরাসেবন, বায়ুসেবন, কুৎসিত কুৎসিত নৃত্য-দর্শন, কুৎসিত কুৎসিত সঙ্গীতশ্রবণ এবং ষোড়শোপচারে মকরকেতনের সমর্চ্চন ঐ সকল স্থলেই অবিরোধে হইয়া থাকে। বড় বড় লোকের গাড়ী-ঘোড়া ইত্যাদি যেমন আসবাব, সখের বারাঙ্গনাগণও তদ্রূপ আসবাবের মধ্যে গণ্য। সমস্ত বড়লোকের এই আসবাব আছে, নিশ্চয় করিয়া সে কথা বলা না যাউক, শতকরা পাঁচজনের অধিক বাদ দেওয়া যাইতে পারে কি না, তাহাতেও সন্দেহ হয়। বারাঙ্গনারা ভাল খায়, ভাল পরে, ভাল ভাল আমোদ করে, ভাল হাসে, ভাল নাচে, ভাল গায়, অবিচ্ছেদে সুখভোগ করে, বাহিরের বিলাস দেখিয়া অদূরদর্শী লোকেরা তাহাই বিশ্বাস করিয়া থাকে; গণিকারা যে পাপানলে অন্তরে অন্তরে জ্বলে, সেটা সকল লোকে হয় ত কল্পনাতেও আনিতে পারে না; ভ্রান্ত বিশ্বাসে ইহ-সংসারের অনেক কুলস্ত্রী সুখের লোভে বিপথগামিনী হয়; শেষকালে পাপের হ্রদে ডুবিয়া ডুবিয়া জীবন্ত শরীরে নরকযন্ত্রণা ভোগ করে ... হওয়ের এক জন পণ্ডিত নিত্য নিত্য গণিকাপল্লী ...

টাকা। মফস্বলে যাঁহাদের ঐরূপ আয়, তাঁহারা অবশ্যই বড়মানুষ বলিয়া বিখ্যাত হন।

যে গ্রামে পুরন্দরের বাস, সেই গ্রামে আর একজন জমীদার ছিলেন, তাঁহার নাম দর্পনারায়ণ গাঙ্গুলী। গ্রামে দুটী দল; একদলের দলপতি পুরন্দর, দ্বিতীয় দলের দলপতি দর্পনারায়ণ। পুরন্দরে আর দর্পনারায়ণে মনের মিলন ছিল না, বস্তুতঃ উভয়েই উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রায়ই তাঁহাদের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ চলিত; সাক্ষাৎসম্বন্ধে, পরম্পরা-সম্বন্ধে মকদ্দমা-মামলা চালাইতে তাঁহারা উভয়েই সর্ব্বদা আনন্দ অনুভব করিতেন; উভয়েই উভয়ের আততায়ী, উভয়েই জিগীষাপরবশ। প্রকাশ থাকা উচিত, দর্পনারায়ণের বার্ষিক আয় পুরন্দরের আয় অপেক্ষা কিছু বেশী। দর্পনারায়ণ সৎকার্য্যে কৃপণ, কিন্তু মামলা-মকদ্দমায় বিলক্ষণ দাতা।

পুরন্দরকে জব্দ করিবার জন্য দর্পনারায়ণের বিশেষ চেষ্টা। পুরন্দরের একটী [illegible] ছিল, জমীদারীর প্রজাগণকে তিনি মৌরসীপাট্টা দিতে ভালবাসিতেন না, ঠিকা বন্দোবস্তেই তিনি বর্ষে বর্ষে আয়বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেন; তাহা ছাড়া কোন কোন প্রজা পাঁচবিঘার অধিক নিষ্কর জমী ভোগ করিতে পায়, এমন ইচ্ছা তাঁহার ছিল না, নিষ্করজমী বাজেয়াপ্ত করা তাঁহার একটা অভ্যাস হইয়াছিল। জমীদারীতে চাঁদা, মাথট, জরিমানা ইত্যাদি বাজে আদায়ের প্রতি তাঁহার অধিক লোভ ছিল। এই সকল কারণে প্রজারা তাঁহার প্রতি তাদৃশ অনুরক্ত ছিল না।

বঙ্গের অনেক জমীদারের ঐরূপ অভ্যাস ছিল, কিন্তু আজকাল কমিয়া আসিতেছে। জমীদারেরা প্রজাপীড়ন করেন, অনেক সাহেবলোকের এইরূপ ধারণা হইয়াছে। ধারণা অভ্রান্ত নহে, প্রজারঞ্জন সদাশয় ভূম্যধিকারী আমরা এখন অনেক দেখিতে পাই। তবে যে প্রজাপীড়নের কথাটা রটনা হয়, সে রটনার কারণ জমীদারেরা নহেন, মফস্বলের আমলাবর্গের দোষে অনেক ভাল ভাল জমীদারের দুর্নাম রটে। উত্তরপাড়ার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এ দেশে একজন আদর্শ ভূম্যধিকারী ছিলেন, তাঁহার পুত্র-পৌত্রেরা প্রজার উপকারে উদাসীন নহেন। [illegible]বাবুর আদর্শে বঙ্গে আরও কতকগুলি শিক্ষিত ভূম্যধিকারী কৃষিকার্য্যের [illegible] অবস্থার সংশোধন [illegible] বিশেষ মনোযোগী হইতেছেন। [illegible] উপ[illegible] [illegible]ংসা করেন, তাঁ[illegible]

রাজদরবারে যাঁহাদের কিছু অধিক প্রতিপত্তি, তাঁহারা বুঝাইয়া দেন, কালেক্টারীতে অতি অল্পমাত্র রাজস্ব দিয়া জমীদারেরা বহুগুণে অধিক লাভ করিয়া থাকেন। কেবল ঐ কথা বুঝাইয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত থাকেন না, মধ্যে মধ্যে তাঁহারা প্রস্তাব করেন, জমীদারীর বিংশতি গুণ মূল্য দিয়া জমীদারীগুলি খাস করিয়া লইলে বঙ্গের ভূমির রাজস্ব অনেক পরিমাণে বাড়িয়া উঠিতে পারে। হেতুবাদের সঙ্গে তাঁহারা আরও একটা বেশী কথা বলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ বাহাদুর জমীদারগণের সহিত ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া রাজ্যের ক্ষতি করিয়া গিয়াছেন। সে বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হয়, এই কারণে তাহার উপর হস্তক্ষেপ করা হয় না, এই কারণেই তাঁহারা ঐরূপ বিশগুণ পণের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া থাকেন। ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা সাহস করিয়া সে প্রস্তাবে অনুমোদন করিতে পারেন না, তজ্জন্যই এখনও জমীদারীগুলি ঠিক রহিয়াছে। রহিয়াছে বটে, তথাপি শনৈঃ শনৈঃ কর প্রসারণে কর-সংগ্রাহকেরা বড় একটা সঙ্কুচিত হইতেছেন না। রোডসেস, পবলিক ওয়ার্কসেস, ডাকহরকরার বেতন ইত্যাদি নূতন বাব স্থাপন করা হইয়াছে, এডুকেশনসেস্ বসাইবার কল্পনাও হইতেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহলসমূহে ঐরূপ অতিরিক্ত করস্থাপনে দশশালা-বন্দোবস্ত আঘাত পাইতেছে, বিধানকর্ত্তারা অবশ্যই তাহা বুঝিতেছেন, কিন্তু প্রকাশ করিয়া কিছুই বলিতেছেন না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে "সূর্য্যাস্ত আইনের" প্রসাদে রাজার রাজস্ব আদায়ের কত সুবিধা, বিপরীত-প্রস্তাবকর্ত্তারা একবারও তাহা ভাবিয়া দেখিতেছেন না। বিচক্ষণ রাজস্ববিদ্ পণ্ডিতমহাশয়েরা বঙ্গের আদর্শে ভারতের সর্ব্বত্র ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত করিতে অভিলাষী।

দর্পনারায়ণ প্রজাপীড়ন করিতেন না, এমনও নহে, তথাপি ঐ সূত্র ধরিয়া বৈরনির্যাতন করিবার সুবিধা অন্বেষণে তিনি সর্ব্বক্ষণ সচেষ্ট ছিলেন।

পুরন্দরের যেমন কতকগুলি দোষ ছিল, তেমনি কতকগুলি গুণেরও তিনি অধিকারী ছিলেন। স্বধর্ম্মে অনুরাগ থাকাতে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সহিত সদালাপ করিতে, সময়ে সময়ে তাঁহাদিগের উপকার করিতে, গুণানুর[illegible] মর্যা[illegible]

টাকা। মফস্বলে যাঁহাদের ঐরূপ আয়, তাঁহারা অবশ্যই বড়মানুষ বলিয়া বিখ্যাত হন।

যে গ্রামে পুরন্দরের বাস, সেই গ্রামে আর একজন জমীদার ছিলেন, তাঁহার নাম দর্পনারায়ণ গাঙ্গুলী। গ্রামে দুটী দল; একদলের দলপতি পুরন্দর, দ্বিতীয় দলের দলপতি দর্পনারায়ণ। পুরন্দরে আর দর্পনারায়ণে মনের মিলন ছিল না, বস্তুতঃ উভয়েই উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রায়ই তাঁহাদের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ চলিত; সাক্ষাৎসম্বন্ধে, পরম্পরা-সম্বন্ধে মকদ্দমা-মামলা চালাইতে তাঁহারা উভয়েই সর্ব্বদা আনন্দ অনুভব করিতেন; উভয়েই উভয়ের আততায়ী, উভয়েই জিগীষাপরবশ। প্রকাশ থাকা উচিত, দর্পনারায়ণের বার্ষিক আয় পুরন্দরের আয় অপেক্ষা কিছু বেশী। দর্পনারায়ণ সৎকার্য্যে কৃপণ, কিন্তু মামলা-মকদ্দমায় বিলক্ষণ দাতা।

পুরন্দরকে জব্দ করিবার জন্য দর্পনারায়ণের বিশেষ চেষ্টা। পুরন্দরের একটী দোষ ছিল, জমীদারীর প্রজাগণকে তিনি মৌরসীপাট্টা দিতে ভালবাসিতেন না, ঠিকা বন্দোবস্তেই তিনি বর্ষে বর্ষে আয়বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেন; তাহা ছাড়া কোন কোন প্রজা পাঁচবিঘার অধিক নিষ্কর জমী ভোগ করিতে পায়, এমন ইচ্ছা তাঁহার ছিল না, নিষ্করজমী বাজেয়াপ্ত করা তাঁহার একটা অভ্যাস হইয়াছিল। জমীদারীতে চাঁদা, মাথট, জরিমানা ইত্যাদি বাজে আদায়ের প্রতি তাঁহার অধিক লোভ ছিল। এই সকল কারণে প্রজারা তাঁহার প্রতি তাদৃশ অনুরক্ত ছিল না।

বঙ্গের অনেক জমীদারের ঐরূপ অভ্যাস ছিল, কিন্তু আজকাল কমিয়া আসিতেছে। জমীদারেরা প্রজাপীড়ন করেন, অনেক সাহেবলোকের এইরূপ ধারণা হইয়াছে। ধারণা অভ্রান্ত নহে, প্রজারঞ্জন সদাশয় ভূম্যধিকারী আমরা এখন অনেক দেখিতে পাই। তবে যে প্রজাপীড়নের কথাটা রটনা হয়, সে রটনার কারণ জমীদারেরা নহেন, মফস্বলের আমলাবর্গের দোষে অনেক ভাল ভাল জমীদারের দুর্নাম রটে। উত্তরপাড়ার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এ দেশে একজন আদর্শ ভূম্যধিকারী ছিলেন, তাঁহার পুত্র-পৌত্রেরা ও প্রজার উপকারে উদাসীন নহেন। ...বাবুর আদর্শে বঙ্গে আরও কতকগুলি শিক্ষিত ভূম্যধিকারী কৃষিকার্য্যের ... অবস্থার সংশোধন ... বিশেষ মনোযোগী হইতেছেন। ... উপ... হিংসা করেন, তাঁ...

রাজদরবারে যাঁহাদের কিছু অধিক প্রতিপত্তি, তাঁহারা বুঝাইয়া দেন, কালেক্টারীতে অতি অল্পমাত্র রাজস্ব দিয়া জমীদারেরা বহুগুণে অধিক লাভ করিয়া থাকেন। কেবল ঐ কথা বুঝাইয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত থাকেন না, মধ্যে মধ্যে তাঁহারা প্রস্তাব করেন, জমীদারীর বিংশতি গুণ মূল্য দিয়া জমীদারীগুলি খাস করিয়া লইলে বঙ্গের ভূমির রাজস্ব অনেক পরিমাণে বাড়িয়া উঠিতে পারে। হেতুবাদের সঙ্গে তাঁহারা আরও একটা বেশী কথা বলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ বাহাদুর জমীদারগণের সহিত ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া রাজ্যের ক্ষতি করিয়া গিয়াছেন। সে বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হয়, এই কারণে তাহার উপর হস্তক্ষেপ করা হয় না, এই কারণেই তাঁহারা ঐরূপ বিশগুণ পণের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া থাকেন। ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা সাহস করিয়া সে প্রস্তাবে অনুমোদন করিতে পারেন না, তজ্জন্যই এখনও জমীদারীগুলি ঠিক রহিয়াছে। রহিয়াছে বটে, তথাপি শনৈঃ শনৈঃ কর প্রসারণে কর-সংগ্রাহকেরা বড় একটা সঙ্কুচিত হইতেছেন না। রোডসেস, পবলিক ওয়ার্কসেস, ডাকহরকরার বেতন ইত্যাদি নূতন বাব স্থাপন করা হইয়াছে, এডুকেশনসেস্ বসাইবার কল্পনাও হইতেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহলসমূহে ঐরূপ অতিরিক্ত করস্থাপনে দশশালা-বন্দোবস্ত আঘাত পাইতেছে, বিধানকর্ত্তারা অবশ্যই তাহা বুঝিতেছেন, কিন্তু প্রকাশ করিয়া কিছুই বলিতেছেন না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে "সূর্য্যাস্ত আইনের" প্রসাদে রাজার রাজস্ব আদায়ের কত সুবিধা, বিপরীত-প্রস্তাবকর্ত্তারা একবারও তাহা ভাবিয়া দেখিতেছেন না। বিচক্ষণ রাজস্ববিদ্ পণ্ডিতমহাশয়েরা বঙ্গের আদর্শে ভারতের সর্ব্বত্র ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত করিতে অভিলাষী।

দর্পনারায়ণ প্রজাপীড়ন করিতেন না, এমনও নহে, তথাপি ঐ সূত্র ধরিয়া বৈরনির্যাতন করিবার সুবিধা অন্বেষণে তিনি সর্ব্বক্ষণ সচেষ্ট ছিলেন।

পুরন্দরের যেমন কতকগুলি দোষ ছিল, তেমনি কতকগুলি গুণেরও তিনি অধিকারী ছিলেন। স্বধর্ম্মে অনুরাগ থাকাতে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সহিত সদালাপ করিতে, সময়ে সময়ে তাঁহাদিগের উপকার করিতে, গুণানুক... মর্যাদা... তি... করিতেন? ...

হইতেন না, সেই কারণে দর্পনারায়ণের দল অপেক্ষা তাঁহার দলে ব্রাহ্মণাদিতেও
সংখ্যা অধিক ছিল। তদ্ব্যতীত তিনি সদালাপী, মিষ্টভাষী, স্বজনপ্রিয়। মুখের
কথায় লোকের সহিত অমায়িক ব্যবহার করা তাঁহার প্রকৃতির একটী উত্তম
পরিচয়। তাঁহার ঐ সকল গুণে গ্রামের এবং ভিন্নগ্রামের অনেক লোক তাঁহার
বাধ্য ছিল। কৃপণস্বভাব দর্পনারায়ণ সে সকল গুণে বঞ্চিত ছিলেন, তাহার উপর
অত্যন্ত রূক্ষভাষী; লোকেরা তাঁহার নিকট বাধ্যতা স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ হইত,
তজ্জন্য পুরন্দরের উপর দর্পনারায়ণের অধিক হিংসা।

মামলা-মকদ্দমায় উভয়পক্ষের বিস্তর টাকা ব্যয় হইয়া যাইত, কিন্তু কোন
কৌশলে দর্পনারায়ণের নিগূঢ় অভিসন্ধি সুসিদ্ধ হইত না। তাঁহার অভিসন্ধি
ছিল, পুরন্দরকে বিপদে ফেলা। দেওয়ানী মকদ্দমায় সে অভিসন্ধি সিদ্ধ হওয়া
অসম্ভব, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন, কোন একটা গুরুতর ফৌজদারী মকদ্দমায়
পুরন্দরকে জড়াইয়া ফেলা তাঁহার মনোগত ইচ্ছা, মনোগত চেষ্টা; কিন্তু সোজা
পথে সুযোগ ঘটিয়া উঠিতেছে না, ইহা বুঝিতে পারিয়া মনে মনে তিনি বক্রপথ
কল্পনা করিতেছিলেন।

পুলিশের এবং ফৌজদারী আদালতের প্রধান প্রধান আমলাবর্গের সহিত
দর্পনারায়ণ বিশেষ আলাপ রাখিতেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া
ভোজ দিতেন, পার্ব্বণে পার্ব্বণে পার্ব্বণী দিতেন, এক একটা পার্ব্বণে তাঁহাদের
বাসায় বাসায় ভেট পাঠাইতেন; স্বভাবতঃ রূক্ষভাষী হইলেও, স্বভাব গোপন
করিয়া সেই সকল লোকের সহিত বেশ মিষ্টালাপ করিতেন, কদাচ তাঁহাদের
প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেন না।

দুই তিন বৎসর এইরূপে যায়। একদিন প্রাতঃকালে হঠাৎ জনকতক পুলি-
শের লোক পুরন্দর বাবুজীর সদরবাড়ীতে উপস্থিত হইল।

পুরন্দরের পুত্রগুলি সকলেই বাবু। কেবল দুই অক্ষরে বাবু নহে, সংযোগ
আছে তৃতীয় অক্ষর, "জী"। অকস্মাৎ বাড়ীর মধ্যে পুলিশের দল প্রবেশ করিল,
কারণ কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, একসঙ্গে চতুর্দ্দশ বাবুজী সদরবাড়ী
প্রাঙ্গণে দর্শন দিলেন। অ[illegible]বর্ত্তী রামদয়ালবাবু। কর্ত্তা তখন পূজায় বসিয়াছিলে[illegible]
[illegible] হইলেন, কিন্তু পূজার আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া [illegible]

[illegible]লের লোক প্রায় দ্বাদশ জন। তাহাদের সঙ্গে আরও চারি পাঁচ জন [illegible]
লোক। পুলিশের দলে যিনি প্রধান, তিনি নায়েব-দারোগা। সম্মুখবর্ত্তী রামদয়াল-বাবুকে নিকটে ডাকিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি পুরন্দরবাবুর কে হন?" রামদয়াল উত্তর করিলেন, "তাঁহার পুত্র; আমরা সকলেই তাঁহার পুত্র। হঠাৎ আপনাদের এখানে উপস্থিত হইবার হেতু কি, তাহাই আমরা জানিতে আসিয়াছি।"

থানার বাঙ্গালী দারোগা তখন ছুটী লইয়াছিলেন, বর্ত্তমান নায়েব-দারোগাটী তাঁহার প্রতিনিধি। ইনি নূতন আসিয়াছেন, এলাকার সকল ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার জানা-শুনা হয় নাই, পুরন্দরবাবুর পরিবারের পরিচয় তিনি জানিতেন না, সেই কারণেই রামদয়ালের প্রতি ঐরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। রামদয়ালের উত্তর শ্রবণ করিয়া তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার পিতা কোথায়?"

রামদয়াল।—তিনি সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতেছেন।

দারোগা।—ডাকুন।

রাম।—সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপ্ত না হইলে তিনি উঠিতে পারিবেন না।

দারোগা।—(হাকিমী স্বরে) ডাকুন, এখন সন্ধ্যাবন্দনা করিবার সময় নয়; এখনই তাঁহাকে থানায় যাইতে হইবে।

রাম।—থানায় যাইতে হয়, এমন কোন কার্য্য তিনি করেন নাই। তিনি বৃদ্ধলোক, গৃহের বাহির হন না, কেন আপনি তাঁহাকে থানায় লইয়া যাইতে চান? বিশেষতঃ তিনি এখন ইষ্টদেবতার পূজা করিতেছেন, এখন আমি তাঁহাকে উত্যক্ত করিতে পারিব না।

দারোগা।—সরকারী কার্য্যের জন্য প্রয়োজন, এখনই তাঁহাকে যাইতে হইবে। বৃদ্ধ কি অবৃদ্ধ, সে বিচার করিবার জন্য আমি এখানে আসি নাই। আপনি ডাকুন।

রাম।—ইহা আপনার অন্যায় হুকুম।

দারোগা।—ন্যায়ান্যায় বিচার করিবার কর্ত্তা আপনি নহেন; ডাকুন।

রাম।—কি কারণে তাঁহাকে আপনার প্রয়োজন, আমাকে কি সে কথা আপনি বলিতে পারেন?

[illegible] নির[illegible] পারিবেন? [illegible]

হইতেন না, সেই কারণে দর্পনারায়ণের দল অপেক্ষা তাঁহার দলে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের
সংখ্যা অধিক ছিল। তদ্ব্যতীত তিনি সদালাপী, মিষ্টভাষী, স্বজনপ্রিয়। মুখের
কথায় লোকের সহিত অমায়িক ব্যবহার করা তাঁহার প্রকৃতির একটী উত্তম
পরিচয়। তাঁহার ঐ সকল গুণে গ্রামের এবং ভিন্নগ্রামের অনেক লোক তাঁহার
বাধ্য ছিল। কৃপণস্বভাব দর্পনারায়ণ সে সকল গুণে বঞ্চিত ছিলেন, তাহার উপর
অত্যন্ত রূক্ষভাষী; লোকেরা তাঁহার নিকট বাধ্যতা স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ হইত,
তজ্জন্য পুরন্দরের উপর দর্পনারায়ণের অধিক হিংসা।

মামলা-মকদ্দমায় উভয়পক্ষের বিস্তর টাকা ব্যয় হইয়া যাইত, কিন্তু কোন
কৌশলে দর্পনারায়ণের নিগূঢ় অভিসন্ধি সুসিদ্ধ হইত না। তাঁহার অভিসন্ধি
ছিল, পুরন্দরকে বিপদে ফেলা। দেওয়ানী মকদ্দমায় সে অভিসন্ধি সিদ্ধ হওয়া
অসম্ভব, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন, কোন একটা গুরুতর ফৌজদারী মকদ্দমায়
পুরন্দরকে জড়াইয়া ফেলা তাঁহার মনোগত ইচ্ছা, মনোগত চেষ্টা; কিন্তু সোজা-
পথে সুযোগ ঘটিয়া উঠিতেছে না, ইহা বুঝিতে পারিয়া মনে মনে তিনি বক্রপথ
কল্পনা করিতেছিলেন।

পুলিশের এবং ফৌজদারী আদালতের প্রধান প্রধান আমলাবর্গের সহিত
দর্পনারায়ণ বিশেষ আলাপ রাখিতেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া
ভোজ দিতেন, পার্ব্বণে পার্ব্বণে পার্ব্বণী দিতেন, এক একটা পার্ব্বণে তাঁহাদের
বাসায় বাসায় ভেট পাঠাইতেন; স্বভাবতঃ রূক্ষভাষী হইলেও, স্বভাব গোপন
করিয়া সেই সকল লোকের সহিত বেশ মিষ্টালাপ করিতেন, কদাচ তাঁহাদের
প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেন না।

দুই তিন বৎসর এইরূপে যায়। একদিন প্রাতঃকালে হঠাৎ জনকতক পুলি-
শের লোক পুরন্দর বাবুজীর সদরবাড়ীতে উপস্থিত হইল।

পুরন্দরের পুত্রগুলি সকলেই বাবু। কেবল দুই অক্ষরে বাবু নহে, সংযোগ
আছে তৃতীয় অক্ষর, "জী"। অকস্মাৎ বাড়ীর মধ্যে পুলিশের দল প্রবেশ করিয়া
কারণ কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, একসঙ্গে চতুর্দ্দশ বাবুজী সদরবাড়ী
প্রাঙ্গণে দর্শন দিলেন। অ[illegible]বর্ত্তী রামদয়ালবাবু। কর্ত্তা তখন পূজায় বসিয়াছিলে[illegible]
[illegible] হইতেন, কিন্তু পূজার আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া [illegible]

[illegible]শের লোক প্রায় দ্বাদশ জন। তাহাদের সঙ্গে আরও চারি পাঁচ জন [illegible]
লোক। পুলিশের দলে যিনি প্রধান, তিনি নায়েব-দারোগা। সম্মুখবর্ত্তী রামদয়াল-
বাবুকে নিকটে ডাকিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি পুরন্দরবাবুর কে
হন?" রামদয়াল উত্তর করিলেন, "তাঁহার পুত্র; আমরা সকলেই তাঁহার পুত্র।
হঠাৎ আপনাদের এখানে উপস্থিত হইবার হেতু কি, তাহাই আমরা জানিতে
আসিয়াছি।"

থানার বাহালী দারোগা তখন ছুটী লইয়াছিলেন, বর্ত্তমান নায়েব-দারোগাটী
তাঁহার প্রতিনিধি। ইনি নূতন আসিয়াছেন, এলাকার সকল ভদ্রলোকের
সহিত তাঁহার জানা-শুনা হয় নাই, পুরন্দরবাবুর পরিবারের পরিচয় তিনি
জানিতেন না, সেই কারণেই রামদয়ালের প্রতি ঐরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন।
রামদয়ালের উত্তর শ্রবণ করিয়া তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার পিতা
কোথায়?"

রামদয়াল।—তিনি সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতেছেন।

দারোগা।—ডাকুন।

রাম।—সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপ্ত না হইলে তিনি উঠিতে পারিবেন না।

দারোগা।—(হাকিমী স্বরে) ডাকুন, এখন সন্ধ্যাবন্দনা করিবার সময় নয়;
এখনই তাঁহাকে থানায় যাইতে হইবে।

রাম।—থানায় যাইতে হয়, এমন কোন কার্য্য তিনি করেন নাই। তিনি
বৃদ্ধলোক, গৃহের বাহির হন না, কেন আপনি তাঁহাকে থানায় লইয়া যাইতে
চান? বিশেষতঃ তিনি এখন ইষ্টদেবতার পূজা করিতেছেন, এখন আমি তাঁহাকে
উত্যক্ত করিতে পারিব না।

দারোগা।—সরকারী কার্য্যের জন্য প্রয়োজন, এখনই তাঁহাকে যাইতে হইবে।
বৃদ্ধ কি অবৃদ্ধ, সে বিচার করিবার জন্য আমি এখানে আসি নাই। আপনি ডাকুন।

রাম।—ইহা আপনার অন্যায় হুকুম।

দারোগা।—ন্যায়ান্যায় বিচার করিবার কর্ত্তা আপনি নহেন; ডাকুন।

রাম।—কি কারণে তাঁহাকে আপনার প্রয়োজন, আমাকে কি সে কথা
আপনি বলিতে পারেন?

[illegible] পারিবেন? [illegible]

রাম।—উত্তর দিবার যোগ্য হইলে অবশ্য পারিব। আপনা
নায়েব-দারোগা বসিলেন; রামদয়ালকে বসিতে বলিলেন না। আপনি অস্পষ্টস্বরে কি কয়েকটা বাক্য উচ্চারণ করিয়া রামদয়ালকে তিনি বলিলেন, "একটী স্ত্রীলোক আপনাদের গোয়ালবাড়ীতে একরাত্রি কয়েদ ছিল, তাহার পর নিরুদ্দেশ; কোথাও তাহাকে পাওয়া যাইতেছে না। কোথায় গেল, তাহা কি আপনি জানেন?"

রাম।—আমাদের বাড়ীতে কে কখনও কয়েদ থাকে না। কেনই বা থাকিবে? ভদ্রলোকের বাড়ী জেলখানা নহে।

দারোগা।—ছিল, প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, আপনি অস্বীকার করিলে আপনাকেও আমি——

রাম।—(দারোগার অসমাপ্ত বাক্যের ভাব বুঝিয়া) সে স্ত্রীলোকের নাম কি?

দারোগা।—প্রসন্নমুখী নাগ।

রাম।—সে নামের কোন স্ত্রীলোককে আমরা চিনি না।

দারোগা।—এই জেলার মাণিকপুর মহল আপনাদের তালুক, তাহা আপনি জানেন?

রাম।—জানি।

দারোগা।—সেই মাণিকপুরের অন্তর্গত শিলাপুর গ্রাম; সেই গ্রামে প্রসন্নমুখী নাগের বিবাহ হইয়াছিল।

রাম।—[illegible] শুনিয়া আমি কি বুঝিব?

যে কয়েকজন অপরলোক পুলিশের লোকের সঙ্গে ছিল, তাহাদের মধ্যে একজনকে দেখাইয়া দারোগা বলিলেন, "ঐ লোকটীর নাম ভৃগুরাম সাঁফুই! প্রসন্নমুখী নাগ উহারই বিবাহিতা পত্নী। সেই পত্নী হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়াতে ঐ ব্যক্তি অনেক অন্বেষণ করিয়াছিল, শেষে জানিতে পারে, আপনাদের পেয়াদারা তাহাকে ধরিয়া এখানে আনিয়াছিল, গোয়ালবাড়ীতে আটক রাখিয়াছিল, তাহার [illegible] কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কিছুই প্রকাশ পাইতেছে না। ভৃগুরামের সন্দেহ হয়, আপনাদের লোকেরা তাহাকে খুন করিয়াছে।"

রামদয়ালের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। দারোগার বাক্যের তাৎপর্য্য কিছুই [illegible] না পারিয়া [illegible]

আমাদের সংসারের ধর্ম্ম নয়; স্ত্রীলোক দূরে থাকুক, কোন পুরুষকেও গুম করিয়া গোপন রাখা এ সংসারে কখনও হয় নাই।"

একটু দুষ্ট হাসি হাসিয়া দারোগা বলিলেন, "কখনও হয় নাই বলিয়া এখন কি হইতে পারে না? বিশেষ তত্ত্ব না জানিয়া ভৃগুরাম কি মিথ্যাকথা বলিতেছে? আপনাদের গোয়ালবাড়ীর দুইজন রাখাল এই ভৃগুরামকে ঐ সকল কথা জানাইয়াছে। খুনের কথা জানায় নাই সত্য, কিন্তু গুমের কথা প্রকাশ করিয়াছে; খুনের কথাটা ভৃগুরামের সন্দেহ। বড় গুরুতর মকদ্দমা। আপনার মুখের কথায় এত বড় মকদ্দমা আমি লঘু বিবেচনা করিতে পারি না। আপনার পিতাকে আপনি সংবাদ দিন। আমি বরং আরও কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতেছি, শীঘ্র শীঘ্র পূজা সাঙ্গ করিয়া তিনি এখানে আসুন।"

রামদয়াল নিস্তব্ধ হইলেন। দারোগা ঘূর্ণিত-নয়নে আপনার দলের লোকগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। রামদয়াল বাবুটী সুশিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, অনেক মামলামকদ্দমার কথা শুনিয়াছেন, দেশের পুলিশ যে প্রকার শিষ্টশান্ত, তাহাও অবগত হইয়াছেন, পুলিশের লোকেরা সাধারণতঃ যে প্রকার ধর্ম্মপালন করেন, অনেক প্রমাণে তাহাও জানিতে শুনিতে তাঁহার বাকী ছিল না। নায়েব-দারোগার কথাগুলি শুনিয়া তিনি আপন মনে মনে সম্ভব অসম্ভব অনেক প্রকার আলোচনা করিলেন। সিউড়ীর স্কুল হইতে প্রবেশিকা-পরীক্ষা দিয়া তিনি কলিকাতার এক কলেজে পাঠ সমাপ্ত করেন। কলিকাতায় তাঁহাকে অনেক দিন থাকিতে হইয়াছিল; কলিকাতার দাঁড়-দস্তুর তিনি অনেক দূর পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। দারোগার মুখের প্রথম কথাগুলি তাঁহার মনে জাগিতেছিল। প্রসন্নমুখী নাগ। স্ত্রীলোকের এ প্রকার নাম কলিকাতার নূতন ফ্যাসান্। যে সকল শিক্ষিতা স্ত্রীলোক কলিকাতায় থাকে, তাহারাই ব্যাকরণের অপমান করিয়া ঐরূপ নাম লয়। ভৃগুরাম সাঁফুইয়ের স্ত্রী শিলাপুরের জঙ্গলে বাস করিয়া ঐরূপ নাম পাইয়াছিল, কিছুতেই ইহা সম্ভব বোধ হয় না। কলিকাতার দস্তুর মানিতে হইলেও মূলকথা বিবেচনা করিতে হয়। যে স্ত্রীলোকের স্বামীর উপাধি সাঁফুই, তাহার উপাধি হইল নাগ, গোড়াতেই গোলমাল। দ্বিতীয় কথা—একরাত্রি [illegible] আটক [illegible] হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইয়াছে, আমাদের [illegible]

রাম।—উত্তর দিবার যোগ্য হইলে অবশ্য পারিব।

নায়েব-দারোগা বসিলেন ; রামদয়ালকে বসিতে বলিলেন না। আপনা

আপনি অস্পষ্টস্বরে কি কয়েকটা বাক্য উচ্চারণ করিয়া রামদয়ালকে তিনি

বলিলেন, "একটী স্ত্রীলোক আপনাদের গোয়ালবাড়ীতে একরাত্রি কয়েদ ছিল,

তাহার পর নিরুদ্দেশ ; কোথাও তাহাকে পাওয়া যাইতেছে না।—কোথায়

গেল, তাহা কি আপনি জানেন ?"

রাম।—আমাদের বাড়ীতে কে [illegible] কখনও কয়েদ থাকে না। কেনই বা

থাকিবে ? ভদ্রলোকের বাড়ী জেলখানা নহে।

দারোগা।—ছিল, প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, আপনি অস্বীকার করিলে

আপনাকেও আমি——

রাম।—(দারোগার অসমাপ্ত বাক্যের ভাব বুঝিয়া) সে স্ত্রীলোকের নাম কি ?

দারোগা।—প্রসন্নমুখী নাগ।

রাম।—সে নামের কোন স্ত্রীলোককে আমরা চিনি না।

দারোগা।—এই জেলার মাণিকপুর মহল আপনাদের তালুক, তাহা

আপনি জানেন ?

রাম।—জানি।

দারোগা।—সেই মাণিকপুরের অন্তর্গত শিলাপুর গ্রাম ; সেই গ্রামে প্রসন্নমুখী

নাগের বিবাহ হইয়াছিল।

রাম।—[illegible] শুনিয়া আমি কি বুঝিব ?

যে কয়েকজন অপরলোক পুলিশের লোকের সঙ্গে ছিল, তাহাদের মধ্যে

একজনকে দেখাইয়া দারোগা বলিলেন, "ঐ লোকটীর নাম ভৃগুরাম সাঁফুই।

প্রসন্নমুখী নাগ উহারই বিবাহিতা পত্নী। সেই পত্নী হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়াতে

ঐ ব্যক্তি অনেক অন্বেষণ করিয়াছিল, শেষে জানিতে পারে, আপনাদের

পেয়াদারা তাহাকে ধরিয়া এখানে আনিয়াছিল, গোয়ালবাড়ীতে আটক

রাখিয়াছিল, তাহার [illegible] কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কিছুই প্রকাশ পাইতেছে না।

ভৃগুরামের সন্দেহ হয়, আপনাদের লোকেরা তাহাকে খুন করিয়াছে।"

রামদয়ালের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। দারোগার বাক্যের তাৎপর্য্য কিছুই

[illegible] না পারিয়া [illegible]

আমাদের সংসারের ধর্ম্ম নয় ; স্ত্রীলোক দূরে থাকুক, কোন পুরুষকেও গুম করিয়া গোপন রাখা এ সংসারে কখনও হয় নাই।"

একটু দুষ্ট হাসি হাসিয়া দারোগা বলিলেন, "কখনও হয় নাই বলিয়া এখন কি হইতে পারে না ? বিশেষ তত্ত্ব না জানিয়া ভৃগুরাম কি মিথ্যাকথা বলিতেছে ? আপনাদের গোয়ালবাড়ীর দুইজন রাখাল এই ভৃগুরামকে ঐ সকল কথা জানাইয়াছে। খুনের কথা জানায় নাই সত্য, কিন্তু গুমের কথা প্রকাশ করিয়াছে ; খুনের কথাটা ভৃগুরামের সন্দেহ। বড় গুরুতর মকদ্দমা। আপনার মুখের কথায় এত বড় মকদ্দমা আমি লঘু বিবেচনা করিতে পারি না। আপনার পিতাকে আপনি সংবাদ দিন। আমি বরং আরও কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতেছি, শীঘ্র শীঘ্র পূজা সাঙ্গ করিয়া তিনি এখানে আসুন।"

রামদয়াল নিস্তব্ধ হইলেন। দারোগা ঘূর্ণিত-নয়নে আপনার দলের লোকগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। রামদয়াল বাবুটী সুশিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, অনেক মামলামকদ্দমার কথা শুনিয়াছেন, দেশের পুলিশ যে প্রকার শিষ্টশান্ত, তাহাও অবগত হইয়াছেন, পুলিশের লোকেরা সাধারণতঃ যে প্রকার ধর্ম্মপালন করেন, অনেক প্রমাণে তাহাও জানিতে শুনিতে তাঁহার বাকী ছিল না। নায়েব-দারোগার কথাগুলি শুনিয়া তিনি আপন মনে মনে সম্ভব অসম্ভব অনেক প্রকার আলোচনা করিলেন। সিউড়ীর স্কুল হইতে প্রবেশিকা-পরীক্ষা দিয়া তিনি কলিকাতার এক কলেজে পাঠ সমাপ্ত করেন। কলিকাতায় তাঁহাকে অনেক দিন থাকিতে হইয়াছিল ; কলিকাতার দাঁড়-দস্তুর তিনি অনেক দূর পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। দারোগার মুখের প্রথম কথাগুলি তাঁহার মনে জাগিতেছিল। প্রসন্নমুখী নাগ। স্ত্রীলোকের এ প্রকার নাম কলিকাতার নূতন ফ্যাসান্। যে সকল শিক্ষিতা স্ত্রীলোক কলিকাতায় থাকে, তাহারাই ব্যাকরণের অপমান করিয়া ঐরূপ নাম লয়। ভৃগুরাম সাঁফুইয়ের স্ত্রী শিলাপুরের জঙ্গলে বাস করিয়া ঐরূপ নাম পাইয়াছিল, কিছুতেই ইহা সম্ভব বোধ হয় না। কলিকাতার দস্তুর মানিতে হইলেও মূলকথা বিবেচনা করিতে হয়। যে স্ত্রীলোকের স্বামীর উপাধি সাঁফুই, তাহার উপাধি হইল নাগ, গোড়াতেই গোলমাল। দ্বিতীয় কথা—একরাত্রি [illegible] হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইয়াছে, আমাদের [illegible] আর দ্বাদশজন [illegible]

রাখালেরা শিলাপুরের ভৃগুরাম সাঁফুইকে সেই কথা বলিয়াছে, ইহাও ত কোন-
মতে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। চক্রান্ত;—ইহার মধ্যে বিষম চক্রান্ত!—
সমস্তই মিথ্যাকথা।—দেশের মামলাবাজ লোকেরা যে প্রকারে মিথ্যা মকদ্দমা
সাজাইতে পারে, সেই প্রকারে এই ঘটনার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহাতে আর
সন্দেহ থাকিতেছে না।

রামদয়াল মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছিলেন, নায়েব-দারোগা তাঁহার দিকে
চাহিয়া দেখেন নাই, হঠাৎ চাহিয়া দেখিয়া অশিষ্টাচারে জিজ্ঞাসা করিলেন,
"কৈ? আপনি আপনার পিতাকে সংবাদ দিতে যান নাই? আমার কথা কি
গ্রাহ্য হইতেছে না? আপনাদের সকলকেই আমি একসঙ্গে চালান—"

"তারা! ব্রহ্মময়ী! কালী! কল্পতরু!" এইরূপ মহাশক্তির নামোচ্চারণ
করিতে করিতে পুরন্দরবাবু অন্দর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার
পরিধান পট্টবস্ত্র গাত্রে দশমহাবিদ্যা-নামাঙ্কিত নামাবলী, ললাটে রক্তচন্দনের দীর্ঘ
ফোঁটা, চরণে কাষ্ঠপাদুকা। তাঁহাকে দেখিয়াই রামদয়ালবাবু বিনীতস্বরে দারো-
গাকে বলিলেন, "এই কর্ত্তা আসিয়াছেন, আপনার যাহা বলিবার আছে, বলিতে
পারেন।"

নায়েব-দারোগা ইতিপূর্ব্বে পুরন্দরবাবুকে দেখেন নাই, চেহারা দর্শন করিয়া
তাঁহার মনে কেমন একপ্রকার নূতন ভাবের আবির্ভাব হইল, কর্ত্তব্যানুরোধে সে
ভাব গোপন করিয়া, ইত্যগ্রে রামদয়ালবাবুকে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, কর্ত্তাকে
সেই সকল কথা কহিলেন। পুরন্দরবাবু তিনবার দুর্গানাম উচ্চারণ করিয়া হস্তদ্বারা
উভয় কর্ণ আচ্ছাদন করিলেন। নায়েব-দারোগা বলিলেন, "কর্ণ আচ্ছাদন করিলে
চলিবে না, আপনাকে থানায় যাইতে হইবে।"

পুরন্দরবাবু মামলা মকদ্দমা অনেক করিয়াছেন, কিন্তু পুলিশের হাঙ্গামায়
কখনও পড়িতে হয় নাই, বৃদ্ধবয়সে অত বড় একটা ভয়ানক অভিযোগে পুলি-
শের লোকের সহিত থানায় যাইতে হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া অন্তরে অন্তরে তিনি
কাঁপিলেন। উপায় কি? পুলিশের লোকের সহিত বাগ্বিতণ্ডা করিয়া
যাইতে অস্বীকার করিলে কোন উপকার হইবে না, বিপদ্ বরং অলঙ্কৃত হইয়া
উঠিবে, ইহা স্থির করিয়া দারোগাকে তিনি বলিলেন, "একান্তই যদি যাইতে হয়,
তবে চলুন, যাইতে আর কোন ...

বিন্দুবিসর্গও আমি জানি না। আমার বোধ হয়, কোন বিপক্ষ পক্ষ আমাকে
কষ্ট দিবার মতলবে এই মিথ্যা মকদ্দমা সাজাইয়াছে।"

দারোগা কহিলেন, "সত্যমিথ্যা আদালতে অপ্রকাশ থাকিবে না, আপনি যদি
নির্দ্দোষী হন, খালাস পাইয়া আসিবেন, অন্যপক্ষ শাস্তি পাইবে, আইনের মর্ম্মই
এইরূপ।"

আর বাক্যব্যয় না করিয়া, সেই বেশেই পুলিশের লোকগুলির সঙ্গে পুরন্দর-
বাবু পদব্রজে থানায় চলিলেন। পুলিশের সঙ্গে যে কয়েকজন অপরলোক ছিল,
জনান্তিকে পরস্পর মুখচাহাচাহি করিয়া তাহারাও পশ্চাদ্গমন করিল। বৃদ্ধপিতা
একটা মিথ্যা হাঙ্গামায় একাকী থানায় যাইতেছেন, উদ্বিগ্নচিত্তে রামদয়ালবাবুও
তাঁহার অনুগামী হইলেন।

যে কারণেই হউক, ভৃগুরাম সাঁফুই কেবল পুরন্দরবাবুর নামেই এজাহার
করিয়াছিল, পুত্রগণের নাম করে নাই, সুতরাং কেবল পুরন্দরবাবুকেই ফৌজদারী
আদালতে হাজির হইতে হইবে, দারোগা এইরূপ অভিপ্রায় জানাইলেন। ভৃগুরাম
যেরূপ এজাহার দিয়াছিল, দারোগা স্বয়ং তাহা পাঠ করিয়া পুরন্দরবাবুকে শুনাই-
লেন, অভিযোগের উত্তরে পুরন্দরবাবু যাহা যাহা বলিলেন, থানার কাগজে
তাহাও লিখিয়া লওয়া হইল, নিজের সম্ভ্রমে জামীনে বেলা প্রায় দুইপ্রহরের সময়
পুরন্দরবাবু গৃহে আসিলেন। রামদয়ালবাবু পিতার সঙ্গে না আসিয়া আর
কিয়ৎক্ষণ দারোগার নিকটে বসিয়া রহিলেন, নির্জ্জনে দারোগার সহিত তাঁহার
কি কি কথা হইল, প্রকাশ পাইল না, প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে দারোগার নিকট
হইতে তিনি বিদায়গ্রহণ করিলেন। সেদিন রবিবার ছিল, পরদিন বেলা দশটার
সময় পুরন্দরবাবুকে ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে, এইরূপ অবধা-
রিত থাকিল।

ভৃগুরাম সাঁফুই থানায় বলিয়াছে, বাবুর বাড়ীর দুইজন রাখাল তাহাকে
ঐ গুমের বৃত্তান্ত জানাইয়াছিল, থানার কাগজে সেই দুইজন রাখালের নাম আছে।
বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আহারাদির পর পুরন্দরবাবু তাঁহার রাখালগণকে ডাকা-
ইলেন। মফস্বলের ভূস্বামীরা নিজ চাষের জন্য অনেক জমী খাসে রাখেন।
পুরন্দরবাবুর চাষের জমী একশত বিঘার অধিক। চাষের জন্য পাঁচখানা লাঙ্গল,
... আর দ্বাদশজন ... ও ... নিযুক্ত ছিল। বাবু যখন রাখাল-

রাখালেরা শিলাপুরের ভৃগুরাম সাঁফুইকে সেই কথা বলিয়াছে, ইহাও ত কোন-মতে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। চক্রান্ত;—ইহার মধ্যে বিষম চক্রান্ত!—সমস্তই মিথ্যাকথা।—দেশের মাম্‌লাবাজ লোকেরা যে প্রকারে মিথ্যা মকদ্দমা সাজাইতে পারে, সেই প্রকারে এই ঘটনার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না।

রামদয়াল মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছিলেন, নায়েব-দারোগা তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখেন নাই, হঠাৎ চাহিয়া দেখিয়া অশিষ্টাচারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ? আপনি আপনার পিতাকে সংবাদ দিতে যান নাই? আমার কথা কি গ্রাহ্য হইতেছে না? আপনাদের সকলকেই আমি একসঙ্গে চালান—"

"তারা! ব্রহ্মময়ী! কালী! কল্পতরু!" এইরূপ মহাশক্তির নামোচ্চারণ করিতে করিতে পুরন্দরবাবু অন্দর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার পরিধান পট্টবস্ত্র গাত্রে দশমহাবিদ্যা-নামাঙ্কিত নামাবলী, ললাটে রক্তচন্দনের দীর্ঘ-ফোঁটা, চরণে কাষ্ঠপাদুকা। তাঁহাকে দেখিয়াই রামদয়ালবাবু বিনীতস্বরে দারো-গাকে বলিলেন, "এই কর্ত্তা আসিয়াছেন, আপনার যাহা বলিবার আছে, বলিতে পারেন।"

নায়েব-দারোগা ইতিপূর্ব্বে পুরন্দরবাবুকে দেখেন নাই, চেহারা দর্শন করি তাঁহার মনে কেমন একপ্রকার নূতন ভাবের আবির্ভাব হইল, কর্ত্তব্যানুরোধে ে ভাব গোপন করিয়া, ইত্যগ্রে রামদয়ালবাবুকে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, কর্ত্তাকে সেই সকল কথা কহিলেন। পুরন্দরবাবু তিনবার দুর্গানাম উচ্চারণ করিয়া হস্তদ্বা উভয় কর্ণ আচ্ছাদন করিলেন। নায়েব-দারোগা বলিলেন, "কর্ণ আচ্ছাদন করি চলিবে না, আপনাকে থানায় যাইতে হইবে।"

পুরন্দরবাবু মামলা মকদ্দমা অনেক করিয়াছেন, কিন্তু পুলিশের হাঙ্গাম কখনও পড়িতে হয় নাই, বৃদ্ধবয়সে অত বড় একটা ভয়ানক অভিযোগে পুলি-শের লোকের সহিত থানায় যাইতে হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া অন্তরে অন্তরে তি কাঁপিলেন। উপায় কি? পুলিশের লোকের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করি যাইতে অস্বীকার করিলে কোন উপকার হইবে না, বিপদ্ বরং অলঙ্কৃত হই উঠিবে, ইহা স্থির করিয়া দারোগাকে তিনি বলিলেন, "একান্তই যদি যাইতে তবে চলুন, যাইতে আর কোন [illegible]

বিন্দুবিসর্গও আমি জানি না। আমার বোধ হয়, কোন বিপক্ষ পক্ষ আমাকে কষ্ট দিবার মতলবে এই মিথা মকদ্দমা সাজাইয়াছে।"

দারোগা কহিলেন, "সত্যমিথ্যা আদালতে অপ্রকাশ থাকিবে না, আপনি যদি নির্দ্দোষী হন, খালাস পাইয়া আসিবেন, অন্যপক্ষ শাস্তি পাইবে, আইনের মর্ম্মই এইরূপ।"

আর বাক্যব্যয় না করিয়া, সেই বেশেই পুলিশের লোকগুলির সঙ্গে পুরন্দর-বাবু পদব্রজে থানায় চলিলেন। পুলিশের সঙ্গে যে কয়েকজন অপরলোক ছিল, জনান্তিকে পরস্পর মুখচাহাচাহি করিয়া তাহারাও পশ্চাদ্গমন করিল। বৃদ্ধপিতা একটা মিথ্যা হাঙ্গামায় একাকী থানায় যাইতেছেন, উদ্বিগ্নচিত্তে রামদয়ালবাবুও তাঁহার অনুগামী হইলেন।

যে কারণেই হউক, ভৃগুরাম সাঁফুই কেবল পুরন্দরবাবুর নামেই এজাহার করিয়াছিল, পুত্রগণের নাম করে নাই, সুতরাং কেবল পুরন্দরবাবুকেই ফৌজদারী আদালতে হাজির হইতে হইবে, দারোগা এইরূপ অভিপ্রায় জানাইলেন। ভৃগুরাম যেরূপ এজাহার দিয়াছিল, দারোগা স্বয়ং তাহা পাঠ করিয়া পুরন্দরবাবুকে শুনাই-লেন, অভিযোগের উত্তরে পুরন্দরবাবু যাহা যাহা বলিলেন, থানার কাগজে তাহাও লিখিয়া লওয়া হইল, নিজের সম্ভ্রমে জামীনে বেলা প্রায় দুইপ্রহরের সময় পুরন্দরবাবু গৃহে আসিলেন। রামদয়ালবাবু পিতার সঙ্গে না আসিয়া আর কিয়ৎক্ষণ দারোগার নিকটে বসিয়া রহিলেন, নির্জ্জনে দারোগার সহিত তাঁহার কি কি কথা হইল, প্রকাশ পাইল না, প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে দারোগার নিকট হইতে তিনি বিদায়গ্রহণ করিলেন। সেদিন রবিবার ছিল, পরদিন বেলা দশটার সময় পুরন্দববাবুকে ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে, এইরূপ অবধা-রিত থাকিল।

ভৃগুরাম সাঁফুই থানায় বলিয়াছে, বাবুর বাড়ীর দুইজন রাখাল তাহাকে ঐ গুমের বৃত্তান্ত জানাইয়াছিল, থানার কাগজে সেই দুইজন রাখালের নাম আছে। বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আহারাদির পর পুরন্দরবাবু তাঁহার রাখালগণকে ডাকা-ইলেন। মফস্বলের ভূস্বামীরা নিজ চাষের জন্য অনেক জমী খাসে রাখেন। পুরন্দরবাবুর চাষের জমী একশত বিঘার অধিক। চাষের জন্য পাঁচখানা লাঙ্গল, [illegible] আর দ্বাদশজন [illegible] ও [illegible] নিযুক্ত ছিল। বাবু যখন রাখাল-

গণকে ডাকাইলেন, তখন দশজনমাত্র হাজির হইল, দুইজন অনুপস্থিত। সে দুইজন কোথায় গিয়াছে, প্রশ্ন হইলে একজন রাখাল উত্তর দিল, "চারিদিন তাহারা কামাই করিতেছে।" সে দুইজনের নাম কি, কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, যে উত্তর পাইলেন, তাহাতে থানার কাগজে লেখা যে দুই নাম, সেই দুই নাম ঠিক মিলিল।

রাখালগণকে বিদায় দিয়া পুরন্দরবাবু চিন্তা-নিমগ্ন হইলেন, এ মকদ্দমায় বিষম চক্রান্ত আছে, চিন্তা করিয়া স্পষ্টই তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন; চক্রান্তের সৃষ্টিকর্ত্তা কে, তাহাও বুঝিতে বাকী রহিল না।

র ববারের রবিশশী অস্তাচলে চলিয়া গেলেন, ভাবনায় ভাবনায় পুরন্দরবাবুর সমস্ত রজনী নিদ্রা হইল না। মকদ্দমা তিনি অনেক করিয়াছেন, অস্থিতে অস্থিতে মকদ্দমার যন্ত্রণাশূল বিদ্ধ হইয়া আছে, কিন্তু এমন মকদ্দমায় তিনি কখনও জড়িত হন নাই।

রজনী প্রভাত হইল। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে পুরন্দরবাবুর ভাবনা বাড়িল। উপযুক্ত সময়ে আপন জ্যেষ্ঠপুত্রকে সঙ্গে লইয়া তিনি আদালতে উপস্থিত হইলেন। জেলার তিনজন প্রধান উকীলের নামে ওকালতনামা দেওয়া হইল।

প্রথমদিনের এজলাসে ফরিয়াদী এজাহার, সাক্ষীগণের জবানবন্দী, তাহার পর আসামীর জবাব। মকদ্দমা গুরুতর, নিশ্চয়ই দায়রায় যাইবে, ইহা স্থির জানিয়া উকীলেরা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের সমীপে ফরিয়াদীর উপর এবং ফরিয়াদীর সাক্ষীগণের উপর জেরা করিলেন না, জজ-সাহেবের সম্মুখে জেরা করা হইবে, হাকিমেক এই কথা বলিয়া সে দিন তাঁহারা জামীন হইয়া আসামীকে খালাস লইবার দরখাস্ত করিলেন। তাদৃশ মকদ্দমায় জামীন মঞ্জুর হইতে পারে না, এই আপত্তি তুলিয়া ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর জামীন মঞ্জুর করিতে প্রথমে অসম্মত হইলেন। পুরন্দরবাবু একজন সম্ভ্রান্ত জমীদার, তিনি পলায়ন করিবেন না, আইন অমান্য করিবেন না, আদালতের হুকুম অমান্য করিবেন না, এই সকল কথা বুঝাইয়া দেওয়াতে শেষকালে জামীন মঞ্জু হইল।

সাক্ষী পাঁচ জন। প্রথমদিন কেবল দুইজন সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হইয়াছিল, দ্বিতীয় দিবসে বাকী তিন জনের জবানবন্দী লওয়া হইবে, এইরূপ স্থির ছিল; কিন্তু সেদিন আ[illegible] প্রধান [illegible]লের জজ-আদাল[illegible]

মকদ্দমা ছিল, সুতরাং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকটে আবেদন করিয়া সেদিনের জন্য ঐ মকদ্দমা মুলতুবী রাখিতে তিনি বাধ্য হইলেন।

যে দুইজন সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হইয়াছিল, তাহাদের একজনের নাম আনন্দ সর্দ্দার, দ্বিতীয়ের নাম ভরত মণ্ডল। তাহারা উভয়েই পুরন্দরবাবুর বাড়ীর রাখাল; তাহারাই প্রধান সাক্ষী। ফরিয়াদী ভৃগুরাম তাহাদের মুখেই গুহ্য বৃত্তান্ত শুনিয়াছিল, এইরূপ প্রকাশ। রাখালেরা গুম্‌করার কথাটা বলিয়াছিল, খুনের বিষয় সত্য কি না, তাহা তাহারা জানে না। ভৃগুরামকে যখন তাহারা গুমের কথা বলে, তখন সেইখানে যে তিনজন লোক উপস্থিত ছিল, তাহাদিগকেও সাক্ষী মান্য করা হয়, তাহাদের নাম ঠাকুরদাস মাইতি, জহর থানাদার ও তিনকড়ি নাইয়া।

তৃতীয় দিবসে সেই তিনজনের সাক্ষ্য লওয়া হয়। সেইদিনেই মকদ্দমা দায়রা-সোপর্দ্দ হয়।

একমাস পরে দায়রার বিচার। দায়রার আদালতে একজন বারিষ্টার নিযুক্ত করা পুরন্দরবাবুর ইচ্ছা, উকীলগণের নিকটে সেই ইচ্ছা তিনি ব্যক্ত করেন। প্রধান উকীল বলেন, এ মকদ্দমা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছে, ইহার জন্য অনর্থক অর্থব্যয় করিয়া বারিষ্টার দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

পুরন্দরবাবু মনে মনে বুঝিয়াছিলেন, বিপক্ষপক্ষের পশ্চাতে প্রবল শত্রু আছে, সুতরাং একজন বারিষ্টার না রাখিলে নিষ্কৃতি লাভ করা কঠিন হইবে, অতএব উকীলের কথা না শুনিয়া বারিষ্টার বায়না করিবার জন্য গ্রামের দুইজন ভদ্রলোকের সহিত তিনি স্বয়ং কালিকাতায় আসিলেন। কলিকাতায় এখন বারিষ্টার অনেক, কথায় কথায় বারিষ্টার নিযুক্ত করা অনেক লোকের পক্ষে সহজ হইয়াছে, সামান্য সামান্য মকদ্দমাতেও উভয়পক্ষ বারিষ্টার দিতে চায়। কলিকাতায় যখন সুপ্রিম কোর্ট ছিল, তখন দুইজন মাত্র বারিষ্টার ছিলেন;—রীচি এবং পিটার্সন্। রীচি দীর্ঘাকার, পিটার্সন্ খর্ব্বাকার। তাঁহাদিগের চেহারা দেখিলে ভয় হইত, তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিলে হৃদয় নাচিত, সেসন্-আদালতে বড় বড় অপরাধীগণকে খালাস করিবার জন্য তাঁহারা যখন বক্তৃতা করিতেন, তাঁহাদিগের কণ্ঠস্বর যখন সেসন্-কোর্টের কড়ি-কাষ্ঠ ভেদ করিয়া উপরে উঠিবার উপক্রম করিত, জ[illegible] গম্ভীরনিনাদে তাঁহাদের [illegible] গৃহমধ্যে প্রতিধ্বনি [illegible] অপরের কথা দূরে থাকুক, বীরমূর্ত্তিধারী

BLOCKED INFORMATION.

সেসনজজও তখন ক্ষণে ক্ষণে ভয় পাইয়া চমকিত হইতেন। তাদৃশ প্রতাপশালী বারিষ্টার কলিকাতায় এখন একজন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে সময় মফস্বল-আদালতে বারিষ্টার আনিবার জন্ত কেহই প্রয়াস পাইতেন না, জেলার উকীলেরাই বিশেষ যোগ্যতার সহিত সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেন। এখন অল্প টাকায় বারিষ্টার পাওয়া যায়, উকীলের নিষেধ সত্ত্বেও পুরন্দরবাবু কলিকাতায় আসিয়া বারিষ্টার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সেই কার্য্যে দশদিন তাঁহাকে কলিকায় থাকিতে হইল, এই অবকাশে তাঁহার বাসগ্রামে আর এক কাণ্ড উপস্থিত।

বাবু পুরন্দর বাবুলীর একটী জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন, তাঁহার নাম সিদ্ধেশ্বর বাবুলী। তাঁহার একটী পুত্র হইয়াছিল, পুত্রের নাম গোপেশ্বর বাবুলী। বিবাহের পর পিতা বর্ত্তমানে গোপেশ্বরের মৃত্যু হয়, পুত্রবধূ বিধবা হইয়া গৃহে থাকে। পুত্রের মৃত্যুর দুই বৎসর পরে সিদ্ধেশ্বরও পরলোকযাত্রা করেন; তাঁহার পত্নীও (গোপেশ্বরের জননী) বিধবা হইয়া দেবরের সংসারে গৃহিণী হইয়া ছিলেন। বারিষ্টার অন্বেষণে পুরন্দর যখন কলিকাতায়, সেই সময় ঐ শাশুড়ী বধূ উভয়েই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বর্দ্ধমান জেলার তারাপুর গ্রামে আশ্রয় লন। গোপেশ্বরের জননীর নাম শুভঙ্করী দেবী, পত্নীর নাম বিশ্বময়ী দেবী। তারাপুর গ্রামে শুভঙ্করী দেবীর পিত্রালয়। পিতা ভ্রাতা কেহই বর্ত্তমান নাই, কেবল একটী নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্র আছে, আর চারি পাঁচটী বিধবা। পুত্রবধূকে লইয়া শুভঙ্করী দেবী সেই বাড়ীতে আসিয়া থাকেন, অর্দ্ধেক বিষয় বাহির করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে দেবরের নামে মকদ্দমা উপস্থিত করা শুভঙ্করী দেবীর সঙ্কল্প। হঠাৎ এ সঙ্কল্প তাঁহার মনে কেন স্থান পাইল, সে সঙ্কল্পের উত্তেজনাকর্ত্তা কে, পাঠকমহাশয় তাহা অনুভব করিয়া লইবেন।

বারিষ্টার নির্ব্বাচন করিয়া বায়নার টাকা জমা দেওয়া হইল, কোন্ দিন মকদ্দমা হইবে, বারিষ্টার তাহা আপন স্মারক পুস্তকে লিখিয়া লইলেন। পুরন্দরবাবু বীরভূমে ফিরিয়া গেলেন।

দায়রার বিচারের দিন সামগত হইল। আদালত লোকারণ্য। ফরিয়াদী, আসামী, সাক্ষী, উকীল সকলেই উপস্থিত। প্রথমেই গুমী মকদ্দমা। উভয়-পক্ষেই এক একজন বারিষ্টার। পু...বাবুর উকীল উপস্থিত

অবস্থা এবং কোন্ কোন্ কথার জেরা করিতে হইবে, বারিষ্টারকে তাহা সমঝাইয়া দিয়াছিলেন। দস্তরমত কার্য্য হইবার পর জেরা আরম্ভ হইল।

ফরিয়াদীর প্রতি আসামীর পক্ষে বারিষ্টারের জেরা।

প্রশ্ন।—তোমার নাম কি?

উত্তর।—ভৃগুরাম নাগ।

প্রশ্ন।—পুলিশের কাগজপত্রে—আদালতের কাগজপত্রে লেখা আছে, ভৃগুরাম সাঁফুই, তাহার অর্থ কি?

উত্তর।—আমার উপাধি নাগ; আমার কার্য্য বুঝাইবার জন্য লোকে আমাকে সাঁফুই বলে।

প্রশ্ন।—কি তোমার কার্য্য?

উত্তর।—পুকুরকাটা এবং জমীতে ভেড়ীবন্দীর চৌকাকাটা কোড়ারা আমার অধীনে থাকে, আমি তাহাদের ...র্দার, কোড়াদলের সর্দ্দারকে সাঁফুই বলে।

প্রশ্ন।—আচ্ছা, বাবু পু...র বাবুলী তোমার স্ত্রী প্রসন্নমুখী নাগকে নিজ বাড়ীতে গুম্ করিয়া রাখিয়া খুন করিয়াছেন, তাহা তুমি ঠিক জান?

উত্তর।—নিশ্চিত খুনের এজাহার আমি দেই নাই, গুম করিয়া রাখা আমি শুনিয়াছি, স্ত্রীকে না পাওয়াতে অনুমান হয়, খুন।

প্রশ্ন।—গুম্ করার খবর কাহার মুখে শুনিয়াছ?

উত্তর।—আনন্দ সর্দ্দার ও ভরত মণ্ডল।

প্রশ্ন।—কোন্ তারিখে তোমার স্ত্রীকে পুরন্দরবাবুর লোকেরা তোমার বাড়ী হইতে ধরিয়া আনিয়াছে, তাহা তুমি স্মরণ করিয়া বলিতে পার?

উত্তর।—সে দিন আমি বাড়ীতে ছিলাম না, বাড়ী হইতে তিন ক্রোশ দূরে পুকুর কাটাইতে গিয়াছিলাম, রাত্রিকালে বাড়ীতে গিয়া শুনিলাম, আমার স্ত্রী বাড়ীতে নাই, সে দিন ১১ই শ্রাবণ।

প্রশ্ন।—তোমার বাড়ীর লোকেরা পুরন্দরবাবুর লোকদিগকে দেখিতে পাইয়াছিল?

উত্তর।—দেখিয়াছিল, কিন্তু চিনিতে পারে নাই।

...খতে পা...—তোমার স্ত্রীকে তাহারা ধরিয়া লইয়া আসিল, তোমার বাড়ীর

...নে?

BLOCKED INFORMATION.

উত্তর।—বাড়ীর নিকটে জনকতক পাইক দেড়াইয়া ছিল, বাড়ীর লোকেরা তাহাই দেখিয়াছে, আমার স্ত্রীকে ধরিয়া আনিতে দেখে নাই।

প্রশ্ন।—কি কারণে পুরন্দরবাবুর পাইকেরা তোমার বাড়ীর ধারে গিয়াছিল, তাহা তুমি বলিতে পার?

উত্তর।—আমি পুরন্দরবাবুর প্রজা, এক-শ বিঘা জমী রাখি, দুই বৎসরের খাজনা দিতে পারি নাই, তাগাদা করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে দুই এক জন পাইক যায়, তাহা জানি, কিন্তু সেদিন অনেক পাইক কি করিতে গিয়াছিল, তাহা জানি না, আমি বাড়ীতে ছিলাম না।

প্রশ্ন।—আনন্দ সর্দ্দার ও ভরত মণ্ডল তোমার বাড়ীতে গিয়া তোমাকে ঐ সংবাদ দিয়াছিল কিম্বা আর কোথাও তাহাদের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহা তোমার স্মরণ আছে?

উত্তর।—তাহারা আমার বাড়ীতে যায় নাই, আমাদের গ্রামের নিকটস্থ শীতলপুর গ্রামে ঠাকুরদাস মাইতির বাড়ী, সেই বাড়ীতে আমাদের একটা নিমন্ত্রণ ছিল, আমি সেই নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম, সেইখানে উহাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, উহারা আমাকে গোপনে ডাকিয়া ঐ কথা বলে।

প্রশ্ন।—গোপনে ডাকিয়া বলিয়াছিল, আর কেহ তাহা শুনিতে পায় নাই?

উত্তর।—যখন তাহারা আমাকে ডাকিয়া লইয়া যায়, তখন আর কেহ আমাদের সঙ্গে যায় নাই, যখন তাহারা বলে, তখন তিনজন লোক সেইখানে উপস্থিত হইয়াছিল।

প্রশ্ন।—তাহাদের নাম কি?

উত্তর।—যে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ, সেই বাড়ীর কর্ত্তা ঠাকুরদাস মাইতি, প্রতিবাসী জহর পানাদার ও তিনকড়ি নাইয়া।

ভৃগুরামকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করা বারিষ্টার তখন আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না, ভৃগুরাম বিদায় পাইল, প্রথম সাক্ষীর তলব। প্রথম সাক্ষী আনন্দ সর্দ্দার। বারিষ্টার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—

প্রশ্ন।—তোমার নাম কি?

উত্তর।—আনন্দিরাম সর্দ্দার।

প্রশ্ন। তুমি কি কার্য্য কর?

উত্তর।—পুরন্দরবাবুর বাড়ীর রাখাল।

প্রশ্ন।—এই মকদ্দমার ফরিয়াদী ভৃগুরাম নাগের স্ত্রী প্রসন্নমুখী নাগকে পুরন্দরবাবু আপন বাড়ীতে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা তুমি জান?

উত্তর।—জানি।

প্রশ্ন।—কিরূপে জানিয়াছিলে?

উত্তর।—পুরন্দরবাবুর গোয়ালবাড়ীতে আমরা থাকি, একদিন সন্ধ্যাকালে আমি আর ভরত মণ্ডল গরুর জাব দিবার জন্য বিচালী আনিতে যাই। যে ঘরে বিচালী থাকে, সে ঘরে কোন মানুষ থাকে না, ঘরে সর্ব্বদা চাবী দেওয়া থাকে; চাবী খুলিয়া আমরা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, ঘরের এক কোণে একজন মেয়েমানুষ।

প্রশ্ন।—সন্ধ্যাকালে অন্ধকারে কেমন করিয়া দেখিয়াছিলে?

উত্তর।—আমার হস্তে একটা হাতলণ্ঠন ছিল।

প্রশ্ন।—লণ্ঠনের আলোতে দেখিতে পাইলে একজন মেয়েমানুষ; সেই মেয়েমানুষ যে ভৃগুরাম নাগের স্ত্রী প্রসন্নমুখী, তাহা তোমরা কিরূপে চিনিলে?

উত্তর।—যে গ্রামে ভৃগুরামের বাস, আমরাও সেই গ্রামের লোক, ভৃগুরামের বাড়ীর সকল স্ত্রীলোককেই আমরা চিনি।

প্রশ্ন।—যখন দেখিলে, তখন সেই স্ত্রীলোককে তোমরা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?

উত্তর।—আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তুমি এখানে কেন? প্রসন্নমুখী উত্তর দিয়াছিল, বাবুর লোকেরা আমায় ধরিয়া আনিয়া এইখানে আটক রাখিয়াছে।

প্রশ্ন।—কোন্ মাসের কোন্ দিন সন্ধ্যাকালে তোমরা প্রসন্নমুখীকে সেই ঘরে দেখিয়াছিলে, তাহা তোমার স্মরণ আছে?

উত্তর।—তারিখ স্মরণ হয় না, বর্ষাকাল, শ্রাবণমাস, সে কথা আমার মনে আছে।

প্রশ্ন।—সেই স্ত্রীলোক কত দিন সেই ঘরে কয়েদ ছিল, তাহা তুমি জান?

উত্তর।—সন্ধ্যাকালে আমরা দেখিয়াছিলাম, ভোরে উঠিয়া আর তাহাকে দেখিতে পাই নাই।

BLOCKED INFORMATION.

প্রশ্ন।—বিচালী লইয়া তোমরা আবার সেই ঘরে চাবী বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলে?

উত্তর।—না;—ভুল হইয়াছিল।

প্রশ্ন।—পুরন্দরবাবু প্রসন্নমুখীকে খুন করিয়াছেন, তাহা তোমরা শুনিয়াছ?

উত্তর।—না।

প্রশ্ন।—প্রসন্নমুখী কোথায় গিয়াছে, তাহা তুমি জানিতে পারিয়াছ?

উত্তর।—না। সে রাত্রে প্রসন্নমুখী কতক্ষণ সে ঘরে ছিল, কখন্ বাহির হইয়া গিয়াছিল, কেহ তাহাকে লইয়া গিয়াছিল কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না। যে ঘরে বিচালী থাকে, সে ঘরের অনেক তফাতে অন্যঘরে আমরা শয়ন করি।

প্রশ্ন।—বাবুর গোয়ালবাড়ীতে তোমরা ক-জন থাক?

উত্তর।—বারো জন।

প্রশ্ন।—কেবল তোমরা দুই জনেই প্রসন্নমুখীকে দেখিয়াছিলে, আর দশজন দেখে নাই, তাহারা কোথায় ছিল?

উত্তর।—তাহারা অন্য ঘরে ছিল, তাহারা বিচালীর ঘরে যায় না। আমি আর ভরত মণ্ডল এই দুইজনে গরু-সেবা করি, বাকী লোকেরা চাষের কাজ করে। আমরা দুজনেই বিচালী আনিতে গিয়াছিলাম।

প্রশ্ন।—বিচালীর ঘরে তোমরা মেয়েমানুষ দেখিয়াছিলে, যাহারা চাষের কাজ করে, তাহাদের কাছে সে কথা বল নাই? বাড়ীর আর কাহাকেও কিছু বল নাই?

উত্তর।—না, ভয় হইয়াছিল।

প্রশ্ন।—শীতলপুর গ্রামে ঠাকুরদাস মাইতির বাড়ীতে ভৃগুরামের সহিত তোমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, ভৃগুরামকে তোমরা ঐ কথা বলিয়াছিলে, সেখানে আর কে কে ছিল?

উত্তর।—ঠাকুরদাস মাইতি, জহর খানাদার, তিনকড়ি নাইয়া।

প্রশ্ন।—গোপনে বল নাই?

উত্তর।—গোপনে বলিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু বলিবার সময় ঐ তিন জন সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল।

আনন্দ সর্দ্দার বিদায় পাইল। ভরত মণ্ডলের ডাক হইল। ভরত মণ্ডলের সকল কথাই আনন্দ সর্দ্দারের কথার ন্যায়, কেবল একটী কথার গরমিল হইল। ভরত মণ্ডল বলিল, শ্রাবণমাসের শেষে কি ভাদ্রমাসের প্রথমে তাহারা প্রসন্নমুখীকে সেখানে দেখিয়াছিল।

যাহারা লোকের মুখে শুনিয়া কোন মকদ্দমায় সাক্ষ্য দান করে, তাহাদের সাক্ষ্যবাক্য আদালতে গ্রাহ্য হয় না, ইহাই ইংরাজী আইনের মর্ম্ম; তথাপি আসামীর বারিষ্টার সেই প্রকারের তিন জন সাক্ষীর উপর জেরা করিতে চাহিলেন। সেদিন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, এজলাস ভঙ্গ হইল, কার্য্য বাকী থাকিল। পরদিন বাকী তিন জন সাক্ষীর উপর জেরা করা হইবে, স্থির হইয়া রহিল। বারিষ্টারেরা একদিনের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন, মক্কেলেরা দ্বিতীয় দিবসের ফী অতিরিক্ত প্রদান করিবেন অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় হইতে দিলেন না।

আদালত বন্ধ হইবার পর পুরন্দরবাবু আপন পক্ষের বারিষ্টারের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া আবশ্যকমত সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া আপন আলয়ে প্রতিগমন করিলেন।

রাত্রি এক প্রহর। দর্পনারায়ণবাবুর বাড়ীতে আট দশ জন লোক একত্র হইয়াছেন। বৈঠকখানায় মজ্‌লীস। দর্পনারায়ণবাবুর বদন প্রফুল্ল, কথায় কথায় মহোৎসাহ প্রকাশ। একজন বলিলেন, "বাবুর সঙ্গে কাহার তুলনা? এত বড় একটা কাণ্ড বাধাইয়াছেন, কেহই কিছু জানিতে পারে নাই। ভৃগুরাম তো ভৃগুরাম, কোথাকার ভৃগুরাম, বাবু যেন কিছুই জানেন না, ঠিক সেই ভাবে সমস্ত যোগাড়যন্ত্র হইতেছে।" আর একজন বলিলেন, "জানিতে পারিলে তবে আর বাহাদুরী কি? বাবুর বুদ্ধির কাছে কি হাবুলী বাবুলীর বুদ্ধি খাটে? এইবার বাবুলীর পো অক্কা পাবেন। সাফ্ সাফ্ প্রমাণ। দেশের পুলিশ যাঁহার পক্ষে সহায়, নিশ্চয়ই তাঁহার জয়লাভ।" কাণে কলম গুঁজিয়া একজন বৃদ্ধ লোক একটু তফাতে বসিয়া অল্প উচ্চস্বরে বলিল, "বাবুলী পক্ষের কোন কোন লোক একটা তর্ক তুলিয়াছে। এই মকদ্দমার ভিতর আমাদের বাবু আছেন, এই কথাটা তাহারা প্রমাণ করাইবার চেষ্টা পাইবে।"

একটু হাস্ত করিয়া বাবু বলিলেন, "কায়স্থেরা চিত্রগুপ্তের জাতি। কায়স্থের বুদ্ধি কেবল মারপ্যাঁচের দিকেই বেশী খেলে। কি বুদ্ধি তুমি বাহির করিয়াছ, কিরূপ তর্ক তাহারা তুলিয়াছে, কিসে আমাকে ফাঁসাইবে? বালী সুগ্রীবে যখন যুদ্ধ হয়, রামচন্দ্র পশ্চাতে লুকাইয়া আছেন, বানররাজ বালী কি তাহা জানিতে পারিয়াছিল?"

যে লোকটীর কাণে কলম গোঁজা, সে লোকটী ঐ বাড়ীর পুরাতন সরকার। বাবু যখন ছোট, তখন অবধি তিনি ঐ বাড়ীতে কাজ করিতেছেন। বাবু একজনের পোষ্যপুত্র। সরকার তাঁহাকে ছোটবেলা হইতে আদর করিয়া থাকেন। রামায়ণের দৃষ্টান্ত শ্রবণ করিয়া বাবুকে তিনি বলিলেন, "সে কথা বটে, সে কথা বটে। আপনি আমাদের দ্বিতীয় রামচন্দ্র, সকলেই সে কথা বলেন, কিন্তু তাহারা যে তর্ক তুলিয়াছে, তাহা নিতান্ত অগ্রাহ্য কথা নয়। তাহারা পরামর্শ করিতেছে, এই মকদ্দমার সঙ্গে আপনাকে জড়াইবে।"

একটু বিরক্ত হইয়া বাবু বলিলেন, "কিসে? কিসের মধ্যে আমি আছি? শিলাপুরের ভৃগুরাম নাগ পুরন্দর বাবুদীর প্রজা; শিলাপুর আমি কখনও দেখি নাই, ভৃগুরামকেও কখন চিনি না। ভৃগুরামের মকদ্দমার সঙ্গে আমার যোগাযোগ, কিসে তাহারা এ কথা প্রমাণ করাইবে? আমি যদি—"

এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময় বাড়ীর একজন চাকর আসিয়া একধারে দাঁড়াইয়া করযোড়ে বলিল, "হুজুর, তিন দিন আমার খোরাকী নাই। দুই বৎসরের মাহিনা বাকী, সাতদিন অন্তর কিছু কিছু খোরাকী পাই, এইবার দশ দিন হইয়া গেল। আমি খাই কি?"

মনে মনে বিরক্ত হইলেও বাহিরে ঈষৎ হাস্ত করিয়া, সরকারের মুখের দিকে চাহিয়া উৎসাহের স্বরে বাবু বলিলেন, "দাও হে, উহাকে দুই আনা পয়সা দাও। সংসারী ত, কাজ করিবে আমার, খাইতে যাইবে কোথায়? ধর্ম্মের দিকে চাহিতে হয়, ধর্ম্মে আমার বড় ভয়, লোকের কষ্টে আমার বড় দুঃখ হয়। ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া আশ্রিত লোকের উপকার করা আমার নিত্য ধর্ম্ম; দাও, দাও—আনা দাও। সব যদি দিতে না পার, তহবিলে যদি বেশী না থাকে, দুই-চারি পয়সা যদি কম হয়, তাই দাও। না দিলে বেচারা খায় কি?—হাঁ, কি বলিতেছিলাম,—হাঁ,—কিসে আমাকে জড়াইবে? আমি যদি ভৃগুরামের পক্ষ হইয়া দাঁড়াইতাম

তাহা হইলে আজ কি আর ও মকদ্দমা মুলতুবী থাকিতে পায়? প্রমাণের আর বাকী কি? সাতটী বৎসর! সাতটী বৎসর!"

সরকার বলিলেন, "তাহা হইতে পারে, কিন্তু তাহারা বলিতেছে, ভৃগুরাম একজন সামান্ত লোক, বিঘাকতক ঠিকা জমী চাষ করে, কোড়াদারী করিয়া দিন গুজরাণ করে, কলিকাতা সহর হইতে বারিষ্টার আনিল কিসের জোরে? কাহার জোরে?"

হাস্ত করিয়া বাবু বলিলেন, "ওঃ! ঐ কথা! দুরন্ত লোককে জব্দ করিতে হইলে লোকে ভিটামাটী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াও মকদ্দমা করিতে পারে। যেমন তেমন মকদ্দমা নয়, গুম্ করা। এ মকদ্দমায় একটা বারিষ্টার কেন, দশটা বারিষ্টার আনিতেও লোকে কাতর হয় না। ও কথা ছাড়িয়া দাও। কল্য এতক্ষণে তোমরা সকলেই শুনিতে পাইবে, পুরন্দরের দফা রফা। এখানকার সকল লোকেই জানে, আমার একজন প্রজা আমার শত্রু হইয়াছিল, এক রাত্রের মধ্যে আমি তাহার ভিটা-মাটী চাটি করিয়া কচুগাছ বসাইয়াছিলাম।"

বাবুকে বেষ্টন করিয়া যাঁহারা বসিয়া ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ধন্য ধন্য করিয়া বাবুর জয়গান করিতে লাগিলেন, কত শত মকদ্দমার নজীরের কথা তুলিয়া বাবুকে স্তবকে স্তবকে ফুলাইয়া দিলেন। অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিয়া বাবু তখন ভুঁড়ী নাচাইয়া হাস্ত করিতে লাগিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের পর মজ্‌লীস ভঙ্গ হইল।

গৃহিণী তখনও জাগিয়া ছিলেন। দর্পনারায়ণ অন্দরে প্রবেশ করিলে গৃহিণী কহিলেন, "এক গাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে আর গাঁয়ের লোকের মাথাব্যথা।—বাবুনীদের মকদ্দমা, তুমি এত রাত্রি পর্য্যন্ত সেই কথা নিয়ে কিসের ঘোঁট্ কোচ্ছিলে?"

দর্পনারায়ণ কহিলেন, "পরম শত্রু! পরম শত্রু! শত্রুনিপাত হওয়াই মঙ্গল। কল্য পুরন্দরকে জেলখানায় পাঠাইয়া আমি সত্যনারায়ণের সিন্নী চড়াইব। ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারিল, ইহা অপেক্ষা মঙ্গল আর কি আছে?"

পুরন্দর বাবুনীকে দর্পনারায়ণের স্ত্রী শত্রু বলিয়া জানিতেন না। স্বামীর শেষ-কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "ষাঁড়ও জানি, বাঘও জানি। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে জেলে পাঠাইয়া তোমার যে কি মঙ্গল হইবে, তাহা আমি জানি না।"

স্ত্রী-পুরুষে তৎসম্বন্ধে আরও অনেক কথা হইয়াছিল, সে সকল কথার সহিত আমাদের কোন সংস্রব নাই। আহ্লাদে দর্পনারায়ণের নিদ্রা হয় নাই, সমস্ত রাত্রি

জাগিয়া জাগিয়া তিনি পরদিনের নূতন নূতন যোগাড়যন্ত্র কল্পনা করিয়াছিলেন। শর্ব্বরী রজনী পরদিন প্রভাতে কি প্রসব করিবে, মানুষেরা তাহা জানিতে পারিল না। রজনী অবসান হইয়া গেল।

মঙ্গলবার। বেলা দশটার সময় আদালত বসিল, পূর্ব্বদিনের ন্যায় আদালত লোকারণ্য হইল, ওমী মকদ্দমা উঠিল। যে তিনজন সাক্ষীর জেরা বাকী ছিল, আসামীর বারিষ্টার সেই তিনজনকে সামান্য সামান্য গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। ফরিয়াদীর এজাহারের সহিত সাক্ষীগণের বাক্যের যেখানে যেখানে অনৈক্য, সেই সকল স্থলের উল্লেখ করিয়া বারিষ্টার মহাশয় জজসাহেবকে বুঝাইয়া বলিতেছিলেন, বেলা প্রায় একটা বাজিয়াছিল, এমন সময় আদালতের বাহিরে একটা গোলমাল উঠিল। কিসের গোলমাল, জজসাহেব তাহা জানিবার জন্য একজন চাপরাসীকে হুকুম দিতেছিলেন, ইত্যবসরে একজন উকীলের সঙ্গে একটী অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক এজলাসের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

কে এই স্ত্রীলোক?—প্রসন্নমুখী নাগ। যে উকীল তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, জজ সাহেবকে তিনি বলিলেন, "যে স্ত্রীলোককে গুম করা হইয়াছে বলিয়া এই মকদ্দমা হইতেছে, এই সেই স্ত্রীলোক।"

আদালতস্থ সমস্ত লোক বিস্ময়াপন্ন। একপক্ষের বদন বিবর্ণ, অন্যপক্ষ প্রফুল্ল। জজসাহেবের আদেশে আসামীপক্ষের প্রধান উকীল সেই স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? পুরন্দরবাবু তোমাকে গুম করিয়াছিলেন, একরাত্রি তাঁহার গোয়ালবাড়ীতে আটক থাকিয়া তাহার পর তুমি কোথায় গিয়াছিলে?"

হাকিমের সম্মুখে লজ্জা করিয়া ঘোম্‌টা দিয়া থাকিলে চলিবে না, হাকিমের আদেশে অগত্যা প্রসন্নমুখীকে ঘোম্‌টা খুলিতে হইল। হাকিম তখন ভৃগুরামকে ডাকাইয়া, প্রসন্নমুখীকে দেখাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ-দেখি, এই স্ত্রীলোক তোমার স্ত্রী কি না?" একটু কম্পিত হইয়া ভৃগুরাম উত্তর করিল, "ধর্ম্মাবতার, এই আমার স্ত্রী, ইহারই নাম প্রসন্নমুখী।"

দস্তুরমত হলপ পাঠ করিয়া উকীলের প্রশ্নে প্রসন্নমুখী বলিল, "পুরন্দরবাবু আমাদের জমীদার, তাঁহার গোয়ালবাড়ীতে আমি যাই নাই, তাঁহার লোকেরা

আমায় ধরিয়া আনে নাই। আমি একদিন আমাদের খিড়্‌কীর ঘাটে বাসন মাজিতেছিলাম, নিকটে কেহ ছিল না, হঠাৎ জনকতক লোক আমার মুখে কাপড় বাঁধিয়া একখানা পাল্‌কীতে তুলিয়া লইয়া আইসে, একটা বাড়ীতে আনিয়া রাখে। কাহার বাড়ী, আগে আমি তাহা জানিতে পারি নাই, শেষে জানিয়াছিলাম, দর্পনারায়ণবাবুর একজন গোমস্তা রামকুমার ভট্টাচার্য্য, তাঁহারই সেই বাড়ী। রামকুমারকে আমি দেখি নাই, তাঁহার এক ভাই বীরভদ্র ভট্টাচার্য্য, তিনিই আমাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, বাহির হইতে দিতেন না, স্নানাদি নিত্যকর্ম্মের জন্য যখন বাহির হইতাম, বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা তখন পাহারা থাকিতেন, ঘোমটা দিয়া থাকিতাম, বাহিরের কোন লোক আমার মুখ দেখিতে পাইত না। বীরভদ্রের স্ত্রী নিত্য নিত্য আমাকে বলিতেন, দর্পনারায়ণবাবু বড়লোক, তিনি আমার জন্য ভিন্নস্থানে স্বতন্ত্র বাড়ী করিয়া দিবেন, অনেক টাকার গহনা দিবেন, খুব সুখে রাখিবেন, আমার কোন কষ্ট থাকিবে না। কথাগুলা শুনিয়া আমি চুপ করিয়া থাকিতাম, তাহার পর শুনিলাম, আমার জন্য মকদ্দমা হইতেছে, পুরন্দরবাবু আমার জন্য বিপদে পড়িয়াছেন, যাহারা আমার কাছে মকদ্দমার গল্প করিত, গত কল্য তাহাদের একজনের মুখে শুনিলাম, আমার জন্য পুরন্দরবাবু দায়মালে যাইবেন, আজ নাকি সেই বিচারের শেষদিন। আমার জন্য আজ একজন বৃদ্ধব্রাহ্মণ বিনা দোষে দায়মালে যান, বড়ই পাপের কার্য্য, ইহা ভাবিয়া বাড়ীর লোকেরা কেহ জাগিবার অগ্রে ভোরবেলা চুপি চুপি খিড়্‌কীর দরজা খুলিয়া আমি পলাইয়া আসিয়াছি। যে বাড়ীতে ছিলাম, এই শিউড়ীর নিকটেই সেই বাড়ী, গ্রামের নাম আমি জানি না। প্রায় চারিমাস সেই বাড়ীতে আমি ছিলাম।"

উকীলের প্রশ্নে ও জেরা-প্রশ্নে থামিয়া থামিয়া প্রসন্নমুখী একে একে ঐ কথাগুলি বলিল। সমস্ত লোক চমৎকৃত।

বাবু পুরন্দর বাবুলী বে-কসুর খালাস পাইলেন। মকদ্দমার শ্রী ফিরিয়া দাঁড়াইল। ফরিয়াদী ও ফরিয়াদীর সাক্ষীগণ ফৌজদারীতে অর্পিত হইল। দর্পনারায়ণ এবং বীরভদ্র এই নূতন ফৌজদারী মকদ্দমার সহিত জড়িত হইবেন কি না, মকদ্দমার অবস্থা বুঝিয়া তাহা স্থির করা হইবে।

যাহারা ভিতরের খবর জানিত, তাহারা গোপনে বলাবলি করিতে লাগিল,

এক প্রাণ [illegible] হইবে [illegible] দর্পনারায়ণের [illegible] জোরেই এ মিথ্যা মকদ্দমা [illegible]ছিল। আগাগোড়া মিথ্যা। [illegible] টাকা পাইয়াছিল, সাক্ষীরা টাকা পাইয়াছিল, উকীলেরা টাকা পাইয়াছিলেন, ব্যারিষ্টার টাকা পাইয়াছিলেন, সমস্তই দর্পনারায়ণের টাকা। পুলিশের লোকেরা কিছু কিছু সেলামী পাইয়াছিল কি না, তাহা প্রকাশ পায় নাই। পুরন্দরবাবুর বাড়ীর রাখাল আনন্দ সর্দ্দার ও ভরত মণ্ডল উভয়েই দর্পনারায়ণের টাকা খাইয়া চাকরী ছাড়িয়াছিল, তাহাও প্রকাশ পাইল।

বাবু পুরন্দর বাকুলী প্রায় খুনদায়ে পড়িতেছিলেন, প্রসন্নমুখী তাঁহাকে রক্ষা করিল। মকদ্দমায় সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করিয়া পুরন্দরবাবু প্রসন্নমুখীকে কিছুদিন আপন বাড়ীতে আনিয়া স্থান দিলেন, সহস্রমুদ্রা পুরস্কার দিলেন, আপন কন্যার ন্যায় যত্নে রাখিলেন। প্রসন্নমুখীকে দেখিলেই তিনি মনে করিতেন, এই প্রসন্নমুখী প্রকৃতই অমৃতমুখী। নাগের পত্নী নাগিনী হয়, ভৃগুরাম নাগের পত্নী প্রসন্নমুখী নাগিনী। নাগিনীদের মুখে হলাহল থাকে, এই নাগিনীর মুখে অমৃত বর্ষে। কিছুদিন আপন বাড়ীতে যত্নে রাখিয়া প্রসন্নমুখীকে তিনি তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। প্রসন্নমুখী স্বামীগৃহে যাইতে স্বীকৃত হইল না।

ওদিকে ফৌজদারী আদালতে নূতন মকদ্দমা;— মূল মকদ্দমার পাল্টা মকদ্দমা। একে একে সকল কথাই প্রকাশ হইয়া পড়িল, গোড়া পর্য্যন্ত টান পড়িল। বাবু দর্পনারায়ণ গাঙ্গুলী আর বীরভদ্র ভট্টাচার্য্য আসামী-শ্রেণীভুক্ত হইলেন। পাছে আবার রামকুমার ভট্টাচার্য্যকে তলব হয়, সেই ভয়ে রামকুমার দেশ ছাড়িয়া পলাইল। পুরন্দরবাবুকে জেলে অথবা দায়মালে পাঠাইয়া দর্পনারায়ণ সত্যনারায়ণের সিন্নী দিবেন স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, সত্যনারায়ণ তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া তাঁহার সিন্নী গ্রহণ করিলেন না। ধর্ম্মের কর্ম্ম ধর্ম্মই সম্পাদন করেন, ধর্ম্মের ঢাক আপনিই বাজিয়া উঠে। প্রসন্নমুখীকে কেহ আদালতে হাজির করে নাই, ধর্ম্মের উপদেশে প্রসন্নমুখী নিজেই হাজির হইয়াছিল।

দায়রার মকদ্দমার প্রথমদিন রজনীযোগে দর্পনারায়ণবাবু আপন বাড়ীতে মজ্‌লীস করিয়া দশজনের নিকটে আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহারা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছিল, উপকার পাইত বলিয়া তাহারা তাঁহার খোসামোদ করিত; অন্তরে অন্তরে তাহারা কেহই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। সেই

সকল লোকের মধ্যেই একজন দর্পনারায়ণের ষড়্‌যন্ত্রের বিষয় এক বেনামী চিঠিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল; সেই লোকের মুখেই সকলে শুনিল, এইবার দর্পনারায়ণের দর্প চূর্ণ।

ইংরাজী আদালতে সুবিচার হয়, ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। সুবিচার হয় বলিয়াই যে একেবারে অবিচার হয় না, এমন প্রমাণ কিছুই জানা নাই। সাক্ষীর মুখে মকদ্দমা; টাকার জোরে সাক্ষী সাজাইতে পারিলে অনেক মিথ্যা মকদ্দমায় নির্দ্দোষ লোকের দণ্ড হয়, টাকার জোরে সত্য মকদ্দমায় অনেক বড় বড় অপরাধী খালাস পাইয়া যায়। মিথ্যা মকদ্দমার সংখ্যা যে নিতান্ত অল্প, তাহাও বলা যায় না; সমস্ত মিথ্যা মকদ্দমায় মিথ্যা ধরা পড়ে, এ কথাও ঠিক নহে। হাকিমেরা মিথ্যা বুঝিলেও সাক্ষীগণের দক্ষতার নিকটে তাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস ব্যর্থ হইয়া থাকে। মিথ্যা মকদ্দমায় নির্দ্দোষ আসামীর দণ্ড হয়, তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হাওড়ার ঈশ্বর নাপিতের কন্যা-হত্যার মকদ্দমা। পুলিশের চক্রে ঈশ্বর নাপিতের ফাঁসীর হুকুম হইয়াছিল। ঈশ্বর নাপিত আপন কন্যাকে খুন করিয়াছে, পুলিশের যোগাড়ে এইরূপ মকদ্দমা উপস্থিত হয়, বেশ প্রমাণও হয়। যে দিন ফাঁসী হইবার কথা, তাহার পূর্ব্বদিন সেই কন্যা দূরদেশ হইতে আসিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সমস্ত সত্যকথা ব্যক্ত করে। তাহাতেই তাহার পিতার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। পুলিশের লোকেরা সাজা পাইয়াছিল।

আমাদের বিষয়-সংসার কতপ্রকারে বিকৃত হইতেছে, তাহা গণনা করা অনেক সময়-সাপেক্ষ। প্রকৃতিপুঞ্জের স্বত্বশান্তি-রক্ষার উদ্দেশে আদালত-সংস্থাপন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে রাজদ্বারে আবেদন করিতে হইলে কাহারও কোন প্রকার অর্থ-ব্যয় হইত না, এখনকার নিয়মে মকদ্দমা করিতে পদে পদে অর্থ-ব্যয়। একজন বিষয়ীলোক একবার বলিয়াছিলেন, "ইংরাজের রাজ্যে সমস্তই সুখ, সমস্তই সুবিচার, কিন্তু রিক্তহস্তে বিচার পাওয়া যায় না, বিচার কিনিয়া লইতে হয়।" এ কথার অর্থ সকলেই বুঝিবেন। অর্থ ব্যতিরেকে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবার উপায় নাই, দুঃখ জানাইবার উপায় নাই। মকদ্দমা করা কেবল টাকার খেলা। রাজপ্রণীত ব্যবস্থানুসারে রাজার যাহা প্রাপ্য, তাহা ছাড়া আরও অনেক প্রকার উপসর্গ। আদালতে যাহারা চাকরী করে, কি আমলা, কি মিস্ত্রী, কি পোদ্দার, কি দপ্তরী, কি চাপরাসী, কি আরদালী, কি শিক্ষানবীশ,

আসামী ফরিয়াদী দেখিলে সকলেই অগ্রে দক্ষিণহস্ত বিস্তার করিয়া থাকে, সকলেই কিছু কিছু পূজা চায় ; পূজা না দিলে সহজে ... পাওয়া যায় না। এই কারণে বে-আইনী হইলেও সকলেই তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা দিতে বাধ্য। এ দেশের লোক এই আমলে অতিশয় মকদ্দমাপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। কাজে কাজে দিন দিন আদালতের সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে, স্থানে স্থানে নূতন নূতন মহকুমা বসিতেছে, মকদ্দমা বাড়িতেছে। মকদ্দমা করা একটা কৌতুক। নিকটে মহকুমা পাইলে গ্রাম্যলোকেরা ঘন ঘন মকদ্দমা উপস্থিত করে। কে জানে সত্য, কে জানে মিথ্যা, মকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিলেই বীরত্ব প্রকাশ পায়, ইহাই অনেক লোকের ধারণা হইয়াছে। প্রতিবাসী লোকের সহিত সামান্য কলহ হইলেও, কেহ কাহাকে একটা চপেটাঘাত করিলেও কিম্বা না করিলেও পাছে আটা লাগাইয়া অঙ্গে ঘা করিয়া কিম্বা জলন্ত অঙ্গারে আপন অঙ্গ দগ্ধ করিয়া কেহ কেহ আদালতে গিয়া দাঁড়ায়। মহকুমার মোক্তারেরাও বিলক্ষণ ধড়ীবাজ, দরখাস্তের বয়ান তাহাদের কণ্ঠস্থ, ইচ্ছামত দক্ষিণা লইয়া এক এক খণ্ড মূল্যবান্ কাগজে থর্ থর্ করিয়া লিখিয়া দেয়, "ধর্ম্মাবতার প্রবলপ্রতাপেষু অধীনের নিবেদন এই যে, অমুক অমুক আসামীগণ কিল, চড়, লাথি ইত্যাদি দ্বারা আমাকে মারপিট করিয়া জখম করিয়াছে, নীচের লিখিত সাক্ষীগণ আগুয়ান হইয়া আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছে, অতএব দরখাস্ত করিয়া প্রার্থিত যে, আসামী সাক্ষী তলব করিয়া বিচার আজ্ঞা হয়, হুজুর মালিক নিবেদন ইতি।"

ঐরূপ দরখাস্ত এত অধিক হয় যে, একজন বিচারক একদিনে সকল দরখাস্ত শুনিয়া উঠিতে পারেন না। মফস্বলের চাষা লোকেরা পূর্ব্বে আদালত জানিত না, সাহেব দেখিলে, পেয়াদা দেখিলে ভয় পাইত, এখন তাহারাও ঘোরতর আইনবাজ হইয়া উঠিয়াছে ; কথায় কথায় মকদ্দমা রুজু করে। দেওয়ানী ফৌজদারী দুই দিকেই গুলজার। আইনকর্ত্তারা নিত্য নিত্য নূতন নূতন আইন করিয়া মকদ্দমার সংখ্যাবৃদ্ধি করিবার সুযোগ করিয়া দিতেছেন। জমীদারেরা খাজনার জন্য প্রজার বাড়ীতে পাইক-পেয়াদা পাঠাইতে পারিবেন না, খাজনা বাকী পড়িলে আদালতে নালিশ করিয়া আদায় করিতে হইবে। এই আইনের গুণে মুনসেফ ও ডেপুটী কালেক্টরদিগের কাছারীতে কত মকদ্দমা বাড়িয়াছে, যাঁহারা ...

রিপোর্ট পাঠ করেন, তাঁহারাই তাহা জানেন। মকদ্দমার আয়ে আদালত চলে, চলিয়াও সরকারের লাভ হয়, এদিকে কিন্তু মামলাবাজ লোকেরা নিঃসম্বল হইয়া পড়িতেছে ; অনেক লোকের ঘরে অন্ন নাই, অথচ মকদ্দমা করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যায়। মকদ্দমাতে যে কত খরচ, যাহারা মকদ্দমা করে, তাহারাই তাহা বুঝিতে পারে। অনেক ধনবান্ লোক ক্রমাগত মকদ্দমা করিয়া দেউলে হইয়া যাইতেছেন। যে সকল মকদ্দমায় উভয়পক্ষে জিদাজিদি থাকে, সে সকল মকদ্দমার খরচ কেহ গণনা করিতে পারেন না। যে দেশের অধিক লোক মামলাবাজ, যে দেশে মকদ্দমার খরচ অপরিমিত, সে দেশের মঙ্গল অবশ্যই সুদূর-পরাহত।

জনপদের শান্তিরক্ষার উদ্দেশে পুলিশের সৃষ্টি। পুলিশের লোকেরা বদ্মাস্-দমনে যতদূর দক্ষ, নির্দ্দোষ ভদ্রলোকগণকে পীড়ন করিতে তদপেক্ষা বহুগুণে নিপুণ। পুলিশ দেখিলে সাহস হওয়াই সম্ভব, কিন্তু পুলিশের ব্যবহার দেখিয়া পুলিশের নামে ভদ্রলোকের ভয় হয় ; ইহা বড় ভয়ঙ্কর কথা। পেশাদার বদ্মাস্ লোকেরা পুলিশকে ভয় করে না, পুলিশকে পয়সাও দেয় না। নিরীহ ভদ্র-লোকেরা মানের ভয়ে পুলিশ-পূজা করেন। মফস্বলের পেন্সন্-প্রাপ্ত দুইজন পুরাতন দারোগা একস্থানে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন, "পেন্সন্ লওয়া আমাদের দুর্দ্দশার কারণ হইয়াছে, চাকরীতে আমাদের বিলক্ষণ প্রভুত্ব ছিল, একজন রাজ-পুত্রকেও 'খাড়া রও' বলিয়া দাঁড় করাইতে পারিতাম। বেতনের টাকা আমরা গ্রাহ্য করিতাম না। উপরিলাভেই আমাদের ঐশ্বর্য্য ছিল ; চোরডাকাত ধরিলে কিম্বা খুনের তদারক করিলে আমাদের বড় একটা আমোদ হইত না। আমোদ হইত অপঘাত-মৃত্যুর তদারকে। সাপে কাটা, জলে ডোবা, গলায় দড়ী, বিষ খাওয়া ইত্যাদি তদারকে গৃহস্থের উপর জুলুম করিতে পারিলে বিলক্ষণ দশটাকা লাভ হয়, সেই লাভে আমরা বড় খুসী থাকিতাম। ধরাবাঁধা পেন্সনের টাকায় আমাদের কিছুই সুখ হয় না।"

পুরাতন দারোগারা যে জন্য আক্ষেপ করেন, যে কথা তুলিয়া আমোদ করেন, এখনকার নূতন দারোগাদের মধ্যে তেমন লোক নাই, গর্ব্ব করিয়া এমন কথা আমরা বলিতে পারিব না। আখেজ প্রযুক্ত কেহ কোন ভদ্রলোকের নামে মিথ্যা অপবাদ রটাইলে পুলিশ সেই ভদ্রলোকের উপর যেরূপ দৌরাত্ম্য করে,

চোরডাকাতের উপর ততদূর করিতে পারে না, করিলে কোন ফল নাই, ইহ তাহারা বুঝিতে পারে। যাঁহারা বেতন দিয়া পুলিশ পোষণ করেন, একটু কিছু সূত্র পাইলে তাঁহাদের উপরেই পুলিশের উপদ্রব বেশী হয়, বিনা সূত্রেও হইয়া থাকে। প্রবল, প্রবল ধূর্ত্তলোকেরা পুলিশের পূজা দিয়া আপনাদের বিরাগভাজন নিরীহ ভদ্রলোকগণকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিতে পারে। পুলিশের নামে আমাদের বিষয় সংসার টল্ টল্ করিয়া কাঁপিতেছে।

বাবু পুরন্দর বাবুলী বৃদ্ধাবস্থায় পুলিশের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়া, গুরু অপরাধে আদালতে অভিযুক্ত হইয়া, ধর্ম্মের কৃপায় মুক্তিলাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মর্ম্মে বড় আঘাত লাগিয়াছ। পাল্‌টা মকদ্দমায় আসামীদের কি হয়, তাহা দেখিবার অপেক্ষা না করিয়া তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। লোকের মুখে তিনি শুনিয়াছিলেন, কলিকাতার বিষয়-সংসার খুব ভাল। সেখানে হিংসা-দ্বেষ, রেষারিষি বেশী নাই, মামলা-মকদ্দমা বেশী নাই। পুলিশের উপদ্রব কম। নগরবাসিদের রোগের যন্ত্রণা অনেক অল্প। বিদ্যার চর্চ্চা অধিক, ধর্ম্মের আলোচনা অধিক, ভদ্রলোক অধিক, সাধুসঙ্গ সুলভ। এই সকল শুভকর সংবাদ শ্রবণ করি কিছুদিন কলিকাতায় বাস করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল, সেই জন্যই তি কলিকাতায় আসিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর বাটীর ও বিষয়কর্ম্মের ভার সমর্পি রহিল।

কলিকাতায় আসিয়া পুরন্দরবাবুকে বাড়ীভাড়া করিতে হইল না, শাঁখারী টোলা অঞ্চলে তাঁহার নিজের একখানি বাড়ী ছিল, সেই বাড়ীতে তিনি বা করিলেন। তিনি একাকী আসেন নাই, তাঁহার যে তিনটী পুত্র অল্পবয়স্ক, স্বদে তাহাদের রীতিমত লেখাপড়া-শিক্ষার ব্যাঘাত হইতেছিল, সেই তিনটীকে তিনি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন; বাড়ীর একজন শয্যাক্রান্তও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে। রন্ধন করিবার নিমিত্ত স্বগ্রামের একটী দরিদ্র বিধবা ব্রাহ্মণকন্যাকে আনয়ন করা হইয়াছে। দূরস্থ পল্লীগ্রামের শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীলোকেরা নূতন কলিকাতায় আসিয়া বাসাবাড়ীর কাজকর্ম্ম করিতে শীঘ্র পটু হইতে পারে না, সেইজন্য তিনি বাড়ীর কোন দাসীকে কলিকাতায় আনেন নাই, কেবল একজন বিশ্বাসী চাকরকে আনিয়াছেন। বাসার কার্য্য করিবার জন্য নিকটস্থ পল্লীর দুইজন দাসীকে নিযুক্ত করা হইল, সুশৃঙ্খলামত কার্য্য চলিতে লাগিল, ছেলে তিনটীকে

তিনি বৌবাজারের বঙ্গ-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন, সমস্ত বন্দোবস্তই ঠিক হইয়া গেল।

একমাস থাকিতে থাকিতে পাড়ার অনেকগুলি ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার আলাপ হইল। তাঁহারা অবসরক্রমে তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া নানাপ্রকার গল্প করেন, সহরের নূতন নূতন ঘটনার সংবাদ দেন, ধর্ম্মকথার আলোচনা হয়, খবরের কাগজ পাঠ হয়, এক একদিন সতরঞ্চখেলাও চলে। পুরন্দরবাবু বৃদ্ধলোক, যাঁহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তাঁহাদের সকলেরই বয়স পঞ্চাশ বৎসরের অধিক। যুবা কিম্বা বালক একজনও আইসে না, বালক তিনটীর শিক্ষার নিমিত্ত বাড়ীতে একজন পণ্ডিত রাখা হইয়াছে, পণ্ডিতের বয়সও পঞ্চাশ বৎসরের কম নহে।

মফস্বলের কোন রাজালোক কিম্বা বাবুলোক নূতন কলিকাতায় আসিলে শীঘ্র শীঘ্র সহরময় প্রচার হইয়া পড়ে। সেই সকল লোকের দানশক্তি অথবা সৎকার্য্যে আসক্তির পরিচয় প্রকাশ পাইলে, নানা শ্রেণীর নানা প্রকার ব্যবসায়ী-লোক প্রায় নিত্য নিত্য নানা অভিপ্রায়ে তাঁহাদের নিকটে সমাগত হন। পুরন্দরবাবুর বাড়ীতেও সেই প্রকারের অনেক লোক সময়ে সময়ে সমাগত হইয়া থাকেন; বাবু তাঁহাদিগকে বিশেষ শিষ্টাচারে যথাযোগ্য সমাদর করেন।

পুরন্দরবাবুর জমীদারীর বার্ষিক আয় ১৬ হাজার টাকা, কলিকাতায় তাদৃশ ধনবানেরা "বড়লোক" বলিয়া সকলের নিকটে গণ্য হন না; কলিকাতা সহরে তাদৃশ ধনবান্ অল্প নাই, কিন্তু মফস্বল হইতে যে সকল জমীদার কলিকাতায় আইসেন, তাঁহারা যদি দুই পাঁচটা সৎকার্য্য দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাদের নামপ্রচার হয়। তাঁহাদের কাহার কত টাকা আয়, প্রায় কেহই সে খবর লইতে চাহেন না। মনোগত আশা-পরিপূরণের অভিলাষে অনেকেই তাঁহাদের দ্বারস্থ হইয়া থাকে; কেহ কেহ খোসামোদ করিতেও ত্রুটি করেন না। পুরন্দরবাবু সেই প্রকারের অনেক লোক দেখিলেন; অনেকেই তাঁহার বন্ধু হইলেন।

পাঁচ মাস কলিকাতায় বাস করা হইল। বৃদ্ধলোকের বড় একটা তামাসা দেখিবার সখ থাকে না। জাদুঘর, পশুশালা, কেল্লা, হোটেল, খেমটানাচ ইত্যাদি

দর্শনে পুরন্দরবাবুর সাধ হইল না। তিনি শুনিয়াছিলেন, কলিকাতা সহরে থিয়েটার আছে; থিয়েটার কিরূপ, তাহা দর্শন করিবার ইচ্ছা হওয়াতে দুই একজন বন্ধুর সহিত গাড়ী করিয়া কয়েকদিন তিনি থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলেন। চৈতন্যলীলা, বুদ্ধদেব, প্রহ্লাদচরিত্র, ধ্রুবচরিত্র, সাবিত্রী, দক্ষযজ্ঞ, বিল্বমঙ্গল ইত্যাদি ধর্ম্মভাবপূর্ণ নাটকের অভিনয় দেখিয়া তিনি তুষ্ট হইয়াছিলেন, অপরাপর বাজে নাটক ও আরব্য প্রহসনের অভিনয় তাঁহাকে ভাল লাগে নাই। বিশেষতঃ থিয়েটারে বেশ্যারা নৃত্য করে, বেশ্যারা ভগবতী সাজে, সীতা সাজে, সাবিত্রী সাজে, কৃষ্ণ সাজে, এই সকল দেখিয়া তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। অধিকবার তিনি থিয়েটারে যান নাই।

বাড়ীতে অনেক লোকের সমাগম হয়, কেবল তামাক খাইয়া আর গল্প করিয়া নিত্য নিত্য সকলে উঠিয়া যান, বেশীদিন সেটা ভাল দেখায় না, ইহা বিবেচনা করিয়া পুরন্দরবাবু একদিন গুটীকতক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে নিশাকালে ভোজের নিমন্ত্রণ করিলেন। যাঁহাদের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা জন্মে নাই, দুই একবার মাত্র দেখা হইয়াছে, অথচ যাঁহারা সমাজমধ্যে মান্যগণ্য, তাদৃশ গুটীকতক ভদ্রলোককেও নিমন্ত্রণ করা হইল। সকলেই সমাগত হইলেন।

বাড়ীখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না, বাবু যে ঘরে বসিতেন, সে ঘরটীও দিব্য প্রশস্ত, বাঙ্গালী কেতায় উত্তমরূপে সজ্জিত, অন্যূন ৫০।৬০ জন লোকের বসিবার স্থান হয়। ঘরটী ভদ্রলোকে প্রায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। বাবুর নিজের বসিবার উচ্চগদী ছিল না, ঘরজোড়া ঢালা বিছানা; সারি সারি অনেকগুলি তাকিয়া, প্রত্যেক তাকিয়ার সম্মুখে ও পার্শ্বে এক একটী বাঁধা হুঁকা। আহারের আয়োজন হইবার প্রায় দুই ঘণ্টা বিলম্ব। অতগুলি ভদ্রলোক দুই ঘণ্টাকাল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না, নানাপ্রকার গল্প জুড়িয়া দিলেন। দেশের গল্প অতি কম, বিদেশের কথাই বেশী। নেপোলিয়ানের যুদ্ধ, জর্ম্মন-ফরাসীযুদ্ধ, বুয়র-যুদ্ধ, তুর্কীর সুলতান, কাবুলের আমীর, হায়দ্রাবাদের নিজাম, রুষ-জাপানের যুদ্ধ, লাট-সাহেবের ভ্রমণ, এই সকল কথা লইয়াই তাঁহার আমোদ চলিতে লাগিল। কেহ কেহ মাঝে মাঝে পক্ষাপক্ষ-বিচারে এক এক টীপ্পনী ঝাড়িতে লাগিলেন। একধারে একটী তাকিয়া লইয়া পুরন্দরবাবু চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন, যে সকল গল্প তিনি কখন শ্রবণ করেন নাই, সেই সকল গল্পের টীকা-টীপ্পনী শ্রবণ করিয়া তাঁহার সন্তোষ

জন্মিতেছিল কিম্বা অসন্তোষের উদয় হইতেছিল, অন্যলোকে তাহা [illegible] পারিলেন না।

গল্প চলিতেছে, মধ্যে মধ্যে এক একটী নূতন লোক আসিতেছেন, সহরের দস্তুরমত তাঁহাদের অভ্যর্থনা হইতেছে, সেই অবসরে ক্ষণেকের জন্য গল্পে বিরাম পড়িতেছে, এইরূপ মজলীস্।

গল্প বন্ধ হইল। নিমন্ত্রিতজনগণের মধ্যে যাঁহাদের সহিত যাঁহাদের আলাপ, তাঁহাদের পরস্পর প্রিয়সম্ভাষণ চলিল। যাঁহারা উপস্থিত, তাঁহাদের মধ্যে নানাশ্রেণীর লোক ছিলেন। উকীল, ডাক্তার, কবিরাজ, দারোগা, সেরেস্তাদার, কেরাণী, কেশিয়ার, মাষ্টার, পণ্ডিত, ভট্টাচার্য্য, খবরের কাগজের সম্পাদক, গ্রন্থকার, জমীদার, উমেদার এই প্রকার নানাশ্রেণীর ভদ্রলোক। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই চাকুরী করেন, অতি অল্পলোক স্বাধীন। তাঁহারা সকলেই পরস্পর আপন আপন বৃত্তির পরিচয় দিলেন, পরিচয় লইলেন। যে সকল বন্ধুর সহিত অনেক দিন দেখা-শুন হয় নাই, তাঁহাদের বন্ধুরা তাঁহাদিগকে শারীরিক, বৈষয়িক ও পারিবারিক মঙ্গলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। কেহ ভাল, কেহ মন্দ বিশেষ বিশেষ উত্তর দিলেন। পার্শ্বে একটী ভদ্রলোককে দেখিয়া সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া একটী বাবু প্রফুল্লবদনে বলিলেন, "এই যে ডাক্তারবাবু! ভাল আছেন ত? কাজকর্ম্ম কেমন চলিতেছে?" ডাক্তারবাবু উত্তর করিলেন, "শরীর এক রকম আছে ভাল, কিন্তু বাজার বড় মন্দা।" একজন ভট্টাচার্য্য আর একজনের দ্বারা ঐরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করিলেন, "বাজার বড় মন্দা।" একজন উকীল তাঁহার এক বন্ধুর প্রশ্নে উত্তর দিলেন, "বাজার বড় মন্দা।" একজন কবিরাজ একজন বন্ধুর প্রশ্নে উত্তর করিলেন, "বাজার বড় মন্দা।" একজন দারোগাও একটী বাবুর প্রশ্নে উত্তর করিলেন, "বাজার বড় মন্দা।"

কতকগুলি ব্যবসায়ী-লোক বাজার মন্দা বাজার মন্দা বলিয়া এক এক নিশ্বাস ফেলিলেন, কেবল কেরাণীরা ঐ কথাটার প্রতিধ্বনি করিলেন না। তাঁহাদের নিদ্রা জাগরণ একই প্রকার। উমেদারেরা চাকুরী অভাবে বিমর্ষ। অনেকেরই বিমর্ষভাব।

মজলীসের একজন রসিক পুরুষ সকলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমোদ করিতে আসিয়াছেন, বাজার মন্দা বাজার মন্দা বলিয়া নিশ্বাস ফেলা কেন?

[illegible] কথাটা কি ভুলিয়া থাকা যায় না ? আমোদের মজ্‌লীসে বিমর্ষ ভাব বড় অন্যায়। এ মজ্‌লীসে এই সময় খানিকক্ষণ গীতবাদ্য চলিলে ভাল হয়।"

পুরন্দরবাবু চিন্তাযুক্ত হইলেন। তিনি গীতবাদ্য ভালবাসেন, কিন্তু সে বাড়ীতে যন্ত্রাদির অভাব; দুঃখিত হইয়া সেই কথাটী তিনি প্রকাশ করিলেন। রসিক লোকটী বলিলেন, "সেজন্য ভাবনা কি ? এখনি নানা যন্ত্র আসিতে পারে।"

সে বাড়ীর অতি নিকটে একটী সৌখীন বাবুর বাড়ী, তিনিও সেই মজ্‌লীসে উপস্থিত ছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠিয়া তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন, দশ মিনিটের মধ্যেই একটী হারমোনিয়ম আর একটী পাখোয়াজ আসিয়া মজ্‌লীসের শোভা বৰ্দ্ধন করিল। মজ্‌লীসে গায়কবাদকের অভাব ছিল না, অবিলম্বেই গীতবাদ্য আরম্ভ হইল।

একঘণ্টা গীত হইল। সঙ্গীতাবসানে ভোজনের আয়োজন। ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া রাত্রি প্রায় একটার সময় গৃহস্বামীকে অভিবাদন পূর্ব্বক সকলে হৃষ্টচিত্তে বিদায়গ্রহণ করিলেন। পুরন্দরবাবু শয়ন করিয়া নিদ্রাকর্ষণের পূর্ব্বে উদ্বিগ্নচিত্তে একটী বিষয় চিন্তা করিলেন, কিছুতেই মীমাংসা আনয়ন করিতে পারিলেন না।

সন্ধ্যার পর পুরন্দরবাবু আপন বৈঠকখানায় একদিনও একাকী থাকেন না, প্রতিদিন দুই পাঁচটী, অন্ততঃ দুটী একটী বন্ধু উপস্থিত থাকেন। ভোজের পরদিন সন্ধ্যার পর তিনটী ভদ্রলোক তাঁহার নিকটে ছিলেন; সেই তিনজনের মধ্যে একজনের নাম নীলাম্বর বসু মল্লিক। পূর্ব্বে তিনি হাইকোর্টে চাকুরী করিতেন, বয়স অধিক হওয়াতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সংসারজ্ঞানে এবং সমাজতত্ত্ব দর্শনে তাঁহার সবিশেষ পারদর্শিতা; বয়সে প্রবীণ, কার্য্যেও বহুদর্শী। তাঁহার সহিত পুরন্দরবাবুর কিছু বেশী প্রণয়।

চারিজনে বসিয়া গল্প করিতেছেন, এমন সময় একজন ভট্টাচার্য্য সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। ললাটে করপুট স্পর্শ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিলেন, "ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।" ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে নমস্কার-বিনিময় হইল। পূর্ব্বকথিত তিনটী ভদ্রলোকের মধ্যেও একজন ভট্টাচার্য্য ছিলেন। নূতন ভট্টাচার্য্যকে দেখিয়া সেই ভট্টাচার্য্য স্বভাবসিদ্ধ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এসো তর্কবাগীশ ভায়া! মঙ্গল তো সব ? অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই, হচ্চে কেমন ? বাহিরের কাজকর্ম্ম চলচে কেমন ?"

নস্য গ্রহণ করিয়া নূতন ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন, "চল্‌চে ত চলচে, কিন্তু বাজারটা ভারী মন্দা।"

বাবু সেই নূতন ভট্টাচার্য্যকে পূর্ব্বে একবারও দেখেন নাই। ভট্টাচার্য্যের উপাধি তর্কবাগীশ, এইমাত্র পরিচয় পাইয়া, সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া, তিনি তাঁহাকে বসাইলেন, নীলাম্বরবাবু তর্কবাগীশকে প্রণাম করিলেন, তর্কবাগীশ অভ্যাসমত আশীর্ব্বাদ করিতে ভুলিলেন না।

দুটা একটী অশুদ্ধ শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তর্কবাগীশ মহাশয় গৃহস্বামীর সন্তোষ জন্মাইলেন। কোন বড়লোকের নিকটে নূতন উপস্থিত হইলে ভট্টাচার্য্যেরা যেরূপ সদালাপ করেন, এই ভট্টাচার্য্যটীও পুরন্দরবাবুর সহিত সেইরূপ সদালাপ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তোষামোদবাক্য থাকে, ভট্টাচার্য্যের রসনা সেরূপ বাক্যবর্ষণেও কৃপণ হইল না। কি অভিপ্রায়ে আগমন, বাবুর এই প্রশ্নে ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন, "নাম শুনিয়া আসিয়াছি। আপনি দাতা, ভোক্তা, ধার্ম্মিক, আপনার কাছে আমার একটী প্রার্থনা আছে। পুত্রের উপনয়ন, আমার তাদৃশ সম্বল নাই, বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি।"

সরকারকে ডাকিয়া বাবু সেই ভট্টাচার্য্যকে একটী টাকা দান করিবার আদেশ দিলেন, টাকাটী লইয়া নমস্কার করিয়া ভট্টাচার্য্য বিদায় হইলেন, প্রস্থানকালেও নীলাম্বরবাবু তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ পাইলেন।

ভট্টাচার্য্য বিদায় হইবার পর পুরন্দরবাবু মনে মনে কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিয়া নীলাম্বরবাবুর মুখের দিকে চাহিলেন। গত রজনীতে ভোজনের অগ্রে, সঙ্গীতালাপের অগ্রে কতিপয় বন্ধুর পরস্পর যখন বাক্যালাপ হয়, নীলাম্বরবাবু তখন পুরন্দরবাবুর পার্শ্বেই বসিয়া ছিলেন, বন্ধুগণের বাক্যগুলি তাঁহারও কর্ণগোচর হইয়াছিল, ইহা স্মরণ করিয়া বাবু তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন, এইরূপ ইচ্ছা। নীলাম্বরবাবু সেই লক্ষণ বুঝিতে পারিয়া সমদৃষ্টিতে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "গতরাত্রের কথা কি আপনার স্মরণ আছে ? কতকগুলি বাবু সমস্বরে বলিয়াছিলেন, বাজার বড় মন্দা! বাজার বড় মন্দা! আজিও

এ ভট্টাচার্য্য ঠাকুরটী একনিশ্বাসে বলিয়া গেলেন, "বাজারটা ভারী মন্দা!" এ সকল কথার অর্থ কি? কলিকাতা সহরের কি রঙ্গ? এই রকমেই কি এখানকার আলাপ চলে?"

অল্পহাস্য করিয়া নীলাম্বরবাবু কহিলেন, "রঙ্গই বটে। সকলের আলাপ একরূপ নহে, কিন্তু কতকগুলি ব্যবসায়ীলোক আজকাল ঐরূপ ধুয়া ধরিয়াছেন। কল্য যাঁহারা যাঁহারা বাজার মন্দা বলিয়াছেন, তাঁহারা কে কি কাজ করেন, তাহা আপনি শুনিয়াছেন। উকীল, ডাক্তার, কবিরাজ, দারোগা আর একজন ভট্টাচার্য্য। তাঁহাদের মনের কথা আমি আপনাকে বুঝাইব। উকীল বলিয়াছেন, বাজার মন্দা!—ইহার অর্থ এই যে, যত লোক এখন মকদ্দমা করিতেছে, তাহাতে তাঁহার ইচ্ছামত রোজগার হইতেছে না, রাজ্যের সমস্ত লোক মকদ্দমায় মাতিয়া উঠিলে তাঁহার আনন্দ হয়। সকল লোকে মকদ্দমা করিতেছে না বলিয়াই উকীলের বাজার বড় মন্দা!

ডাক্তার বলিয়াছেন, বাজার মন্দা! ইহার অর্থ এই যে, রাজ্যের সমস্ত লোক রোগশয্যায় শয়ন করিতেছে না; রোগী বেশী না হইলেই ডাক্তারের বাজার মন্দা! কবিরাজের বাজার মন্দাও ডাক্তারের ইচ্ছার অনুরূপ।

দারোগার বাজার মন্দা, ইহার অর্থ এই যে, চুরি, ডাকাতী, খুন, জখম, দাঙ্গা, রাহাজানি, ঘরজ্বালানী আর অপঘাতমৃত্যু বেশী হইতেছে না, ঐ সকল অল্প হইলেই দারোগার বাজার মন্দা হয়।

ভট্টাচার্য্যের বাজার মন্দা, ইহার অর্থ এই যে, ইংরেজী পড়িয়া অনেকে এখন শ্রাদ্ধশান্তি,ব্রতপূজা উঠাইয়া দিতেছে। বড় বড় লোকের মৃত্যু হইলে তাঁহাদের শ্রাদ্ধে ভট্টাচার্য্যেরা ফলার পান, বিদায় পান, বেশী আনন্দ হয়। যাহারা বড়লোক হইবে, তাহারা শীঘ্র শীঘ্র মরিবে, খুব ঘটা করিয়া শ্রাদ্ধ হইবে, ইহাই ভট্টাচার্য্যদলের কামনা। সমস্ত বড়লোক শীঘ্র শীঘ্র মরিতেছে না, সেই দুঃখেই ভট্টাচার্য্যের বাজার মন্দা।"

বলা হইয়াছে,বাবুর নিকটে যাঁহারা ছিলেন,তাঁহাদের মধ্যে একজন ভট্টাচার্য্য। সেই ভট্টাচার্য্যের দিকে ফিরিয়া নীলাম্বরবাবু কহিলেন, "দোষ লইবেন না, সত্যকথাই আমি বলিতেছি। সকলের না হউক, অধিকাংশের ঐরূপ ইচ্ছা, তাহার উপর প্রতিবাদ চলিবে না। ঐ যে তর্কবাগীশ ঠাকুরটী আসিয়াছিলেন, তিনিও

বলিয়া গেলেন, বাজারটা ভারী মন্দা! কি হইলে বাজার মন্দা ঘুচিয়া যায়, তিনিও তাহা বুঝিতে পারেন।"

যাঁহারা শুনিতেছিলেন, তাঁহারা হাস্য করিলেন, পুরন্দরবাবু হাস্য করিলেননা, শিহরিয়া শিহরিয়া ম্লানবদনে তিনি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া নীলাম্বরবাবুকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যই কি কলিকাতা সহর এই রকম? আমি মনে করিতাম, পল্লীগ্রাম মন্দ, কলিকাতা ভাল। কলিকাতা সহরের কি এই দশা?"

নীলাম্বরবাবু কহিলেন, "পূর্ব্বে এরূপ ছিল না, ক্রমে ক্রমে কলিকাতার এই দশা দাঁড়াইতেছে। যত কথাই বলা যায়, সকল কথাতেই কলিকাতার অধোগতি প্রতিপন্ন হয়। কলিযুগের ধর্ম্ম, এ কথা বলিলে এখনকার সাহেবলোকেরা হাস্য করেন, মুসলমানেরা হাস্য করেন, হিন্দুসন্তানের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজী পড়িয়া উন্নতিশীল হইয়াছেন, তাঁহারাও হাস্য করেন। সংসারের সারতত্ত্ব ধর্ম্ম; কলিকাতায় সেই ধর্ম্ম এখন বিপর্য্যস্ত। ধর্ম্মধ্বজীরা ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া একেশ্বরবাদী হইবার ইচ্ছা করেন, বিজ্ঞানবিশারদ পণ্ডিতেরা নাস্তিক হইবার অভিলাষ রাখেন। ব্রাহ্মণের ছেলেরা পৈতা ফেলিয়া দিতেছে, অন্নবিচার পরিত্যাগ করিতেছে, যবনান্নগ্রহণে মনুষ্যত্ব দেখাইতেছে, ব্রাহ্মণতের অপরাপর জাতীয় লোকেরা পৈতা পরিবার হুজুগে মাতিয়াছে, তাহারা শাস্ত্রের নজীর দেখায়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাতিরই পৈতা পরিবার অধিকার আছে, এই তাহাদের হেতুবাদ। আছে বটে নজীর, কিন্তু ব্রাহ্মণের ন্যায় যজ্ঞসূত্রধারণের অধিকার অপর কাহারও নাই। ক্ষত্রিয়ের কুশোপবীত, বৈশ্যের চর্ম্মোপবীত, পুরাতন পুথিতে এইরূপ লেখা আছে। এখন যাহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিতে চায়, এই বঙ্গদেশে তাহারা সকলেই ব্রাহ্মণতের ন্যায় যজ্ঞসূত্রধারণে অধিকার আছে বলিয়া সভা করে, বক্তৃতা করে, শাস্ত্রের নজীর অন্বেষণ করে। এই হতভাগা দেশে অর্থলোভী তর্কবাগীশ, বিদ্যাবাগীশ, স্মৃতিবাগীশ প্রভৃতি ভট্টাচার্য্যেরাও সেই সেই দলের ব্যবস্থাপক হইয়া বড় বড় পত্রিকায় নাম দস্তখত করিতেছেন, কত লোকে কতবিধ ধর্ম্মের নূতন নূতন নামকরণ করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করিতেছে। ধর্ম্মের ত এই দশা, ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া একে একে আরও গোটাকতক বড় বড় কথা আমি বলিতেছি।"

সুরেন্দরবাবু করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া আর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। দেশের সর্বনাশ হউক, জনকতক লোকের টাকা বাড়ুক, এমন স্বার্থপরতা এ দেশে প্রবেশ করিয়াছে, ইহাই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া চাহিয়া নীলাম্বরবাবুকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আরও কি বড় বড় কথা আপনার বলিবার ইচ্ছা আছে, বলুন, সমস্তই আমি শুনিব।"

নীলাম্বরবাবু বলিলেন, "ইংরাজ বাহাদুরেরা আমাদের দেশের মঙ্গল চান; এ দেশের মঙ্গলের জন্য অশেষবিশেষে তাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন; প্রজালোকের শরীর যাহাতে ভাল থাকে, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের একান্ত চেষ্টা। অনেক টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহারা ভারতের স্বাস্থ্যবিধানের উপায় করিয়া দিতেছেন; মোটা মোটা বেতনে স্বাস্থ্যরক্ষক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেছেন, মেডিকেল কলেজ হইতে সুশিক্ষা দান করিয়া শত শত ডাক্তার বাহির করিতেছেন, কিছুতেই তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতেছে না, তাঁহাদের দোষ নাই, সেটা কেবল আমাদের অদৃষ্টের দোষ।

স্বাস্থ্য-বিধানের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টেরও চেষ্টা আছে, দেশের লোকেরও চেষ্টা আছে; চেষ্টার ফল কিন্তু আর একপ্রকার হইতেছে; রোগের পরাক্রমের নিকটে চিকিৎসার পরাক্রম পরাজিত হইয়া যাইতেছে। কলিকাতার অবস্থা আমি বেশী জানি, অতএব কলিকাতার কথা বলিয়াই এই বিষয়টী আমি আপনাকে বুঝাইব। এলোপাথ, হোমিওপাথ, কবিরাজ, হাকিম, অবধূত, হাইড্রোপাথ প্রভৃতি চিকিৎসকের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কত বাড়িয়াছে, হিসাব করিয়া বলিতে হইলে গণনাসংখ্যা হারি মানিয়া যায়, তথাপি রোগের সংখ্যা কম হইতেছে না, যতই চিকিৎসক বাড়িতেছে, ততই নূতন নূতন রোগ বাড়িতেছে, শাস্ত্রীয় ঔষধ এবং অপরাপর বিধিসিদ্ধ ঔষধ পর্য্যাপ্ত হইতেছে না, দেখিয়া অনেকগুলি লোক ভিন্ন ভিন্ন রোগের চিকিৎসার জন্য নূতন নূতন পেটেণ্ট ঔষধ প্রস্তুত করিতেছেন, ঔষধ-বিক্রয় প্রচুর হইতেছে। যাঁহারা যে ঔষধ প্রস্তুত করেন, কলিক[illegible]রে এবং প্রদেশে প্রদেশে তাহাই পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে বিক্রীত হয়[illegible]ধওয়ালারা লাভবান্ হন, কিন্তু যাঁহাদের [illegible] ঔষধ, তুল্যাংশে তাঁহারা লাভবান্ হন না। যে সকল রোগ এ দেশে পূর্ব্বাবধি

প্রচলিত ছিল, তাহার সংখ্যা ছাপাইয়া আজকাল আবার অভূতপূর্ব্ব [illegible] অদ্ভুত অদ্ভুত নূতন নূতন রোগ প্রকাশ [illegible] উঠিতেছে। ম্যালেরিয়া [illegible] জ্বর, প্লীহা-যকৃৎ সর্ব্বপ্রথমে বারাসত, উলা, হালিসহর ও অন্যান্য স্থানে উৎপন্ন হইয়াছিল, বহুস্থান জনশূন্য করিয়া জঙ্গলময় করিয়াছিল, সেই ম্যালেরিয়া-বিষ এখন কলিকাতায় প্রবেশ করিয়াছে। আর একটা অদ্ভুত রোগ বোম্বাই প্রদেশে উৎপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে দেশব্যাপী হইতেছে, সেই সাংঘাতিক রোগটাও কলিকাতায় আসিয়াছে, বিচক্ষণ বিচক্ষণ ডাক্তার-কবিরাজ-মহাশয়েরা আজি পর্য্যন্ত সে রোগের নাম নির্ণয় করিতে পারেন নাই। পাঁজি-পুঁথিতে সে রোগের নাম না পাইয়া ইংরাজ ডাক্তারেরা তাহার নাম দিয়াছেন 'প্লেগ'। গো-মনুষ্যাদির সাধারণ মড়কের ইংরাজী নাম ছিল 'প্লেগ,' এই নূতন রোগটাও সেই নামেই পরিচিত। পাঁজি-পুঁথিতে যে রোগের নাম নাই, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, সে রোগের চিকিৎসাও নাই; কার্য্যেও তাহাই দৃষ্ট হইতেছে। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া চিকিৎসক-মহাশয়েরা দুই একটা ঔষধের ব্যবস্থা করেন, প্রায়ই তাহা ভাসিয়া ভাসিয়া যায়, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই প্রাণান্ত। কাহারও কাহারও চব্বিশ ঘণ্টাও বিলম্ব সহে না!

ডাক্তারের সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে, কবিরাজের সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে, সেই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য লোক মরিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে রোগেরও বৃদ্ধি হইতেছে, চিকিৎসকেরা তথাপি বলেন, "বাজার বড় মন্দা।" ইহাও একটা রোগ! রোগী মরুক আর বাঁচুক, তথাপি অন্যান্য রোগের এক এক প্রকার ঔষধ আছে, ঐ নিরাশ্বাস বাক্য-রোগের কোন ঔষধ নাই!

বাজার মন্দা হইলেও অগণ্য ডাক্তার-কবিরাজের স্বচ্ছন্দে দিন নির্ব্বাহ হইতেছে। ডাক্তারগণের শিক্ষা আছে, পরীক্ষা আছে, যোগ্যতার নিদর্শন আছে, কিন্তু কবিরাজ-মহলে সে রীতি নাই। এখনকার কবিরাজগণের মধ্যে যাঁহারা সুশিক্ষিত, তাঁহারা ক্ষমা করিবেন, কবিরাজদলে এখন ভাল মন্দ বাছিয়া লওয়া দুর্ঘট হইয়াছে। যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শাস্ত্রমতে চিকিৎসা করিতেন, তাঁহাদের উপাধি ছিল, 'বৈদ্য'। চিকিৎসা-জগতে বৈদ্য ভিন্ন অপর জাতি প্রবেশাধিকার পাইত না। আজকাল ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রের নবশাক, এমন কি, রাজপুত, রাজবংশী, রজক, রঙ্ক ও স্বর্ণকার ইত্যাদিজাতীয় নিরক্ষর লোকেরাও

কবিরাজ হইয়া উঠিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় একটীও আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় ছিল না। প্রাচীন কবিরাজ-মহাশয়েরা ঘরে ঘরে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রোগিগণের গৃহে গৃহে গিয়া ঔষধ প্রদান করিতেন। এখন কলিকাতায় প্রায় গলীতে গলীতে এক একটী আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়। সহরের দেখা দেখি সহরের বাহিরেও আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়ের সাইনবোর্ড দৃষ্টিগোচর হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়সমূহের পরিচালক হইতেছে কাহারা? সত্য যাঁহারা পরিচালক হইবার অধিকারী, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ঔষধালয়গুলির প্রতি অবশ্যই ভক্তি রাখিতে হয়, কিন্তু সর্ব্বত্র সেরূপ অধিকারী দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহারা জন্মাবধি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র দর্শন করে নাই, অন্য কোন কাজ না জুটিলে তাহারা এক একটা দোকানের চৌকাঠের মাথায় বৃহৎ বৃহৎ অক্ষরে সাইনবোর্ড ঝুলাইয়া মানুষকে দেখাইতেছে, আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়। সাইনবোর্ডে লেখা থাকে, 'কবিরাজ শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র মণ্ডল কবিশেখর, কবিরাজ শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ কুণ্ড কবিকেশরী, কবিরাজ শ্রীজয়প্রকাশ দাস কাব্যরত্ন' ইত্যাদি ইত্যাদি। কবিরাজ কাহাকে বলে, তাহা যাহাদের জ্ঞান নাই, দুঃসাহসের আশ্রয় লইয়া তাহারা আপনাদের নামের পূর্ব্বে কবিরাজ এবং নামের শেষে কাব্যশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতের উপাধি যোগ করে, ইহা কদাচ ক্ষমার যোগ্য হইতে পারে না। সাইনবোর্ড দিয়া যাহারা বস্ত্র বিক্রয় করে, জামা, জুতা, পুতুল অথবা অন্যান্য সামগ্রী বিক্রয় করে, তাহাদের কার্য্যের উপর কথা কহিবার কাহারও অধিকার নাই, কিন্তু যে কার্য্যে মানুষের জীবন মরণ সম্বন্ধ, সে কার্য্যে অনধিকারী ব্যক্তিগণকে প্রশ্রয় দেওয়া পাপের কার্য্য। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বাজারের খেলানা নহে, সে ঔষধ সেবন করিলে কি হয়, তাহা যাহারা জ্ঞাত নহে, তাহারা মানুষকে ঔষধ প্রদান করিয়া চিকিৎসা করিতে সাহস করে, ইহা শ্রবণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। ডাক্তারের পরীক্ষা আছে, ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডারগণের পরীক্ষা আছে, কবিরাজের পরীক্ষা নাই; কবিরাজ উপাধিধারী অপরীক্ষিত মূর্খলোকের হস্তে ঔষধ খাইয়া মানুষ যদি মরে, তাহার জন্য দায়ী কে হইবে? বড় আক্ষেপের বিষয়, এত বড় [illegible] রাজ্যে সে কথা জিজ্ঞাসা করিবার লোক নাই!

কলিকাতা সহরে আজকাল প্রায় সকল গৃহস্থের ঘরে ঘরেই দুই একজন করিয়া এক এক প্রকার রোগে আক্রান্ত; রোগাধিক্য হেতু ডাক্তার-কবিরাজের দর্শনী

বাড়িয়াছে, ঔষধের মূল্য বাড়িয়াছে, এত বাড়িয়াছে যে, গৃহস্থের সংসারখরচ অপেক্ষা চিকিৎসায় খরচ প্রায় দুই তিন গুণ অধিক। সামান্য আয়বান্ লোকের পক্ষে ইহা যে কতদূর কষ্টকর, চিকিৎসক-মহাশয়েরা তাহা বিবেচনা করিতে পারেন না। খায়াভাবে অনেক দরিদ্রলোক বিনা চিকিৎসায় ইহসংসার ত্যাগ করিয়া যায়, এরূপ অনুমান করিলেও বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। ডাক্তার মহলে আজকাল আর একটা নূতন অভ্যাস হইয়াছে, জ্বরাক্রান্ত রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া জ্বরের উত্তাপ ও প্রকৃতি নির্ণয় করা হইত, এখন তাহার বদলে তাপমান যন্ত্রের ব্যবহার চলিতেছে, রোগীর কক্ষদেশে থার্ম্মোমিটার রাখিয়া দিয়া তাপ নিরূপণ করা হয়, তাপ কত ডিগ্রী উঠিয়াছে, যন্ত্রের পারদ দর্শনে সেইটুকু জানিতে পারিলেই ডাক্তারেরা যথেষ্ট মনে করেন। কেবল তাপনিরূপণেই জ্বরের প্রকৃতি বুঝা যায় না, ইহা ভাবিতে তাঁহারা ভুলিয়া যান; বায়ু, পিত্ত, কফ, নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিয়া এই তিনটী স্থির করিতে না পারিলে, ঔষধপ্রয়োগ বৃথা হয়, কোন কোন স্থলে বিপরীত হয়, ডাক্তার-মহাশয়েরা কেন যে সেটী ভাবেন না, ইহাই আমরা আশ্চর্য্য মনে করি। ডাক্তারের দেখাদেখি কোন কোন কবিরাজও অধুনা থার্ম্মোমিটার বসাইয়া জ্বরের চিকিৎসা করিতেছেন। নাড়ীজ্ঞান নাই বলিয়া ঐরূপ কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করা হইতেছে, অনেকে এইরূপ মনে করেন, চিকিৎসকগণের পক্ষে ইহা সামান্য লজ্জা ও কলঙ্কের বিষয় নহে। নাড়ীজ্ঞান প্রয়োজন নাই, আনাড়ীরাই ঐরূপ ভাবিতে পারেন, বাস্তবিক আমাদের চিকিৎসা-সংসার অনেক স্থলে কেবল আড়ম্বরপূর্ণ হইয়াছে, চিকিৎসকের সংখ্যাধিক্যে যেরূপ সুফলের আশা করা যায়, তাহা—"

এই সকল কথা হইতেছে, এমন সময় সরকার আসিয়া সংবাদ দিল, রঙ্গলালবাবু বাড়ী আইসেন নাই। পুরন্দরবাবু একটু চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গেল?"

সরকার ঠিক উত্তর দিতে পারিল না, ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। দেয়ালের ঘড়ীর দিকে চাহিয়া বাবু বলিলেন, "সাড়ে আটটা, এখনও আসিল না; কারণ কি? যদুপতিকে ডাক দেখি!"—সরকার যদুপতিকে ডাকিতে গেল।

[illegible] লেখা-পড়া শিখাইবার জন্য পুরন্দরবাবু কলিকাতায় আনিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে যেটী বড়, সেইটীর [illegible] লাল; বয়স ত্রয়োদশ

বর্ষ; যেটী দ্বিতীয়, তাহার নাম যদুপতি; বয়স দশ বৎসর; যেটী সর্ব্বকনিষ্ঠ, তাহার নাম হরিচরণ, বয়স আট বৎসর।

সরকারের সঙ্গে যদুপতি ও হরিচরণ উভয়েই পিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। যদুপতির দিকে চাহিয়া কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোদের দাদা কোথায় গেল? এত রাত্রি পর্য্যন্ত বাটী আসিল না কেন?"

যদুপতি বলিল, "পাঠশালার তিনজন বালকের সঙ্গে থিয়েটার দেখিতে গিয়াছে।"

কোন্ থিয়েটার জানিয়া লইয়া বাবু তখন সরকারকে বলিলেন, "এখনি যাও, থিয়েটার হইতে ছেলেটাকে শীঘ্র ধরিয়া আন।"

সরকার ছেলে ধরিতে গেল, বিস্মিতনয়নে বাবুর মুখপানে চাহিয়া নীলাম্বরবাবু বলিলেন, এই গো! রোগে ধরিয়া আসিতেছে! আপনি শাসন করিয়া দিবেন, সে ছেলে যেন আর কখনও থিয়েটারে না যায়। ছোট ছোট ছেলেরা থিয়েটারে গিয়া কুসঙ্গে মিশিয়া পড়ে, মন্দ মন্দ দৃষ্টান্ত দেখে, অতি অল্পেই তাদের চরিত্র দূষিত হয়।"

নীরবে ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "থিয়েটারটা কলিকাতায় কত দিন হইয়াছে?"

নীলাম্বরবাবু উত্তর করিলেন, "পঞ্চাশবৎসরের অধিক হইবে। আগে আগে সখের থিয়েটার ছিল, থিয়েটার দেখিতে কাহারও পয়সা লাগিত না; থিয়েটারে তখন মেয়েমানুষ ছিল না; যাত্রার সখীদের ন্যায় বালকেরাই মেয়েমানুষ সাজিত। থিয়েটারের জন্য স্বতন্ত্র বাড়ী ছিল না; এক একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতেই অভিনয় হইত। প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল, থিয়েটারের বাড়ী হইয়াছে, এক দুই করিয়া দলের সংখ্যাও বৃদ্ধি হইয়াছে। থিয়েটারের কর্ত্তারা যখন টিকিটের নিয়ম করিলেন, টাকা দিয়া টিকিট কিনিয়া লোকে যখন থিয়েটার দেখিতে আরম্ভ করিলেন, দর্শকের সংখ্যা তখন অধিক হইত না। বুদ্ধিবলে কর্ত্তারা তখন স্থির করিলেন, থিয়েটারে মেয়েমানুষ আনিতে পারিলে দর্শক অধিক হইবে। সাধারণকে তাঁহারা বুঝাইলেন, মেয়েমানুষের কার্য্য মেয়েমানুষে করিলেই ভাল দেখায়, প্রকৃতির মর্য্যাদাও রক্ষা পায়। প্রকৃতির মর্য্যাদারক্ষার নিমিত্তই মেয়েমানুষ সংগ্রহ করা হইল; বেঙ্গল থিয়েটার নামক রঙ্গমঞ্চেই মেয়েমানুষের প্রথম প্রবেশ। এটী বিলাতী অনুকরণ।"

এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতে নীলাম্বরবাবু একটু থামিলেন, বালক দুটী তখনও সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "যাও বাবা, তোমরা বাড়ীর ভিতর যাও, পাঠ অভ্যাস কর গিয়া।"

বালকেরা বাড়ীর ভিতর গেল, নীলাম্বরবাবু পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "থিয়েটারে মেয়েমানুষ বাহির করা বিলাতী প্রথার অনুকরণ। বিলাতে গৃহস্থ-কামিনীরা প্রকাশ্য থিয়েটারে অভিনয় করেন, আমাদের দেশে সেরূপ হওয়া অসম্ভব, সুতরাং এখানকার থিয়েটারে যাহারা প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা বেশ্যা। মেয়েমানুষের কার্য্য মেয়েমানুষে করিলেই ভাল দেখায়, থিয়েটারের কর্ত্তারা প্রথমে এই কথা বলিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে কতকগুলি মেয়েমানুষকে পুরুষ সাজান হইতেছে। বেশ্যারা অল্পদিনের মধ্যে অভিনয়কার্য্যে বেশ পটু হইয়াছে। পুরুষবেশে অথবা নিজ নিজ বেশে বেশ্যারা যে সকল কার্য্যের অভিনয় করে, তাহাতে নায়ক-নায়িকার প্রণয়-ঘটিত কোনরূপ ব্যবহার থাকিলে কেহ কোন দোষ বিবেচনা করেন না। বিলাতে অন্তঃপুর নাই, বিলাতী কামিনীরা স্বাধীনা, তথাপি সেখানে থিয়েটারের খেলায় মাঝে মাঝে এক একটা রহস্য শ্রুতিগোচর হয়। বিলাতের এক থিয়েটারে একবার একটী ভদ্রকামিনী নায়িকা সাজিয়াছিলেন, যে নাটকের অভিনয়, প্রণয়প্রসঙ্গে নায়ক পর্য্যায়ক্রমে পঞ্চাশবার নায়িকাকে চুম্বন করিবেন, সেই নাটকে এইরূপ লেখা ছিল; অভিনয়ও সেইরূপ হইয়াছিল। নায়িকার স্বামী উপস্থিত ছিলেন, আপনার নোট-বহিতে তিনি সেই চুম্বনগুলি লিখিয়া লইয়াছিলেন। অভিনয়ের পরদিন সেই নায়কের নামে তিনি আদালতে নালিস উপস্থিত করেন। প্রত্যেক চুম্বনের মূল্য দশ পাউণ্ড, পঞ্চাশটী চুম্বনের মূল্য পাঁচশ পাউণ্ড, এইরূপ হিসাব করিয়া আরজীতে সাবীর ঘর পূরণ করা হয়। বিচারের সময় বিচারপতি সেই ফরিয়াদীকে জিজ্ঞাসা করেন, 'যে নাটকের অভিনয় হইয়াছিল, অগ্রে আপনি সে নাটক পাঠ করিয়াছিলেন কি না, আপনার পত্নী সে নাটকের অভিনয়ে নায়িকা সাজিবেন, তাহা আপনি জানিতেন কি না?' ফরিয়াদী সেই প্রশ্নে উত্তর দিয়াছিলেন, 'জানিতাম।' আইনানুসারে মকদ্দমা অবশ্য ডিস্‌মিস্ হইয়াছিল, বিচারালয়ে সমস্ত লোক হাস্য করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে সে প্রকার হাস্যকর মকদ্দমা উপস্থিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। বেশ্যারা অভিনয় করে, বেশ্যাগণের স্বামী নাই।"

থিয়েটারের কথা বলিতে বলিতে কি একটু চিন্তা করিয়া নীলম্বরবাবু বলিলেন, "এইখানে আমার আর একটা কথা মনে পড়িল। যে সকল বঙ্গযুবক উন্নতিশীল নাম ধারণ করেন, সেই দলের প্রধান হইতেছেন, কৈশব সম্প্রদায়। সেই সম্প্রদায়ের একজন প্রবীণ বক্তা একদা এক সুললিত বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, 'আমারদিগের বেশ্যাভগিনীগণ একবার কুপথে চলিয়া পড়িয়াছেন বলিয়া আর যে তাঁহাদিগকে শোধন করিয়া লওয়া যাইতে পারে না, যুক্তিতে এমন আইসে না। বেশ্যাভগিনীগণের বিবাহ দিতে পারিলে অবশ্যই তাঁহাদের চরিত্র শোধিত হইতে পারে।' সেই বক্তৃতার গুণে বক্তার দুই একটী বেশ্যাভগিনী বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু সতীত্ব সেই সকল কলুষিত কলেবর স্পর্শ করে নাই, বক্তার বেশ্যা-ভগিনীগণ সতী হইতে পারে নাই।"

রঙ্গলালকে লইয়া সরকার ফিরিয়া আসিল। রঙ্গলালের মুখ বিশুষ্ক। বাবু তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, নীলাম্বরবাবু প্রহার করিতে দিলেন না;—বারান্তরে প্রহার হইবে বলিয়া, থিয়েটারে যাইতে নিষেধ করিয়া দিলেন। মাথা হেঁট করিয়া রঙ্গলাল বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

থিয়েটারের গল্প শুনিতে শুনিতে পুরন্দরবাবুর কৌতুক বাড়িতেছিল, নীলাম্বরবাবুকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কলিকাতার থিয়েটারের আর কোন নিগূঢ় তত্ত্ব আপনি কি অবগত আছেন?"

নীলাম্বরবাবু কহিলেন, "অনেক আমি জানি। প্রথম প্রথম যখন থিয়েটার হয়, তখন অনেকগুলি প্রবীণ লোক তাহা দেখিতে যাইতেন, এখন আর থিয়েটারের আসরে প্রায়ই তাঁহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না, এখন কেবল পূর্ব্ববঙ্গের সৌখীন লোকেরা আর আমাদের বিদ্যালয়ের বালকেরাই থিয়েটারের আসন পূর্ণ করিতেছে। বালকেরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে লেখাপড়ার কথা আলোচনা করিতে করিতে রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইত; এখন তৎপরিবর্ত্তে সকলের মুখে থিয়েটারের কথা, অভিনয়ের কথা, নায়িকাদের বিশেষ বিশেষ নামের কথা; সকলের হস্তেই এক এক বড় বড় হ্যাণ্ডবিল! এতদ্দ্বারা বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতেছে, অনেক বালকের চরিত্র নষ্ট হইতেছে। বিশেষতঃ যে সকল নবীন যুবক থিয়েটার-দর্পণে আপনাদের মুখচ্ছবি দর্শন করিয়া আমাদের আদর্শবৎ থিয়েটারের দলের সহিত বন্ধুত্ব করিতেছেন, থিয়েটারের সাজঘরে গোপনে তাঁহারা যে সকল কাণ্ড

শুগুরাম নাগের পাঁচ বৎসর, আর তাহার পক্ষের সাক্ষীগণের তিন তিন বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে। শুভঙ্করী দেবী ও বিশ্বময়ী দেবী ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন, দেবরের অর্দ্ধেক বিষয় বাহির করিয়া দিবার লোভ দেখাইয়া দর্পনারায়ণ গাঙ্গুলী শুভঙ্করী দেবীকে তাঁহার পুত্রবধূর সহিত স্থানান্তরে লইয়া রাখিয়াছিলেন, শুভঙ্করীদেবী নিজমুখে সেই কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

পুরন্দরবাবু পুত্রতিনটীকে লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন, উইল করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কর্ত্তৃত্বভার দিয়া তিনি কাশীযাত্রা করিলেন। কাশীযাত্রার পূর্ব্বে তাঁহার আর একটী পুত্রের বিবাহ হইল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে কন্যা ক্রয় করিয়া তাঁহাদিগকে বিবাহ করিতে হইত, এখন ধন-গৌরবে কন্যা দানে পান, তিনি নিজেও ধনগৌরবে এক কুলীন ব্রাহ্মণের তিনটী কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। কন্যার বিবাহে আজকাল অনেক টাকা ব্যয়, কুলীন হইয়াও অর্থাভাবে তাঁহার শ্বশুর তাঁহাকেই একে একে তিনটী কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন। জামাতাকে এক পয়সাও দিতে হয় নাই।

ইহার নাম বঙ্গরহস্য। দেখা হইল, স্বেচ্ছাচারিতাই ধর্ম্ম, দাম্ভিকতাই বিদ্যা, স্বার্থপরতাই পুণ্য, দরিদ্রতাই পাপ, প্রতারণাই মনুষ্যত্ব; এখনকার উন্নতির সর্ব্বাঙ্গই কেবল টাকা।—টাকাতেই পাণ্ডিত্য, টাকাতেই কৌলীন্য, টাকাতেই মর্য্যাদা। এই সকলের সমষ্টির নাম উন্নতি। বস্তুতঃ ইহাই যদি বঙ্গ সংসারের উন্নতি হয়, তবে এই সাতকোটি-জনপূর্ণ সুবিস্তৃত বঙ্গদেশ যত শীঘ্র বঙ্গসাগরে ডুবিয়া যায়, ততই মঙ্গল।

সমাপ্ত।